বীণাপাণি

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীরামগোপাল সেন গুপ্ত সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩০১-২।

১৫৯ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট, "বীণাপাণি"-কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

CALCUTTA:
PRINTED BY HARI DAS GHOSH, AT THE CHAITANYA PRESS
63, Nimtollah Street.
1895.

মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড "বীণাপাণি"র সূচী।

[গদ্য]

[পদ্য]

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা নিতান্ত কৃতজ্ঞহৃদয়ে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সমীপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি,—

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী K. C. S. I., C. I. E.

শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ সামন্ত [হাটখোলা]

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সুর [হাটখোলা]

ইহারা সকলেই "বীণাপাণি"র উন্নতিকল্পে অর্থসাহায্য দ্বারা আমাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন।

যে সকল "বীণাপাণি"র বরপুত্র লেখক মহোদয়গণের সাহায্যে "বীণাপাণি" সসৌষ্ঠবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ হইতেছে, তাঁহাদের নিকট আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যেন পূর্ব্বের ন্যায় "বীণাপাণি"কে স্নেহচক্ষে অবলোকন করতঃ উহার উন্নতিকল্পে চেষ্টিত থাকেন।

যে সকল সংবাদ ও সাময়িকপত্র-সম্পাদক মহোদয়গণ বাল্যকাল হইতে "বীণাপাণি"র—হিতকামনা করতঃ "বীণাপাণি"কে উৎসাহিত করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি বন্ধুগণ "বীণাপাণি"র উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

২য় খণ্ড। } অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সাল। { ১ম সংখ্যা।

আমাদের কথা।

জগন্মাতা গণেশজননীর অপার করুণা বলে, জন্মকোষ্ঠীর হিসাবানুসারে, আমাদের "বীণাপাণি" অদ্য দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। প্রথম বৎসরের বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া, আজ পবিত্র হৃদয়ে, পবিত্র প্রাণে, সাধারণ সমক্ষে আগামী বর্ষের জন্য আমরা কয়েকটী নিয়মের অধীন হইব বলিয়াই এই প্রস্তাবনা। ইহার উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় অনুধাবন করিতে পারিবেন।

উদ্দেশ্য ভাল, মন্দ, মধ্যবিৎ, সকল কার্য্যেরই আছে; যিনি যাহা কিছু করুন না কেন, তাঁহার একটী শেষ ফলের দিকে লক্ষ্য থাকে। কেহ সদুদ্দেশ্যে কার্য্য করেন, কেহ বা অসৎ উদ্দেশ্যে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, আবার কাহারও কাহারও উদ্দেশ্য সৎও নহে অসৎও নহে। এই উদ্দেশ্যটী যেরূপ গুণ-যুক্তই হউক না কেন, প্রকাশ্যে বলিতে হইলে উত্তম উদ্দেশ্য বলিয়াই বর্ণনা করিতে এবং বিচার দ্বারা প্রমানিত করিতে হয়, অভাবপক্ষে মিথ্যা বলিয়াও সাধারণকে প্রতারিত করিতে হয়। এরূপ অবস্থায়, উদ্দেশ্য বিষয়ে কোন কথা বলিয়া বৃথাড়ম্বরের কোন ফলই নাই। তবে আমরা যদি নিতান্তই এ বিষয়ে নিরস্ত থাকি, তাহা হইলে হয়ত আমাদিগের পত্রিকাখানি সাধারণে পূর্ণাঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন না হইতে পারে।

যিনি যাহা কিছু সাধারণ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারই মনে মনে সঙ্কল্প থাকে, তাঁহার সে কার্য্য সাধারণের প্রিয় হইবে—সকলেই তাহা ভালবাসিবে। কে এমন ইচ্ছা করে, যে তাঁহার কার্য্য দেখিয়া কেহই প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন না, সকলেই দৃষ্টিমাত্র খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিবেন? সুতরাং সাধারণের ইষ্টসাধন ও তদ্দ্বারা আমাদের এই পত্রিকাকে সকলের প্রিয়মিত্র-স্বরূপ করাই আমাদের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। এ ইষ্টসাধন, চাটুকারিতা নহে; [illegible]তঃ যাহা ইষ্ট বলিয়া প্রতীত হইতেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইবে, সে ইষ্ট আমাদের প্রস্তাবিত ইষ্ট নহে। আমরা (যতদূর বিদ্যাবুদ্ধি) সাধারণ হিতসাধনে যত্ন করিব; ফললাভ অদৃষ্টের [illegible]ন্ত। ভিন্ন মতাবলম্বী-গণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া, পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিব; বিবাদের মধ্যস্থ হইতে গিয়া হয়তো সেই বিবাদ চক্রে ঘূরিতে হইবে, গৃহাদি গ্রাসশীল জ্বলন্ত হুতাশন নির্ব্বাণ করিতে গেলে উত্তাপ লাগিয়াই থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণ মধ্যস্থের ন্যায় বিবাদ মীমাংসার ছলে বিবাদ বাধাইবার যত্ন করিব না।—আমাদের এই পত্রিকা প্রকৃতির রঙ্গভূমিতে নৃত্য করিবে, কিন্তু মুখে মুখস পরিধান করিবে না। আমরা সমালোচ্য বিষয়ের যথাশক্তি সমালোচনা করিব—স্বাধীন মত প্রকাশ করিব, কিন্তু গ্রহগণের ন্যায়, বিষয় সকলের একদিক অন্ধকার ও অপরদিক আলোকময় দেখিব না বা দোষোৎ-কীর্ত্তনের সময় দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিব না।

মনুষ্য সাধারণের যে যে ক্ষীণতা আছে, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি পরিত্যাগ করা, সাধারণ কার্য্য নহে। সংসার-বিরাগী মহাপুরুষেরাও এককালে সে সকল ক্ষীণতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। যথা—"বলবানি-ন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।" সাধারণ কার্য্যে ব্রতী হইয়া—সেই সকল ক্ষীণতার অনুসরণ করা অকর্ত্তব্য। সে সকল গর্হিত বৃত্তির অনুসরণ করিয়া সাধারণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, তদ্দ্বারা মঙ্গল লাভ দূরে থাকুক বিপরীত ফল ভিন্ন কিছুই ফলে না; আমরা যে সেই ক্ষীণতা সকলকে এককালে নষ্ট করিয়া বিমল চিত্ত হইতে পারিব, তাহা ভরসা করি না,

সাধনার্থ লেখনীকে সে সকল দোষ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিব,—না পারি বিজ্ঞজনের নিকট তিরস্কৃত হইয়া, লজ্জিত হইব।

আমাদের এই পত্রিকা, সাধারণ রঙ্গভূমির নটের ন্যায়; ইহা আজি পাঠকবর্গের প্রীতি সাধনের জন্যই হউক বা নিজ কর্ত্তব্য সাধনের জন্যই হউক, সাধারণ সমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছে, ভবিষ্যতে প্রয়োজন বা অবস্থা বিশেষে নটের ন্যায় তিরোহিত হইতেও পারে, এবং প্রয়োজন হইলে বা অবস্থাবিশেষে পুনরায় রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেও পারে। সাধারণে যদি ইহার অভিনয়ে প্রীতি লাভ করেন, তাহা হইলে এই পত্রিকা ক্ষণকালও অভিনয় বিরত থাকিবে না।

মায়া।

বড়মানুষের অট্টালিকা নয়—গরীবের পুরান নোনা ধরা একতলা বাড়ী। সিংদরজায় দরওয়ান নাই, সদর দোরে খিল্ আঁটা। সদর দোরের ভিতর দিকে হাত পাঁচ ছয় গলিপথ, তার পরই ছোট খাট একটি উঠান। উঠানের তিন ধারে মোটা মোটা থামের সার গাঁথা, যেন কোন কালে বাড়িটি তৈয়ারি করার জন্য কেবল মাত্র গোড়া পত্তন হয়েই হঠাৎ কাজ স্থগিত হয়েছিল বোধ হয়। চকও নাই—পাঁচ সাত ফুকুরে দালানও নাই। এক দিকে একখানা কোমর ভাঙ্গা বুড়োর মত ঝুঁকে পড়া খোলার চালে একটি সদ্য বিয়ন্ত গাভী, (আগে শুনা যায় একটানে পাঁচ সাত সের দুদ্ দিত—এখন গৃহস্বামীর অদৃষ্ট গুণে এবেলা একপো ওবেলা একপো দিতেও সুরভী নন্দিনী মা জননী বুঝি কিছু কাতরা।) তার বাঁট ধোরে সজোরে টান্‌তে আরম্ভ করেছে, গয়লা বুড়ো,—আর চোঁ-চোঁ চিন্ চিন্ কোরে কেঁড়ের ভিতর থেকে মধুর আওয়াজ বেরিয়ে বাজ্‌চে—বাজ্‌চে একটী থুলথুলে গোলালো গালালো দুধে আলতায় ঢালা রঙের ৯।১০ বৎসরের হাসন্ত মেয়ের কাণে। হাসন্ত মেয়ে—ভাসা টানা চোখে—কোলের কাছে, হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধোরে রাখা, ধপ্‌ধপে পুঁটে বাছুরটীর ডেব্‌ডবে চোখের পানে চেয়ে ছিল—এমন সময় ঐ বাজনা কাণে গেল।—বালিকার কাণ খাড়া হ'লো, ঘাড় বেঁকলো—প্রাণে কি এক

সরল স্ফূর্ত্তির ঢেউ বুঝি উব্‌জে উঠ্‌লো—বাছুরের গলার হাত খুলে গেল,—বাছুর ছুটে গিয়ে গয়লা বুড়োর পিঠে ঢুঁ মাল্লে—গয়লা বুড়ো পিট সামলাতে গিয়ে হাঁটু নেড়ে ফেল্লে, কেঁড়ে পড়্‌লো ;—ভাঙ্গা পাঁচ সাত টুকরা জড়ামড়ি কোরে দুদেতে মাটিতে গোবরে মাখামাখি হ'য়ে গেল। খোঁড়া গয়লা বুড়ো, দাঁড়িয়ে উঠে নেংচাতে লাগ্‌লো, হাসন্ত বালিকা কাঁদ কাঁদ মুখে পাছু-পানে চাইতে চাইতে, কাল কুচ্‌কুচে এলানো ঢেউ খেলানো চুলের গোছা দোলাতে দোলাতে, থুপ থুপ কোরে অন্দরের ভিতর ছুটে পালিয়ে গেল ;—গাই পিয়িয়ে গেল—বাছুরের পো বাঁটে মুখে লেজ নেড়ে নাচ্‌তে লাগলো,—আর মায়ের পেটে ঢুঁ মেরে ক্ষিরের কলসী হজম কর্‌তে লাগ্‌লো ;—গাই-মাতার বাছুর বাছাটীর গা চাট্‌বার ধূম পড়ে গেল। এমন সময়ে মেয়েটীর গরীব বাপ, অসময়ে বিশেষ কি একটা দরকারী কথা নিয়ে,—আফিস্ থেকে গুটি গুটী এসে সদর দোরে ঘা দিল। বাপের কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে—মায়া এসে তাড়াতাড়ি সদর দোর খুলে দিলে। মেয়েটীর নাম মায়া।

মায়া, মোমের পুতুল, সোণার মেয়ে। বাপ মা ভাল বাসে—পাড়া পড়সী আদর করে—শত্রুতেও সে মুখের পানে ফিরে চায়। মায়া পাড়ার ছোট ছোট মেয়েদের দলের রাণী, মেয়ে স্কুলের প্রথম প্রাইজ ফি বারেই তার প্রাপ্য, আর আর মেয়েরা কিন্তু তাতে কখনও হিংসা করে না। মায়ার প্রাইজ পাওয়ার পর দিন—ফি বছরে মায়ার বাপ মা—পাড়ার মেয়ে মহলকে মায়ার নিমন্ত্রণে চড়াই ভাতি ক'রে খাওয়াতেন। চড়াই ভাতি নামে, কাযে কিন্তু ভরপেট্ এউ ঢেউ রকমের। মেয়েরা হাসে খেলে নাচে কান্দে—আর বলে "মায়া রোজ 'প্রাইজ' পাক।" মেয়ের মায়েরা বলে—"মায়ার মার একটি টুক-টুকে জামাই হ'ক।"

আর আমরা বলি—মাঠাক্‌রুণরা! ও আশীর্ব্বাদে কাজ নেই। কেন ?—মায়া কাঁদতে জানে না, সদাই হাসে, তাকে কাঁদাতে বা কান্নার রাজত্বে, সেঁদুতে দিতে আমাদের যেন প্রাণ কেমন করে। তা ব'লে মায়ার জীবলীলা স্রোত ফিরিয়ে দেবার আমরা কে ? সে জল-বিম্ব—জলে ফুটে উঠেছে, জলেই মিলাবে ; আমাদের কি সাধ্য যে তাকে মিলাতে দিতে না চাইব ? আর না চাইলেই বা শুন্‌বে কে ? পরদিন সকালে শোনা গেল, আগামী কাল রাত্তিরে মায়ার

বিয়ে। দেখি, তাড়াতাড়ি গায়ে হলুদ হ'চ্চে ঘনঘন শাঁক বাজচে্—বাড়িতে এয়েচরাণীদের হুলোহুলী প'ড়ে গেছে, পাড়ার মাগী মিন্‌সে মায়ার বে'তে যেন মেতে উঠেছে!

২

কৈ গো? তোমাদের মায়া মেয়েটীর বে—হয়েও তো হ'লনা। একি শুনি? অমন ভাল মানুষ গো-বেচারি মায়ার বাপ, সেকি আর এমন কেলে-ঙ্কারিটা ক'র্ত্তে পারে? মায়া মেয়েটীর বাপ—ছেলের বাপের স্ক্রুপের পেঁচের নিচে বুঝি (কষ্ট স্বষ্টে) ৫০০ পাঁচ শত টাকার সসাজ সোণা রূপার গহনা ও (বিশেষ পেড়াপিড়িতে) ৫০০ পাঁচশত টাকা নগদ দোবার কথা ক'য়ে ছিলেন। তারপর বিয়ের সময় ৫০০ টাকার গহনা পরিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে সম্প্রদানটা সেরে নিয়ে, নগদ টাকাটা কাল দোব বলে ছিলেন! বরকর্ত্তা তাই মহা চ'টে, আইনমতে বিবাহিত হ'লেও—গায়ের জোরে বরকে ল'য়ে বের রাত্রেই স'রে পড়েন।

মায়ার বাপ মন্‌কে বোঝালে "সম্প্রদান তো হয়ে গেছে"—মায়ার মা কিন্তু কোট্ ধল্লে "বাসর হ'লনা—বাসিবিয়ে হ'লনা" ও সব না হ'লে বে মঞ্জুর নয়। মায়া মনের ভিতর লুকিয়ে চুপি চুপি মনে ক'ল্লে "এবিয়ে বুঝি বিয়ে নয়—আমার বুঝি তবে বিয়ে হ'লনা"—; টানা চোখের জল এই প্রথমে পড়লো, হাসন্ত মুখে এই প্রথম বিষাদের কাল রেখা দেখা দিলে; কানা খোঁড়া, কাল কুৎসিত, দুষ্ট শান্ত, সব মেয়েই বিয়ের দিনে রাজরাণীর সুখ ভোগ করে, আহা! এ সোণার বাছার এহেন বিয়েতে বিন্দুমাত্রও সুখের মুখ দেখা হ'লনা। মায়ার বাপ আতান্তর ভেবে,—বিয়ের পরদিন সকাল বেলা বরের বাপের বাড়ী গিয়ে, তার দুটি পা জড়িয়ে পড়লেন। বরের বাপ বোসজা বুড়ো কসাই, তার সানানো ছোরাখানি যেমন তেম্‌নি ঘরে ফিরে এসেছে, এরাগ কি তার আর রাখবার জায়গা আছে? মেয়ের বাপের না হ'ল একটু ঘা, না পড়্‌লো একটু রক্ত—শীকার ভ্রষ্ট—বাঘের মত বরকর্ত্তার গর্জ্জনে পাড়া পড়সী ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো। মায়ার বাপ পায় ধরাতে—সে গর্জ্জন থামা চুলোয় যাক—পলে পলে বাড়তে লাগলো।—কনের বাপ যত—মিনতি করে, বরের বাপ তত চেপে ধরে। কনের বাপ বলচে—"আমার জাত রক্ষা করুন"। বরের বাপ বল্‌চেন "আজকাল

টাকায় জাত টাকা হাজির কর"। কনের বাপ বল্‌চে—"টাকা যে আর নেই বেয়াই!" বরের বাপ বোলচেন—"তোমার ভাত খাবার থালা ঘটি বাটীতো আছে তাই বেচে আমার টাকা যোগাও!" ঠাট্টা, বোটকেরা, ধমক, গালাগাল, কিছু-তেইকিছু হ'লনা দেখে, বরের বাপ শেষ মায়ার বাপের সেই—পুরান নোনাধরা একতালা বাড়িখানি নিজের কাছে বন্ধক রেখে ছেলেকে ছাড়লেন্। এযাত্রা মায়ার বে সাঙ্গ হল। বে হ'ল—কিন্তু বের পর? বেরপর হাসবার পালা ফুরাল—মায়া আমাদের কাঁদতে কাঁদতে সেই যে শ্বশুরবাড়ী গেল, সে কান্না শেষ হোতে কি আর কেউ দেখেছ? বড় কান্না কেঁদে ছিলো—প্রথম শ্বশুর বাড়ি যেতে কোন বিয়ের কনে তো এতো কান্না কান্দেনা!

পাঠক! সে দুঃখিনীকে যদি আর একবার দেখতে চাও তো আমার সঙ্গে এস।

৩

কৈ মায়া? মায়াকৈ?—আর কৈ।

রাজা রাজড়ার বড় বড় প্রাসাদ বা বড়মানুষের বা বড় গেরোস্তর মানান সই মাঝারি গোছের গাড়িবারান্দাওলা চকমিলোনো চক্‌চকে বাড়া, খুব জমজমাট্, দরওয়ানে-চাকরে—দাসীতে ঝিয়েতে, বেহারায়-খানসামায়,—সরকারে গোমস্তায়, নায়েবে-দাওয়ানে গিস্ গিস্ কোচ্চে। টাকার কাঁড়ি, কাছারি ঘরে টাকশালের মত অনবরত ঝুন্ ঝুন্ রবে আস্‌ছে—যাচ্চে! বড় গেরোস্তর সামাজিক বড়মান্‌ষি, ধীরে ধীরে প্রতিভাত হচ্চে; ধীরে ধীরে দশ জন, বিশ জন, পঁচিশ জন, শত জন, সহস্র জন জ্ঞাতি কুটুম্ব বড় গের-স্তকে বড় মানুষ বোলে জান্‌চে—জানাচ্চে। বড় গেরস্ত বোস্‌জা বুড়কে একবার ঝেড়ে পুরুষ দলে ফেলে, ভবিষ্যৎ নিন্দার পথ খুলে রাখ্‌ছে। বড় গেরোস্তর বাড়া মায়ার শ্বশুর বাড়া। ছোট গেরোস্ত বোস্‌জা বুড়োর পোড়ো বাড়ি—ভোরপুর ভাঙ্গা-চোরা একতালা কোঠা, মায়ার পদা-র্পণে পূরো মেরামতে তেতালা বাড়িতে পরিণত! লক্ষীমন্ত বউয়ের আগমনে, শ্বশুরের স্বোয়ামীর অবস্থা উথলে উঠেছে—বে'রকনে ঘরে এসে দুধের কড়ায় দুধ উথলুতে দেখেছে; শোকের সংসার সোণার সংসারে দাঁড়ি-য়েছে—সুলক্ষণা মায়া মেয়েটি শ্বশুরকুল উজ্জ্বল করে এসে—ঘরে উঠেছে।

শ্বশুর ঠাকুর কোমিসেরিয়েটের হেড গোমস্তা; তিন লাক টাকার বিলেত আপীল জিতেছেন; চিমড়ে মড়া শাশুড়ি মাগীর গা-ভরা গহনার উদ্ধার হয়েছে, স্বোয়ামীর মাসমাহিনা ৫০ টাকা একলাফে ১০০ টাকায় উঠেছে, লক্ষ্মীঠাকরুণ যেন মায়া মহাশয়ার পাশে বোসে, এ বাড়িতে এসে পোড়ে—আর বেরুতে পাননি;—কেননা মায়ার বাপ বেচারির উপর, ছেলের বাপ—দাদ্ তুল্‌তে—রাগ জানাতে—তেজ ফলাতে, বের পরে মায়া মেয়েটীকে সেই এনে আর পাঠাননি।—মায়া রইল—লক্ষ্মীও রইল—আর বোস্‌জা বুড়োর দরোজা পেরোবার জো রইল না। কিন্তু মায়া যদি রইল—তবে মায়া কৈ? লক্ষ্মী ঠাকরুণের জীবন্ত সত্বাতো চার্দ্দিকে দেখছি,কিন্তু যে বেচারি লক্ষ্মী আনলে, সে বেচারি কই? এত বড় বাড়ীতে, এত বড় অন্দরে—পাঁতি পাঁতি কোরে খুঁজে বেড়াচ্চি—সে বেচারি কই? কোথায় গেল? শত আদরের আদরিনী হোয়ে—সেই সোণা হেন হাসন্ত মুখে, সম্পদের আলো ছড়াতে ছড়াতে—আনন্দের ফুল ফুটাতে ফুটাতে—সে সদানন্দময়ী সোণার মেয়েটি—বাড়ির কনে-বউটি কই—কোথায় গেল?—বনের ফুল,—বনে ফুটে,—বনের হাওয়ায় হাসে; পরে-বনেই শুথায়—বনেই ঝরে যায়। এযে উদ্যান কুসুম,চক্ষের সাম্‌নে হ'তে কোথায় গেল? সোণার কমল কোথায় লুকাল? কোথায় সে? আহা ওইযে! ওইযে! আহাহা মরি মরি! একি দেখি! একি দেখি? সর্ব্বনাশ!!!

বর্ষাকালের ভোর ভোর কেন—প্রায় সকাল।—অন্ধকার,—আকাশে ঘনঘটার সঙ্গে মুষলধারে জল ঝোর্‌ছে; শব্দ হোচ্চে ঝর ঝর ঝর। বাদলে দিনমণি মেঘে ডুবেছেন—আঁধারে আঁধার! সকাল হয়ে গেলেও ভোর।—আঁধার মাথা সেই ভোরে, রান্নাঘরের দরজা জানালা দিয়ে, থাকায় থাকায় ধোঁয়ার রাশ বেরুচ্চে! সেই ধোঁয়ার বাধা ঠেলে—চোখ বাঁচিয়ে—এগিয়ে গিয়ে উনুন শালে একি? একি দেখি? সর্ব্বনাশ!!! সেই তো বটে! সেই ভাসা ভাসা টানা চোক্—একি? এযে একেবারে বোসে গেছে—নিচের কাল রঙ্গের রেখা বেস ফুটে উঠেছে! সেই ফুলো গাল শুকিয়ে হাড় বেরুনো হোয়ে গেছে! সেই টুক্‌টুকে ঠোঁটে কে যেন মিশি ঢেলে দিয়েছে; সেই সুডোল গোলগাল হাত ছার শুকিয়ে বাঁথারি হোয়ে গেছে—চাঁপার কলি আঙ্গুল কটি,গাঁট ফোলা কঞ্চির ভাব ধারণ কোরেছে! মুখের বাহার গেছে চুলের বাহার গেছে—

বরণ গেছে ধরণ গেছে! অমন দুধে আল্‌তার রঙ্গের ওপর যেন কেউ এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দেছে! আমাদের মায়া মেয়েটি আহা! আদখানিকিবা সত্তি কথা বল্‌তে কি সিকি খানি হোয়ে গেছে! উনুনের উপর যেন কতকগুলো হাড়গোড় উপুড় হোয়ে পোড়ে—ফুঁ পাড়ছে—আর ঘন ঘন চোখের জল মুছ্‌চে! বাছাকে কেউ দেখ্‌বার নাই—কেউ আদর করবার নাই—কেউ ভাল বাসবার নাই! বের কনে বনের মৃগী! তায় বন থেকে তারে ধোরে নিয়ে এসে পিঁজরে পুরে রেখে—আধ পেটা খেতে দিয়ে—অনবরত তাড়নার পানিগ্রী কোরে রাখলে যা হয়, তাই হোয়েছে! আহা! আজও আবদ্ধ মৃগী কত কেঁদেছে—পিঁজ্‌রের কঠিন লৌহ দণ্ডসারের পানে নিরাশ নয়নে চেয়ে চেয়ে কত বুক্ ভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলেছে, কতবার রক্ষকের পানে কাঁদ কাঁদ ভাসা ভাসা চোখে চেয়ে, ভিখারিণী বোলে, নীরবে নিরজনে প্রণিপাত কোরে জানিয়েছে, কেউ তা দেখেও দেখেনি, শোনেনি, কেউ গ্রাহ্য করেনি! অগ্রাহ্যের হুতাশে হুতাশে, তাচ্ছিল্লের তীব্র শেলাঘাতে, সেই থুল্‌থুলে সোণার মেয়ের আজ এই দশা! এই বাঁচন-মরণের ঘোর সমস্যা! পুঁটে মেয়ে এই ভোরে কোথায় প্রাণ-পুরে ঘুমাবে, তা নয় দুর্ম্মুখা দুঃশীলা নিরদয়া শাশুড়ির ব্যঙ্গের ভয়ে, গালাগালির ভয়ে, প্রহারের ভয়ে, আস্তে ব্যস্তে বুড়ো শশুরের চা তইরি, আর ঘুব স্বোয়ামীর দুধ গরম কোর্ত্তে ছুটে এসেছে! বাড়ির ঝি, গিন্নির সোহাগের। সে ভোরে উঠে উনুনে আগুন দেবে—তার দায়? পুঁটে বউটা তবে কি কর্ত্তে আছে? রাধুনি মাগী কর্ত্তার সোহাগের; সে ভোরের সময় না ঘুমিয়ে অম্‌নি অম্‌নি তার বাসা থেকে উঠে এসে চা দুধ গরম কর্ত্তে তার বোয়ে গেছে! পুঁটে বউটা কাঁড়ি ভাত খাবে, আর গতরে আগুন লাগিয়ে বোসে থাকিবে একথা কর্ত্তাও বলে গিন্নিও বলে; ঝিও যে না বলে—তা নয়! রাধুঁনি তো রোজ একবার কোরে না বল্লে হাঁড়ি ছোঁন্ না! শেনে সেই আমাদের মায়া বেচারি; শুষ্কমুখী হোয়ে শোনে, কাঁদে—লুকিয়ে লুকিয়ে দারুণ ভাবনা ভাবে আর বুকের রক্ত শুখাতে থাকে। এসব পাশব অত্যাচারের কথা, কাতরা কুলবধূ স্বোয়া-মীর কাছে বলেনা, মুখবুঝে মাথাগুজে কাঁদে আর হাসেনা। হাসন্ত মায়া হাসেনা—কাঁদে—বড্ড কাঁদে; কেঁদে কেঁদে শরীরপাত কোরে ফেল্‌ছে; সজীব সুটোল নরম দেহ পড়ে পড়ে, দিনে রেতে শুকিয়ে শুকিয়ে তিল তিল করে

মরনের পথে এগিয়ে যাচ্চে! কালের কাল, মহাকাল ফুরুচ্চে জেনে,—কোল পেতে ধরেনিতে আস্তে আস্তে আগবাড়িয়ে আস্‌চেন। অকালে মায়ার জীবলীলা বুঝি সাঙ্গ হয়,—হায়!!! স্বপ্নের মত এসে বুঝি স্বপ্নের মত অজানিত দেশে কোথায় চলে যায়!

ক্রমশঃ—

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

বৃত্তি বিভ্রাট।

সমাজের পরিপুষ্টির সহিত সামাজিক অভাবও বর্দ্ধিত হয়, ইহা প্রকৃতি-সিদ্ধ; আবার সেই অভাব উপলব্ধি হইলেই তৎপরিপূরণের উপায়ও সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবিত হইতে থাকে, কারণ অভাব, উদ্ভাবনের প্রসূতি। যেমন সমাজের অভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অমনি প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব মোচনার্থ কতকগুলি লোক সেই সেই বস্তুর সরবরাহে নিযুক্ত হয়, এইরূপে বৃত্তিভেদ অনুসারে শ্রেণীভেদের সংগঠন হইয়া থাকে। এই প্রকার শ্রম-বিভাগ সমাজের অশেষ মঙ্গলজনক। সমাজে কেন, সকল কার্য্যালয়েও শ্রম-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে শ্রমী ও প্রভু উভয়েরই সুবিধা হয়।

এই হিন্দু-সমাজের আদিম অবস্থায় এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, শ্রমবিভাগ বা কার্য্যবিভাগ প্রথা সমাজে কল্পিত হইয়াছিল; এবং বৃত্তিভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণী গঠিত হইয়াছিল। যজন, যাজন, অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণের, যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্ষত্রিয়ের, বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি বৈশ্যের এবং দ্বিজাতি-সেবা শূদ্রের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। কালক্রমে এই সকল বৃত্তি বংশপরাম্পরাগত হইয়া, তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক স্বতন্ত্র জাতি হইয়া উঠেন এবং একজাতির সহিত অন্য জাতির আহারাদি সামাজিক ক্রিয়া উঠিয়া যায়। ক্রমে এমন হইয়া উঠিল যে, একের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অন্যে যাহাতে অনুষ্ঠান না করে তদ্বিষয়ে সমাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আসিয়া পড়িল এবং সামাজিক শাসনও প্রয়োজন হইল। বিশেষ বিশেষ কারণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের, ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের, এবং বৈশ্য শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন বটে, কিন্তু নিতান্ত দায়েপড়িয়া ও অনিচ্ছায়। মহর্ষি মনু বলেন,—ব্রাহ্মণগণ যখন স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও

পোষ্যপালনে নিতান্ত অসমর্থ হইবেন তখন আত্ম ও পরিবার রক্ষার জন্য, ক্রমে নিম্ন অর্থাৎ প্রথমে ক্ষত্রিয়ের, তদভাবে বৈশ্যের বৃত্তিও অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু প্রাণান্তেও শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না; তাহাতে তিনি পতিত হইবেন ও তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত কতকগুলি দ্রব্যের ব্যবসা ও উঞ্ছবৃত্তিও ব্রাহ্মণের পক্ষে অতীব নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্রগণ ক্রমে দ্বিজাতি সেবায় পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ হইলে, দ্বিজাতির ব্যবহারোপযোগী বস্তু নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইলেন সুতরাং তাহাদের মধ্যেও আবার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল এবং এই শ্রমবিভাগানুসারে বৃত্তিভেদে, তন্তুবায়, সূত্রধার, কর্ম্মকার, বণিক প্রভৃতি নানা জাতির সৃষ্টি হইল এবং এই সকল বৃত্তিও বংশ পরম্পরাগত হইয়া কালে তাহারাও পরস্পরে এত ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়িল যে, তাহাদেরও পরস্পরে সামাজিকক্রিয়া লুপ্ত হইয়া গেল। এতদ্ভিন্ন অনুলোম বিবাহ তৎকালে প্রচলিত থাকায়, সমাজে কতকগুলি বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি হইয়াছিল; তাহাদের আভিজাত্য বিবেচনায় উচ্চনীচ ক্রমে নানাপ্রকার বৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির বৃত্তি এত নিকৃষ্ট যে আজিও তাহারা সমাজে অতিনীচ ও হেয় হইয়া রহিয়াছে।

সামাজিক সুবিধার্থে শ্রমবিভাগ বা বৃত্তিভেদ এবং বৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে উচ্চ নীচ প্রভৃতি সম্মান, সকল সভ্য সমাজেই বর্ত্তমান আছে, তবে হিন্দু-সমাজে এই জাতিভেদ প্রথা যত কঠোরভাবে রক্ষিত ও পরিচালিত, অন্য কোন সমাজে তত নহে; কারণ অন্য সমাজের বৃত্তি—বংশগত নহে। হিন্দু-সমাজে এই বৃত্তিভেদেই জাতিভেদ-প্রথার মূলভিত্তি এবং সমাজের কল্যাণ-দায়ক। এই বৃত্তিভেদে যত গোলযোগ ঘটিবে, ততই সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে।

এখন আর সামাজিক শাসন নাই, সমাজের মস্তক নাই সুতরাং সমাজ-রাজ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়া বৃত্তি বিভ্রাট ঘটিয়া গিয়াছে। একদিকে যেমন বিলাসিতার বৃদ্ধিতে লোকের অর্থের অনাটন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অন্য-দিকে সেইরূপ সমাজের শাসন শিথিল হওয়ায় অর্থের চেষ্টায় সকলেই পর বৃত্তিতে লাভবান্ হইবার আশায়, বৃত্তি চুরি আরম্ভ করিতে লাগিলেন। এই

বৃত্তি বিভ্রাটে যে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আজ কাল কামারকেও কুমার বৃত্তি সাজিতেছে। এই বৃত্তি-বিভ্রাটের বিষময় ফলে, বৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে, সামাজিক সম্মান লুপ্ত প্রায় হইতেছে, নীচ উচ্চগামী হইয়া উচ্চের সম্মানে আঘাত করিতেছে; নীচের প্রাধান্য বর্দ্ধিত হইয়া একদিকে যেমন সমাজে নানা গোলযোগ বর্দ্ধিত হইতেছে, অন্য দিকে তেমনই স্বস্ববৃত্তি হারাইয়া বৃত্তিজীবী মাত্রেই অসন্তুষ্ট হইতেছেন। প্রত্যেকে স্ব স্ব বৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিলে, কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় অথচ সমাজেও কোন প্রকার অশান্তি উপস্থিত হয় না।

বৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে সামাজিক সম্মানের তারতম্য—সভ্যসমাজ মাত্রেই আছে—থাকাই যুক্তি সঙ্গত। বৃত্তির উপর মানব প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে অর্থাৎ যে যেরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিবে তাহার মনোভাব, প্রকৃতি, রুচি তদনুযায়ী বিভিন্ন হইবে। আবার যে সমাজে সেই বৃত্তি বংশগত, সে সমাজে সে প্রকৃতি আরও দৃঢ়তর হইবে ইহা নিশ্চয়। একজন চর্ম্মকারের প্রকৃতি অবশ্য একজন কর্ম্মকারের প্রকৃতি অপেক্ষা অনেক নীচ হইবেই হইবে, একজন স্বর্ণকার শত চেষ্টাতেও একজন কায়স্থ বা ব্রাহ্মণের তুল্য হইতে পারিবে না। বৃত্তিভেদে এই প্রকৃতি, দেহের সহিত এত মিশিয়াগিয়াছে যে, ২।৪ পুরুষে তাহা পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। যাঁহারা মুখে জাতিভেদ মানেন না তাঁহারাও প্রকৃতিগত এই তারতম্য সুস্পষ্ট দেখিতে পান এবং স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারাও অধ্যাপনাদি গুরুগিরি কার্য্যে উচ্চজাতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে চাহেন। গুরদায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যে উচ্চ বংশীয়কে নিয়োগ করিবার প্রথা সভ্য সমাজ মাত্রেই আছে।

একটা প্রচলিত কথা আছে—"যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যকে লাঠীবাজে" কিন্তু এখন সকলকেই সকল কর্ম্ম সাজিতেছে। এখন কে অধ্যাপক, কে কর্ম্মকার, কে চর্ম্মকার, কিছুই জানিবার উপায় নাই। সকলই একাকার! সকলেই সামাজিক একাসনে উপবিষ্ট! যে সকল নীচ বৃত্তি অবলম্বনে ব্রাহ্মণ "পতিত" হইতেন এখন সেই সকল নিকৃষ্ট বৃত্তিই তাঁহার অবলম্বন। আবার যাহারা সেই নিকৃষ্ট বৃত্তি জীবী ছিল, তাহারা নিজবৃত্তি হারাইয়া অন্যের বৃত্তি ধরিয়া বসিয়াছে।

যে কার্য্যে যে ব্যক্তি পুরুষ পরম্পরায় অভ্যস্ত, সে কার্য্য তাহাদ্বারা যেমন সম্পন্ন হইবে, অন্যদ্বারা কখনও সেরূপ হইতে পারিবেনা। একজন তন্তুবায়ের সন্তান বস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, একজন সূত্রধারের পুত্র কখনও সেরূপ পারিবে না; কিন্তু কাষ্ঠের কার্য্য সে যেমন বুঝিবে, তন্তুবায় শত চেষ্টাতেও তাহা পারিবে না। সুতরাং নিজ নিজ বৃত্তিতে সহজে ও অল্পব্যয় প্রস্তুত দ্রব্যে স্বয়ং ও সমাজ উভয়েই যেমন স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে, পরবৃত্তিতে উভয়ে কখনই সেরূপ সুখে থাকিতে পারিবে না। আবার নিজ নিজ বৃত্তিতে থাকিয়া উন্নতির চেষ্টা করিলে, বৃত্তির ও তৎসঙ্গে অবস্থারও উন্নতি, এবং সমাজও দিন দিন উন্নত হইতে পারে, কারণ সামাজিক উন্নতি, ব্যক্তিগত উন্নতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে—সমাজ, ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র।

শ্রীবিনোদ বিহারী চট্টোপাধ্যায়।

গান।

প্রাণ যারে পায়, প্রাণ দিয়ে তায়, চায় না কেন প্রাণ?
সে আপ্না হারা, মাতোয়ারা, দেখে চাঁদ বয়ান।
তার সনে তার কখন পরিচয়,
সুধালে তা' কয়না কথা, মৌণভরে রয়,
সে বিনি মূলে আপ্না বেচে, বাড়ায় আপন মান।
ফুলের হাসি চাঁদের বুকের পর,
কে যেন তায় বেঁধেছিল ঘর,
সেথায় তারে দিবানিশি, করে সে সন্ধান,—
কেঁদে কেঁদে দেখ্‌তে পেলে তায়,
সরম ভরে দূরে সরে যায়,
মরা-প্রাণে যায় ডেকে তার প্রেমের উজান বাণ
ডাক্‌লে তারে একটু ঈশারায়,
লুটিয়ে প'ড়ে চরণে মিলায়,
সে আত্মদানে আপ্‌নি সুখী, চায়না প্রতিদান।

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চি।

রাজ-কুমার চণ্ড।

প্রাচীন হিন্দু-চরিত জগতে অতুলনীয়, তদ্রূপ মোহনীয় চরিত্র জগতে অদ্বিতীয়। যখন দারুণ অন্তর্ব্বিবাদে হিন্দুদের অধঃপতন হইয়াছে, যখন তাঁহারা পাশ্চাত্য বীরগণের অভিযানে নিপীড়িত,—সময় সময় বিজেতার কঠোর শাসনে নিষ্পিষ্ট, তখনও—সেই অধঃপতিত অবস্থায়ও—তাঁহাদের চরিত্র যেমন পবিত্র ছিল, তাহা দেখিয়া একদা মেগেস্থেনিস্ বিমোহিত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন হিন্দু-চরিত-রত্ন, একমাত্র পুরাণ-সাগরেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে; সে সাগর বিমথিত করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করা, সামান্য বুদ্ধি বা গবেষণার কর্ম্ম নহে।

মহাভারতের শিবি যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় সুন্দর-চরিত জগতে দুর্লভ। ভীষ্মদেব-চরিত পাঠে, কোন ব্যক্তি বিমোহিত না হইবেন?—তাঁহাকে দেবভাবে পূজা না করিবেন? ভীষ্ম-চরিত পুরাণ-সাগরের কৌস্তভ, চরিত উদ্যানের মন্দার,—তাহার তুলনা নাই, সে আপনি আপনার তুলনা। একপাত্রে তেমন—জ্ঞান, ধর্ম্ম, বীরত্ব, তেজস্বীতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সত্যপ্রতিজ্ঞতাদি গুণ এক ভীষ্ম ব্যতীত, আর কাঁহার দৃষ্ট হয়? অতএব এক ভীষ্ম চরিতই জগতে অদ্বিতীয়—অতুলনীয়;—এক ভীষ্ম চরিতেই উৎকৃষ্ট গুণাবলীর একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাণের কল্পনা-জাল ভেদ করিয়া, অদ্য এই বীরচরিত অনুশীলন করিতে যাইব না; ইতিহাসের বিমল জ্যোতিতে প্রজ্জ্বলিত, হিন্দুদের দুরদৃষ্ট সময়ের একটী বীরচরিত—একাংশে ভীষ্মচরিতের ন্যায়, প্রখর মনীষা সম্পন্ন আর্য্যবীরের অধঃপতিতকালের গৌরব স্বরূপ সেই ছবি, অদ্য পাঠকগণের সম্মুখে ধরিব। কঠোর প্রতিজ্ঞা-পালন-হেতু ইনি মিবারের "ভীষ্ম" বলিয়া পরিকথিত হইয়া থাকেন;—ইহার নাম চণ্ড।

একদা সূর্য্যবংশীয় নৃপতি রাণা লাক্ষ, পারিষদবর্গে প্রবেষ্টিত হইয়া, রাজসভায় সমাসীন, চিতোরের সর্দ্দার সামন্তগণ মর্য্যাদানুরূপ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট, এমন সময় মারবার-রাজ রণমল্লের নিকট হইতে সম্বন্ধ-বন্ধন-সূচক

"নারিকেল" লইয়া, এক ঘটকচূড়ামণি তথায় উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসানুসারে দূত উত্তর করিল—"মহারাণার পুত্র কুমার চণ্ডের সহিত, মারবার-রাজকুমারীর পরিণয় সংঘটিত হয়, সুন্দরাধীপতির এই অভিলাষ; এখন তিনি আপনার আদেশ প্রার্থী।" এ প্রস্তাবনাকালে, চণ্ড রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না। রাণা দূতকে কহিলেন,—"চণ্ডের আগমন পর্য্যন্ত একটু অপেক্ষা কর, সে ইহাতে নিশ্চয়ই সম্মত হইবে।" তৎপরে তিনি পরিহাসচ্ছলে দূতকে কহিলেন,—"আমার ন্যায় বৃদ্ধের জন্য, বোধ হয় তোমরা এখন ক্রীড়নক প্রেরণ কর না।" এই মধুর রহস্যে, সভাস্থ সকলই আমোদ-স্নাত হইয়া হাস্য করিতে লাগিল।

আনন্দ-স্রোত বহিতেছে, সকলেই রহস্যবাক্যের প্রশংসা করিতেছে, এমন সময় রাজনন্দন সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল যে, পিতা ক্ষণেকের জন্যও যাহাকে অভিলাষ করিলেন, তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা কি পুত্রের উচিত? "না—কখনই নহে।" ঝটিতি তাঁহার মনে এই মীমাংসা উপস্থিত হওয়ায় তিনি এ কার্য্যে অস্বীকৃত হইলেন।

মত পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইল, মধুর স্নেহবাক্যে অনুরোধ করা হইল, কিন্তু সে অপরিবর্ত্তনীয় মত ফিরিল না। অবশেষে ভীতি প্রদর্শন করা হইল, কিন্তু বৃথা;—তাঁহার অটল প্রতিজ্ঞা টলিল না। রাণা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ ও প্রবল অদম্যতা হেতু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার বিষম প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিল না।

রাণা মহাশঙ্কটে পড়িলেন! তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এখন বিবাহ না হইলে, রাজ-বাক্য কিরূপে রক্ষা হইবে? শঙ্কটে পড়িয়া, এ বিষম ভার আপনিই বহন করিতে মনস্থ করিলেন। রোষে, মাৎসর্য্যে নিপীড়িত হইয়া, তিনি কহিলেন—"ভাল, আমিই সে রমণীর পাণিগ্রহণ করিব; কিন্তু চণ্ড! জানিও—এই রমণীর গর্ভজাত সন্তানই আমার উত্তরাধিকারী হইবে, সে-ই এ রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। আর এ প্রস্তাবে স্বীকৃত আছ বলিয়া এইস্থানে শপথ কর। বল যে, তুমি তখন স্বত্ব ত্যাগ করিবে, নির্ব্বিরোধে অধিকার ছাড়িয়া দিবে।"

রাজ-সভা নিস্তব্ধ—নিস্পন্দ, চণ্ড ধীর—অবিচলিতভাবে শুনিলেন। তাঁহার মন একটু মাত্র বিচলিত বা সঙ্কুচিত হইল না, মস্তকের একগাছি কেশও নড়িল না। তিনি শান্তভাবে—ধীর, নম্র বচনে—অকম্পিত স্বরে, উত্তর করিলেন;—"পিতঃ! আমি যথার্থই বলিতেছি—আপনার দ্বিতীয় পুত্র হইলে আমি রাজ্য-স্বত্ব স্বতঃই ত্যাগ করিব।" চণ্ডের প্রচণ্ড প্রতিজ্ঞা, অপূর্ব্ব নির্ভীকতা ও উদ্দীপ্ত তেজস্বীতা দর্শনে, সভাসদ্‌গণ চমৎকৃত ও বিমোহিত হইলেন।

কালের বিচিত্র গতি, কাল চক্রে আবর্ত্তিত হইয়া কত অসম্ভাবিত ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখাগিয়াছে! এস্থলেও তাহাই হইল, ভবিতব্যতার অচিন্ত্য বিনিয়োগে, পঞ্চাশদ্বর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত, দ্বাদশ বর্ষীয়া বালা সংমিলিতা হইল। এই অপূর্ব্ব চিন্তিত বিষম মিলনের শুভ ফল—মুকুল।

মুকুলের জন্মের পরই, পবিত্র গয়াক্ষেত্র পাপ যবন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। নানা দিগ্দেশ হইতে হিন্দুবীরগণ সেই তীর্থ উদ্ধারার্থ, তথায় সংমিলিত হইতে লাগিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্র রক্ষার্থ এ সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ; সুতরাং কোন্ ক্ষত্রীয় বীর ইহাতে যোগ না দিবে? হিন্দু-ধর্ম্ম-পীড়ক যবনের কঠোর শৃঙ্খল হইতে, "পেলিষ্টাইন" উদ্ধারোন্মুখ পাশ্চাত্য নৃপতি বর্গের ন্যায়, প্রতি হিন্দুযোদ্ধা গয়াভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিলেন; ইহাতে বৃদ্ধরাণা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি উৎফুল্ল হৃদয়ে সেই পূততম্ ধর্ম্মসংগ্রামে যোগ দিলেন।

জীবনের সুদীর্ঘকাল উদ্যাপিত হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে মৃত্যুর ভীষণ ছায়া; এ সময়ে ধর্ম্মার্থ জীবন ত্যাগ করা অপেক্ষা, রাজপুতের প্রার্থনীয় আর কি আছে? রাণা সাদরে এ সুযোগ গ্রহণ করিলেন।

গমনের পূর্ব্বে, রাজ্যের ভবিষ্যত একবার মনে পড়িল। ভাবিলেন,—'রাজাসন লইয়া যদি সঙ্ঘর্ষ সমুপস্থিত হয়?' এ ভাবনা উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি চণ্ডকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"যে পবিত্র ব্রতোদ্যাপনে যাইতেছি, তাহা হইতে ফিরিয়া আসা অসম্ভব; তা'ই জিজ্ঞাস্য—মুকুলের জীবন ধারণের জন্য কোন্ সম্পত্তি নিদ্ধারিত হইবে?"

অবিচলিত চিত্তে, ধীরভাবে—চণ্ড তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"চিতোরের রাজসিংহাসন।" "চিতরের রাজসিংহাসন"—এ অদ্ভুত উত্তর

শ্রবণে সভাস্থ সকলেই বিস্মিত হইলেন, সকলেই মনে মনে চণ্ডের ভূয়সী প্রসংশা করিতে লাগিলেন। "চিতোরের রাজসিংহাসন"—এ সরল উত্তর বৃদ্ধ রাজার অন্তরে বিষম বাজিল; কিন্তু পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা,—কি করিবেন?

চণ্ড তম্মুহূর্ত্তেই মুকুলের অভিষেক করিতে চাহিলেন। পাছে কেহ সন্দেহ করে বলিয়া, তিনি অচিরেই আপন প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন, অগ্রবর্ত্তী হইয়া তিনিই প্রথমে মুকুলজীকে রাজসম্মান প্রদর্শন করিলেন। চণ্ডের অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আশ্চর্য্য আত্মত্যাগ দর্শনে সমাগত জনগণ বিমোহিত হইয়া একবাক্যে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

যে রাজাসনের জন্য জগতে মহা অনর্থপাত সংঘটিত হইয়া থাকে, যাহার জন্য কতবার নরশোনিতে ধরা পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে, যাহার লোভে কত পাপী ভাতৃরক্তে—পিতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছে, সেই রাজাসন—বুদ্ধিবিভ্রংশি, মোহকরী সেই রাজাসন, চণ্ড স্বেচ্ছায়—অবহেলে পরিত্যাগ করিলেন। আপন প্রতিজ্ঞা সংরক্ষা হেতু জ্যেষ্ঠত্ব সত্বেও, কনিষ্ঠের পদানত হইলেন!—যে তাঁহার আজ্ঞাকারী, তিনি তাঁহার আজ্ঞাবহ হইলেন—একি সামান্য মহত্ব, সামান্য উচ্চ হৃদয়ের কার্য্য? তাঁহার এ ঔদার্য্য, এ স্বার্থত্যাগ নরলোকের উপযোগী নহে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট, পাপক্লিষ্ট জগতের লোকে, হায়! এ মহত্বের প্রতিদান জানেনা; জানেনা বলিয়াই মুকুলের ক্রূরচরিতা জননী হিংসা, এ অতুল ত্যাগস্বীকারের মর্ম্ম বুঝিল না!

মকুল-জননী হিংসা ভাবিয়াছিলেন—পুত্রের অপ্রাপ্ত বয়স কালে তিনি নিজেই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন। তাঁহার চিরপোষিত এ আশালতা মুকুলিত হইল না, অভিলাষ পূরিল না। বীরবর চণ্ডই প্রতিনিধি স্বরূপে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

হিংসার পাপমনে হিংসানল প্রজ্জলিত হইল,—দারুণ জিগীসা উদৃক্ত হইল। সে বলিতে লাগিল—"মকুল নাম মাত্র রাণা, চণ্ডই প্রকৃতপক্ষে রাজাধীকার অধিকার করিতে বসিয়াছেন।" এ পাপ বার্ত্তা ক্রমে চণ্ডের কর্ণগোচর হইল; এ পাপ কাহিনী তাঁহার উচ্চ হৃদয়ে ভীষণ বেগে প্রহত হইল, দারুণ রোষে, ঘোর অভিমানে তিনি জর্জ্জরিত হইলেন।

হায়! এ জগতে সরলতার পুরস্কার নাই, ত্যাগ স্বীকারের সম্মান নাই; এখানে বুঝি কাচ কাঞ্চনের একই মূল্য! রাজকুমার আপন স্বার্থ স্বেচ্ছায়, নিজকরে বলি দিয়া, কোথায় কৃতজ্ঞতার সুবিমল পীযুস পান করিবেন, না তৎপরিবর্ত্তে হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতারণা, ষড় যন্ত্র! বীর হৃদয় চণ্ডের আর সহিল না, ঘৃণায় অভিমানে তাঁহার হৃদয় প্রপূর্ণ হইল। তিনি প্রগল্‌ভা রাজমাতাকে কহিলেন,—"আপনি বুঝিতে পারেন নাই; সিংহাসনে আমার লোভ থাকিলে রাজমাতা বলিয়া আজ আপনাকে কেহই পূজা করিত না। ভাল, আপনাকে নিশ্চিন্ত করিয়া, আমি চিরতরে চিতোর ত্যাগ করিতেছি। দেখিবেন আমার মাতৃভূমির মান সম্ভ্রম দেখিবেন।"

বলিতে বলিতে চণ্ডের মুখচ্ছবি গম্ভীরভাব ধারণ করিল, দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষুকোণে অলক্ষে দুটী বারিবিন্দু দেখা দিল। চণ্ড বলিতে লাগিলেন—"দেখিবেন—আমার মাতৃভূমির মান সম্ভ্রম। আজ হইতে সে ভার,—শিশোদীয়কুলের প্রোজ্জ্বল গৌরব গরীমা, আজ হইতে আপনার উপর নির্ভর করিতেছে।"

চণ্ড যেন চিতোরের ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মন আকুলিত হইল—নয়নে অশ্রুধারা বহিল। অবস্থা বুঝিতে পারিয়াও তিনি চিতোর পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন; একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেনও না। *

স্বদেশভক্ত চণ্ড! তোমার এ অপার্থিব, পবিত্রতম, স্বর্গীয় অশ্রুবিন্দুর মহীমা জগতে কয়জন বোঝে? কয়জন বোঝে—এরূপ এক একটী অশ্রুবিন্দুতে দেশে কি নববলের সঞ্চার করিয়া দেয়?

রাজপুত গৌরব চণ্ডের ভাবিদর্শন যথার্থ হইল, দুই মাস না যাইতে না যাইতেই, উত্তপ্ত মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া, মুকুলের মাতুল যোধ এবং তৎপিতা রণমল্ল "রাজবারার নন্দনকানন" মিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুদিন যাইতে না যাইতেই কুটীল চরিত্র মারবাররাজ মুকুলের প্রতিনিধি স্বরূপ চিতোরের পবিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল। দুরাচারের দুরাশা প্রবর্দ্ধিত

* চিতোর ত্যাগ করিয়া চণ্ড, শালুমুম্ব্রা জনপদে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন। শালুমুম্ব্রা মিবারের অন্তর্গত। চণ্ডের বংশধরগণ "চণ্ডাবৎ" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, অদ্যাবধি তাঁহারা উক্ত জনপদ ভোগ করিতেছেন। শালুমুম্ব্রা-পতিই মিবারের শ্রেষ্ঠ সর্দ্দার।

হইতে লাগিল, তাহার কুটীলতা জালে সকলই বিজড়িত হইয়া পড়িল। কেহই দুষ্টের দুরভিলাষ বুঝিতে পারিল না, বুঝিল না—একমাত্র রণমল্লই মকুলের সৌভাগ্য গগণের ভীষণ মেঘ, সুগম পথের সুতীক্ষ্ণ কণ্টক।

তবে বীরজননী চিতোরের—বাপ্পারাওয়ের পবিত্র বংশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, সেই দুর্দ্দিনে—যখন সর্দ্দার সামন্ত সকলেই রণমল্লের কপটতাপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারে বশীভূত,—তখন একটী স্ত্রীলোক এই কপটতা জাল বিভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিল; সে স্ত্রীলোকটী, কপটের অমায়িকতার বহিরাবরণ বিচ্ছিন্ন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে, খল স্বভাব মল্ল সুবিধাক্রমে দৌহিত্র হত্যা করিয়া, মিবারের রাজাসনের অভিলাষী।

এ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী রমণী—মুকুলের ধাত্রী। ধাত্রীর মনে দারুণ দুঃখ এবং ত্রাস যুগপৎ উপস্থিত হইল। সে তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া রাজমাতাকে কহিল,—"দেবি! আপনি কি কিছুই বুঝিলেন না? মুকুলের ভাগ্যাকাশ রণমল্লরূপ ভীষণ মেঘে আচ্ছন্ন হইতে চলিল!" শ্রবণমাত্র রাজমাতা সকলই বুঝিলেন, পুত্রের ভবিষ্যত ভাবিয়া বিষাদিতা হইলেন, তাহার মন রোষে, দুঃখে প্রপূরিত হইয়া গেল। কিন্তু নিরুপায়! এখন কি করিবেন? উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় বিমোহিত হইয়া, আপনিই আপনার পদে কুঠারাঘাত করিয়াছে। বুঝিলেন—চণ্ডের মনে আঘাত করিয়া তিনি কি কুকর্ম্মই না করিয়াছেন! কিন্তু এখন ভাবিবার সময় নাই, এ অনুশোচনের কাল নহে, এখন উদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

হতভাগিনী রাজমাতা বিপদে আকুলিতা হইলেন, কে তাহার মুকুলকে রক্ষা করিবে? কে বাপ্পারাওয়ের বংশকে অনন্ত বিনাশ হইতে রক্ষা করিবে? কেহই নাই—বিস্তৃত রাজপুরে আপন বলিতে তাঁহার আজ কেহ নাই! ব্যাকুলিতা হতভাগিনীর এ বিপদে, আজ চণ্ডকে মনে পড়িল; তাঁহার মহত্ত্ব, ঔদার্য্য ও অসীম সদ্‌গুণাবলী মনে হওয়ায়, সাহস হইল; তিনি তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া আমূল বিবরণ তাঁহাকে জানাইলেন।

দেব-চরিত চণ্ড গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিলেন, শুনিয়া বীরহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল,—জিঘাংসাবৃত্তি উদ্দীপিত হইল; ক্রোধে চণ্ড প্রচণ্ডভাব ধারণ করিলেন।

মিবারের অন্নে প্রপালিত হইয়া তাঁহারই প্রতি কৃতঘ্নতা? শৃগাল হইয়া সিংহের প্রতি অবজ্ঞা? বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার অভিলাষ? তেজস্বী চণ্ডের সহ্য হইল না। তিনি হিংসার কৃতঘ্নতা, অসদ্ব্যবহার মুহূর্ত্তমধ্যে ভুলিয়া গেলেন।—চিতোরের মুখ চাহিয়া, শিশোদীয় কুলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, সব ভুলিয়া গেলেন। চণ্ড চিতরোদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইলেন; এবং উপস্থিত "দেওয়ালি উৎসব" উপলক্ষে কুটীল মারবার রাজকে আক্রমণ করিলেন।

নিশীথে হঠাৎ রাজবাটীতে ভীষণ নির্ঘোষে তুর্য্যধ্বনী হইল! এক সঙ্গে রণবাদ্য গর্জ্জিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে প্রমত্ত সৈনিক বর্গের বিকট চিৎকারে পাষণ্ড জাগ্রত হইল। জাগিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু সবই বৃথা, দুর্বৃত্ত রণমল্ল, মুহূর্ত্ত মধ্যে চণ্ডের প্রদীপ্ত ক্রোধাগ্নিতে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইয়া গেল। অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, কত শত রাঠোরের প্রাণ ইহাতে আহুতি হইল! অনল তবু নির্ব্বাপিত হইল না। প্রজ্জ্বলিত অনল প্রবাহ চলিল, পলায়িত রাজকুমার যোধের অণুসরণে প্রধাবিত হইল, অবশেষে মুন্দর নগরে উপস্থিত। মুন্দর ভস্মিভূত হইল, উদ্দীপ্তানলের দিগ্‌দাহী তেজে চিরতরে উৎসন্ন হইল,—আর উঠিল না।

প্রাতঃস্মরণীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চণ্ড, এইরূপে চিতোরের মেঘমালা অপসারিত করিয়া মুকুলের ভাগ্যাকাশ সুপরিষ্কৃত করিয়াছিলেন। এইরূপে চিতোরের শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় মিবারের গৌরব সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

সার্দ্ধচতুঃশতাব্দি অতীত হইয়া গিয়াছে, দেবচরিত উদার হৃদয় বীর অনন্তধামে গমন করিয়াছেন, কিন্তু জগত আজিও তাঁহার মহানুভাবুকতা, তাঁহার সত্য প্রতিজ্ঞতা—প্রভৃতি স্মরণ করিয়া, বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। আজিও তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি ভাবে প্রণাম করিয়া থাকে।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

বাঙ্গালা নাট্যশালা।

নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বাঙ্গালা নাটকের বর্ত্তমান অবস্থা তাদৃশ আশাপ্রদ নহে। অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কিছুকাল পূর্ব্বে যাহা ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা কতকাংশে উন্নত, কিন্তু এই উন্নতি অতি ধীরে ধীরে ও অসম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কেবল মাত্র বাঙ্গালা উপন্যাসের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে; দুর্গেশনন্দিনীর প্রচারের সহিতই বঙ্কিম বাবু যে একটী নূতন বল সৃজন করিয়াছিলেন, কালে সেই শক্তি সমগ্র দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল! উপন্যাসে তিনি যে মধুর রস ঢালিয়া দিয়াছিলেন, সময়ে, দেশের লোকে সেই অমৃতময় রসপানে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল; সেই জন্য আজ বাঙ্গালা উপন্যাস বঙ্গ সাহিত্যের গৌরবের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বঙ্কিম বাবু কর্ত্তৃক উপন্যাসে যে সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, ৺ দীনবন্ধু মিত্রের দ্বারাও নাটকে সেই প্রকার শক্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বঙ্কিম ও দীনবন্ধু উভয়েরই উদ্ভাবনী কৌশল প্রশংসনীয়, উভয়েরই শক্তি তুল্যরূপ; একজন বর্ত্তমান বঙ্গউপন্যাসের জন্মদাতা, আর একজন বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাটকের সৃষ্টিকর্ত্তা। এস্থলে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি উভয়েরই শক্তি তুল্যরূপ হয়, তাহা হইলে, বঙ্কিমের উপন্যাসই বা এত উন্নত হইল কেন, দীনবন্ধুর নাটক কেনই বা লোকের এত অনাদরের পাত্র হইয়া দাঁড়াইল?

এই প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে, কেবল সাধারণের মানসিক ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উভয়েরই পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। দীনবন্ধু যখন নাটক রচনা করিয়া সাহিত্যের একটি শাখার বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন, তাহার অত্যল্পকাল পরেই অনেকগুলি সাহিত্যামোদী ব্যক্তি তাঁহার অনুকরণে নাটকাদি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার নাট্যশালায় যখন তাঁহার গ্রন্থগুলি অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল, তখন লোকে নাটকের প্রতিও কতকটা বীতশ্রদ্ধ হইতে আরম্ভ করিল।

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকে নাট্যশালা গুলির প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করিলেও, তখনকার সময়ে লোকে নাট্যশালা গুলিকে তাদৃশ সম্মান জনক স্থান

বলিয়া বিবেচনা করিত না অবশ্য, এতন্নিবন্ধন নাট্যশালা গুলিতে যে দর্শকের অভাব হইত. তাহা নহে। এমন অনেক অভিনয় রজনী গিয়াছে যখন "জাতীয় নাট্যশালা" হইতে স্থানাভাব বশতঃ শত শত দর্শক ক্ষুণ্ণমনে বাটী প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে, আমাদিগের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, নাট্যশালাগুলি তখন আমোদ বর্দ্ধনের স্থান বলিয়া বিবেচিত হইলেও,নাট্যশালায় গমন করিয়া তথায় অভিনয়াংশ গ্রহণ করাকে, অনেকে লজ্জাকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আমাদিগের স্মরণ হয় যে, সে সময়ে প্রথম প্রথম বারবনিতা লইয়া অভিনয় করা হইত না; পুরুষগণ স্ত্রীর অংশ গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিতেন। এই স্থলে বলা ভাল, যে, এক একজন অভিনেতা, স্ত্রীর অংশ এরূপ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, যে এমন কি বর্ত্তমান সময়ে অভিনেতৃগণ পর্য্যন্তও সে প্রকার অভিনয় প্রদর্শন করিতে পারে না।*

নাট্যশালার, পুরুষগণ স্ত্রীর অংশ গ্রহণ করিত, ইহা বর্ত্তমান সময়ে কতকটা বিস্ময়কর ও হাস্যোদ্দীপক হইতে পারে বটে, কিন্তু তখনকার লোকে ইহাতে কোনও প্রকার অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেন না। তাহার কারণ এই যে, নাটকের যে কোন প্রকার অভিনয় বল, তখন তাহা যাত্রাতেই প্রদর্শিত হইত। রাম রাবণের যুদ্ধ হইতে হনুমানের লঙ্কা দগ্ধ পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনাই তখন (এবং এক্ষণেও) সেই অল্পপরিসর প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকিত। যাঁহারা যাত্রা দর্শন করিয়া থাকেন, এবং যাত্রা দর্শণেই যাঁহাদিগের স্পৃহা অধিক, তাঁহাদিগের কল্পনাবৃত্তিটি যে সমধিক চর্চ্চিত ও উন্নত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মনে করুণ, বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসী আসিয়া সুন্দরকে নিজের উদ্যান দেখাইতেছেন। বলিতেছেন, "দেখ দেখ চারিদিকে কত ফুল ফুটিয়াছে; সেফালি, মল্লিকা, যুথিকা, চাঁপা, বকুল, বেল, স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া রহিয়াছে। শুন শুন কেমন অলির গুঞ্জন হইতেছে; পরিমলে দিক আমোদিত হইতেছে"—এই বলিয়া হয়ত তিনি চতুর্দ্দিকস্থ সমাগত দর্শকবৃন্দের প্রতি অঙ্গুলি

* যেমন "জাতীয় রঙ্গমঞ্চে" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক "নীলদর্পণে" পদী ময়রাণীর অথবা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর (বর্ত্তমান "ষ্টার থিয়েটারের" কার্য্যাধ্যক্ষ) সৈরিন্ধ্রির অভিনয়।—সং

নির্দ্দেশ করিলেন। যদি সেই সময়ে কোনও অরসিক বা ভাবগ্রহণে অসমর্থ নবীন যুবক তথায় উপবিষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, পুষ্প-শ্রেণীর স্থলে কেবল কতকগুলি তন্দ্রাযুক্ত বৃদ্ধ উপবিষ্ট, অলিগুঞ্জনের স্থলে বৃদ্ধগণের অবিরল ও অপ্রীতিকর কাশীধ্বনি, এবং পুষ্পের সৌরভের স্থলে কেবল তাম্রকুটের তীব্র গন্ধ সেই স্থলকে ধূমাবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। যে স্থলে উদ্যান—বর্ণন হইল, সেই স্থলেই হয়ত কিছু পূর্ব্বে একটী বিস্তৃত দীর্ঘিকা ছিল; হয়ত অভাগা সুন্দর সেই পুষ্করিণীর তীরে উপবিষ্ট হইয়া, কতকগুলি স্বামিপ্রণয়হীণা ও জলপূর্ণকলসীকক্ষ যুবতীরমণীর বিরহভাব উৎপাদন করিয়া দিয়াছিল! কিম্বা ইতিপূর্ব্বে যেখানে দশরথের রাজসভা আহূত হইয়াছিল, কিছুকাল পরে তাহা বিস্তৃত মহাসমুদ্রে পরিণত হইল, এবং হনুমান একলম্ফে প্রাঙ্গণের অর্দ্ধাংশ উত্তীর্ণ হইয়া, একেবারে রাজগৃহে প্রবেশ করিলে; এই প্রকারে তাঁহার সাগর উল্লম্ফন সমাপ্ত হইল।

ইহাই ত গেল দৃশ্য সম্বন্ধে; তাহার পর অভিনেতাগণ সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে বলাই বাহুল্য। পুরুষবেশী অভিনেতাগুলির অংশ যে উৎকৃষ্ট হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু স্ত্রীবেশী অভিনেতাগণের অবস্থা অতীব শোচনীয়। বহুকাল হইতে গঞ্জিকা বা তাম্রকুটসেবনে কর্কশস্বর হইতে কি প্রকার রমণীয়তা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সুতরাং স্ত্রী জনোচিত শারীরিক অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পাদন ও শ্মশ্রু ও গুম্ফ অপনোদন সত্ত্বেও, বর্ত্তমান সময়ে লোকে তাহা হইতে বীভৎসরস ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার ভাব অন্তঃকরণে ধারণ করিতে পারে না। তাহার পর, রাম ও রাবণের তুমুলসংগ্রাম হইল; রাবণ ভবিতব্যতা বশতঃ, যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিল—প্রবল বেগে জয়ডঙ্কা নিনাদিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রকে ভয়ানক করিয়া তুলিল। কিন্তু কিছু-কাল পরেই দেখা গেল যে, রাবণ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় উপবেশন করতঃ বেশ নিবিষ্ট চিত্তে ধূমপান করিতেছে! এই স্থলে বলিয়া রাখা যুক্তি-যুক্ত যে, রাম ইতিপূর্ব্বে রাবণকে হংস-শর দ্বারা হত করিয়াছেন—সুতরাং রাবণের পুনর্জীবনের আর আশা ছিল না।

এই সমস্ত অপ্রাকৃতিক দোষবর্ণনার দ্বারা কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা যাত্রার বিরোধী। যাত্রার উপর বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ

লোকেই কি প্রকার বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, উক্ত বর্ণনা হইতে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও যাত্রার যে একটি গুণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, বর্ত্তমান রঙ্গশালাগুলিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। গীত বাদ্যই যাত্রার প্রধান অঙ্গ; এই গীত বাদ্যের এ প্রকার কৌশল প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় ন। কেবল তাহাই নহে, এখনও অনেকগুলি প্রসিদ্ধ যাত্রা সম্প্রদায় আছে, যেমন মতিরায়, গোপালেউড়ে প্রভৃতির; যাহাদিগের প্রসিদ্ধি বহুকাল হইতে আছে; এবং বঙ্গভূমিতে শত শত রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইলেও তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধি কখনও লুপ্ত হইবার নহে।

যাহা হইক, দুঃখের অভাব ও নাটকের স্ত্রীবেশী পাত্রীগুলির স্বরের কার্কশ্যবশতঃ যাত্রাগুলিতে যে দুইটি বিশেষ অভাব ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। আগেকার সময়ে লোকে ইহার অভাব বুঝিতে পারিত না, এবং বুঝিবার আবশ্যকও দেখিত না। গুরুকণ্ঠ সীতার বনবাসের অব্যবহিত পরেই তাহার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া, কি স্ত্রী কি পুরুষ, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ, "আহা আহা" করিয়া, অশ্রু বর্ষণ করিত; ভীম ও দুর্য্যোধনের ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাদিগের হৃদয় যুদ্ধবলে উত্তেজিত হইয়া উঠিত; এবং মালিনী মাসীর ছড়ায় তাহারা হাসিয়া আকুল হইত। এইস্থলে একটি কথা বলিলে বোধ করি অপ্রসঙ্গিক হইবে না যে, সে সময়ে যাত্রাগুলি লোকের মনোভাবের উপর যে প্রকার ক্ষমতা প্রদর্শন করিত, বর্ত্তমান সময়ে নাট্যশালাগুলি ঠিক সেই প্রকার আধিপত্য করিতে পারে না। সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিবার অনতিপূর্ব্বেই সমাগত দর্শকগণ যথায় ক্রন্দন করিত, আজকাল তাহার স্থলে নায়িকাকে সর্ব্বশেষ দৃশ্যে মৃত্যুশয্যায় শায়িত না করিলে, দর্শকগণের পাষাণ চক্ষু হইতে এক বিন্দুও অশ্রু বিগলিত হয় না। রাম যেমন রাবণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন, এবং তাহার মৃত্যু যে সন্নিকটস্থ এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন, অমনি সমস্বরে রণবাদ্য নিনাদিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বেই কি বালক, কি বালিকা, কি যুবক বা কি যুবতী, কি বৃদ্ধ কি বৃদ্ধা, সকলেরই কণ্ঠ হইতে সমস্বরে একটি হর্ষশব্দ শ্রুত হইল। সকলেই এতক্ষণ একমনে রাম ও রাবণের মধ্যে পরস্পরের তেজোপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিতেছিল;

অকস্মাৎ রণবাদ্য বাদিত হওয়াতে তাহারা যেন কতকটা সুস্থ চিত্ত হইল। বালকগণের বদন একটু প্রফুল্ল হইল, বৃদ্ধগণ সোজা হইয়া উপবিষ্ট হইয়া, দু একবার মাত্র হুকাদেবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; যুবকগণ স্বভাবতঃই গম্ভীর, সুতরাং তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গাম্ভীর্য্যের সহিত উৎফুল্ল নয়নে ভীষণ রণক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া দেখিত। তাহার পর, সামান্যমাত্র একটা রসিকতা করিলেই তখন লোকে হাসিয়া উঠিত। হনুমান যদি রঙ্গস্থলে আসিয়া দু একবার উল্লম্ফন করিত, তাহা হইলে দর্শকগণকে নিস্তব্ধ রাখিবার নিমিত্ত তত্ত্বাবধারক মহাশয়কে প্রাঙ্গণের এক পার্শ্ব হইতে অনেকবার "চুপ, চুপ" রবে গগণ বিদীর্ণ করিতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দর্শকদিগকে হাস্য করাইতে হইলে, কতটা কৌশল ও পরিশ্রম অবলম্বন করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন।

এই পরিবর্ত্তণের কারণ, যে বর্ত্তমান নাট্যশালাগুলির দোষে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। বরং ইহা লোকের মানসিক অবস্থার দোষেই সংঘটিত হইয়াছে, বলিতে পারা যায়। আজকাল লোকে সাংসারিক চিন্তার যাতনায় যতটা অভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সে প্রকার ছিল না। প্রথমতঃ, অন্নচিন্তায় ত লোকে উন্মাদ প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; "কি প্রকারে সংসার পরিচালন করিব" এই চিন্তায় অধিকাংশ যুবকই বাল্যকাল হইতেই বৃদ্ধে পরিণত হয়; অবিরত শ্বেতপুরুষের সবুটপদলেহন করিয়াও প্রতিদিন সকলের উপযুক্ত আহারের সংস্থান হয় না। এই প্রকার সাংসারিক চিন্তায় ক্লিষ্ট হওয়াতে কখনই বা আমোদ উপভোগ করিবে—তাহার অবসর খুঁজিয়া পায় না, এবং আমোদ করিবার স্পৃহাও থাকে না। কিন্তু বেশীদিবসের কথা নহে, এমনকি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও লোকের এত অভাব ছিল না। সুতরাং, বর্ত্তমান সময়ে যাত্রা অপেক্ষা নাট্যশালাগুলি অধিকতর প্রীতিপদ হইলেও, লোকে ইহাদিগের হইতে ততটা আমোদ উপভোগ করিতে পারে না।

যাহাই হউক, আমরা বলিতেছিলাম যে, প্রথম প্রথম যখন রঙ্গমঞ্চগুলি স্থাপিত হইল, তখন যাত্রাপেক্ষাও অধিক আমোদবর্দ্ধক এক প্রকার নূতন স্থান দর্শন করিয়া, লোকে আগ্রহের সহিত তথায় গমন করিতে

লাগিল। অবৈতনিক-যাত্রা-সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দেও; সে সময়ে বৈতনিক যাত্রাসম্প্রদায়ে ভদ্রলোকগণ প্রবেশ করিতে লজ্জাবোধ করিত; অবশ্য, বৈতনিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে ভদ্রজাত ব্যক্তি থাকিত না, তাহা নহে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহাদিগের সংখ্যা অল্প ছিল। যে সমস্ত ভদ্রমহোদয়গণ বাঙ্গালায় নাট্যশালা প্রথম স্থাপিত করেন, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই সদ্বংশজাত হইলেও, উক্ত এবং অন্যান্য কতিপয় কারণ বশতঃ, কিছুকাল পরে, লোকে নাট্যশালায় অভিনয়াংশ গ্রহণ করাকে হেয় বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। তাহার পর, বারবনিতাগণকে অভিনয়াংশ প্রদান করিতে আরম্ভ করাতে, দর্শকগণের প্রীতিউৎপাদনের একটি সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু প্রায় সকলেই, এমন কি যে সকল ব্যক্তির অভিনয়ের উৎকর্ষবিধানের নিমিত্ত চেষ্টা করিবার বিশেষ অভিলাষ ছিল, তাঁহারা পর্য্যন্তও নাট্যশালায় প্রবেশ করিয়া, পাত্রের অংশ গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। এই প্রকারে বাঙ্গালার নাট্যশালা সকলের আনাদৃত হইয়া, কতিপয় অধ্যবসায়সম্পন্ন মহোদয়ের চেষ্টাবলেই জীবিত রহিল।

প্রথমে যে কয়টী উদ্যোগীপুরুষ জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত করেন, কালে তাঁহারাই পৃথক হইয়া ক্রমে ক্রকয়টি বিভিন্ন রঙ্গালয় স্থাপন করিলেন। নাটকের পাত্রীর অংশগুলি স্ত্রীলোকদিগকেই প্রদত্ত হওয়াতে দর্শকগণ অভিনয় দর্শন করিতে করিতে পাত্র ও পাত্রীগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজনীয়তা দেখিতেন না,—অল্পকালের মধ্যে অভিনয়টী তাঁহাদিগের চক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইত; অনেকেরই পূর্ণরূপ আত্মবিস্মৃতি ঘটিত।

কিন্তু রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনার প্রবর্ত্তন করাতে, অনেক নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত ও সুরুচিপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ বিশেষ বিতৃষ্ণ-ভাব প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তর্কের প্রধান বিষয় হইল এই যে, বেশ্যাদিগকে রঙ্গালয়ে অভিনয় প্রদর্শন করাইতে দেওয়ায় অধিকাংশ দর্শকেরই চরিত্র হানির সম্ভাবনা। তাঁহাদিগের মতটি সম্পূর্ণ অলীক তাহা নহে; কিন্তু একবার সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তাঁহাদিগের তর্কের তাদৃশ দৃঢ়মূল ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। জিজ্ঞাস্য এই, কোনও ধর্ম্মপ্রসঙ্গে গণিকা-

দিগের অভিনয় দর্শন করিয়া, না প্রকাশ্য রাজপথে তাহাদিগের লাম্প্যট্যের উদাহরণ-প্রদর্শন দর্শন করিয়া, কোনটীতে চরিত্রহানির অধিক সম্ভাবনা? যে প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ প্রশ্নার যুক্তিপ্রদর্শন করিলে সমীচিনতার পরিচয় প্রদান করা হইবে না। যাহাদিগের স্বেচ্ছায় চরিত্রহানি করিবার অভিলাষ, তাহারা শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও স্বাভিলাষ পূর্ণ করিবেই; যদি অদ্য নাট্যশালা গুলি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে কল্য সমগ্রদেশে সুনীতির মলয়বায়ু সঞ্চারিত হইবে—যদি কেহ দৃঢ়তাসহকারে এ প্রকার কথা বলিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা রঙ্গালয়গুলি বন্ধ করিবার পক্ষপাতী হইতে পারি। কিন্তু একথা কেহই বলিতে পারেন না যে, রঙ্গালয়ই দেশব্যাপী দুর্নীতির মূল কারণ। দুর্নীতির যাহা মূল কারণ, তাহা আজকাল আমাদিগের সমাজের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠতার সহিত সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা কেহ দেখিতে পায় না; সুতরাং "সমাজ সংস্কারে" ব্রতা মহাত্মারা, দু'একটী অনাবশ্যক বিষয়ের অবতারণা করতঃ কিছু কালের নিমিত্ত চিৎকার করিয়া নিস্তব্ধ হয়েন। সমাজের বন্ধনের অভাবে আজ কাল যে স্বাতন্ত্র্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেই শিথিল বন্ধনকে দৃঢ়তর করিলেই মহদুপকার সাধিত হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়া, দুর্ব্বল রমণীদিগকে স্বাধীন করিয়া, সর্ব্বদাই পরস্ত্রীগণের সহিত বসবাস করা;—কিম্বা, অপরপক্ষে অল্প সময়ের নিমিত্ত বারাঙ্গনা কর্ত্তৃক অভিনীত ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বা সামাজিক নাটকের অভিনয় দর্শন করা,—ইহার মধ্যে কোনটি দুর্নীতির অধিক পৃষ্টপোষক, তাহা সাধারণেই বিচার করিবেন।

সুতরাং বেশ্যাভিনীত রঙ্গালয়ের প্রতি যে সমস্ত সুসভ্য ব্যক্তিবর্গ রোষ কষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাদিগের বিচার শক্তি ও রুচির প্রসক্তি কি প্রকার, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে! আর একটী কথা,—আমাদিগের দেশের রঙ্গালয়গুলি যে পাপাচারের স্থান এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। রঙ্গালয় গুলি আমোদ বর্দ্ধনের স্থান;—অবশ্য, নীচজনোচিত আমোদ নহে; অধিকাংশ স্থলেই এ আমোদের সহিত শিক্ষাও মিশ্রিত থাকে। রঙ্গালয়গুলি হইতে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা না হউক, দু'একটা যে নীতি-

শিক্ষা হয়, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অবশ্য স্থল বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম আছে। কেহ হয় ত পৌরাণিক নাটকে অশ্লীলতামিশ্রিত, এবং বর্ত্তমানের প্রহসনে বীভৎসরসের সঞ্চার করিয়া, অভিনয়কে কতক পরিমাণে অরুচিকর করিয়া তুলেন;—এক্ষেত্রে আমরা তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না। "সরলার" অভিনয় হইতে কলহপ্রিয় গৃহিনীগণের, কিম্বা "বিল্বমঙ্গলের" অভিনয় হইতে বেশ্যাসক্ত যুবকগণের শিক্ষা লাভের যে অধিক সম্ভাবনা—তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না; অধিক নহে, অভিনয়ে, দর্শকের মন কতদূর দ্রবীভূত হইতে পারে, এক "নীলদর্পণই" তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। তবে, যাহাদিগের প্রবৃত্তি নিম্নমুখগামিনী, তাহারা রঙ্গালয়ে গমনের বহু পূর্ব্বেই চরিত্র কলুষিত করিয়া থাকে। তাহাদিগকে আলোচনার উপকরণ করিয়া, যদি শ্লীলতাশালী ব্যক্তিগণ বাকযুদ্ধে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে আমরা নিজদিগকে পরাজিত বলিয়া, অগ্রে স্বীকার করিয়া লইতেছি।

যাহা হউক, রঙ্গালয়ে বারাঙ্গনা থাকা প্রযুক্ত, সহজেই যে নাট্যমোদী ব্যক্তিবর্গ ইহাতে প্রবেশ করিতে, এবং অভিনয়াংশ গ্রহণ করিয়া নাট্যশালার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইতে অস্বীকৃত হয়েন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নাট্যশালায় প্রবেশ করিলেই যে সকলের চরিত্র কলুষিত হইয়া যাইবে,—তাহার কোনও কারণ নাই। কিন্তু লোকের মনে এতদ্‌সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর এই ধারণা এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, সহজে সেই ভ্রম-বিশ্বাসকে দূরীভূত করা অসম্ভব। যাহা হউক, আমরা এপর্য্যন্ত নাট্যশালার অবস্থা কতক পরিমাণে আলোচনা করিলাম, এক্ষণে নাটক সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে দীনবন্ধুর সময়ে ও তাঁহার কিছুকাল পরে, সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নাটক প্রণয়নের একটি বিশেষ স্পৃহা জন্মিয়াছিল। সেই স্পৃহাবলে কিছুকালের নিমিত্ত বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি নাটক রচিত হইয়াছিল; উক্ত সময়ের পর, সাধারণ ব্যক্তিবর্গ অনেক গুলি নাটক রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তগুলির ন্যায় শেষোক্তগুলি তাদৃশী শক্তিসম্পন্ন হয় নাই। তাহার পর যখন জাতীয় ও বঙ্গ নাট্যশালা স্থাপিত হইল, তখন উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলির অভিনয় দর্শন করিয়া, অনেকেরই মনে নাটক রচনা

করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল—কিছুকালের নিমিত্ত নাটক রচনার ধুম পড়িয়া গেল। যুবা বৃদ্ধ সকলেই নাটক রচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সমস্ত নাটকের অধিকাংশই অভিনয়ের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল।

অভিনয়োপযোগী নাটক রচনা করাও যে নিতান্ত সহজসাধ্য বিষয়, তাহা নহে। যে নাটক রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত করিতে হইবে, সে নাটকে কেবলমাত্র কয়েকটি অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক থাকিলেই চলিবে না। তাহাকে এ প্রকারে বিন্যস্ত করিতে হইবে যে, অভিনয়ের মধ্যে যেন কোন প্রকার অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত না হয়। দ্বিতীয়তঃ, এ প্রকার নাটক রচনা করিতে হইবে, যাহাতে দর্শক-মাত্রেই পুলকিত হইতে পারেন। কিন্তু অভিনয়োপযোগী বিন্যাস-কৌশল এবং সাধারণের মানসিক ভাব অবগত হওয়া, এই দুইটি বিষয়ের পূর্ণ অভি-জ্ঞতা না থাকিলে, নাটক রচনা করাই বিড়ম্বনা। সেই জন্য এক জন সুদক্ষ ও প্রাচীন অভিনেতা ভিন্ন, কিম্বা একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি, যিনি রঙ্গালয়ে সহিত বহুকাল হইতে সংস্পৃষ্ট, এ প্রকার ব্যক্তি ভিন্ন, সর্ব্বজন-প্রীতিকর নাটক প্রণয়ন করা অধিকাংশ স্থলেই সম্ভবপর নহে। সুশিক্ষিত, সর্ব্বরসজ্ঞ, বহুকাল রঙ্গালয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট এ প্রকার লোকের সংখ্যাও বাঙ্গালাদেশে অতি অল্প। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা প্রথম দুইটি গুণে পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত, কিন্তু হয়ত তাঁহারা রঙ্গালয়ের সহিত আদৌ ঘনিষ্টতা স্থাপন করেন নাই; তাঁহারা হয়ত এমন এক খানি নাটক রচনা করিবেন, যাহাতে প্রতিপদে প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তা ও নব রসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু হয়ত সেই নাটক খানিকে রঙ্গালয়ে প্রদর্শিত করিলে, দর্শকগণ ক্ষুণ্নমনে বাটি প্রত্যাগমন করিবেন। ইহার কারণ এই যে, রঙ্গালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা থাকা-প্রযুক্ত, সাধারণের রুচি সম্বন্ধে যে একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হয় এবং সেই অভিজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া নাটক খানিকে যে প্রকার কৌশলের সহিত সজ্জিত করা যাইতে পারে, সে ব্যক্তির তাহা না থাকায় তৎ প্রণীত নাটক খানির অভিনয়ে উক্ত প্রকার ফলই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বস্তুত অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণ নাট্যশালার সহিত সম্পর্ক রাখিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত, তাহার কারণ ইতি পূর্ব্বেই পূর্ণভাবে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যতদূর আশঙ্কা করেন, ততদূর আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ

নাই।' অভিনয়াংশের সহিত সন্মিলিত না হইয়া, তাঁহারা রঙ্গশালার সাহিত্যসম্বন্ধীয় অংশ টুকুর সহিত, নিঃসঙ্কোচে সম্মিলিত হইতে পারেন; এবং হইবারও সময় উপস্থিত হইয়াছে।

আমাদিগের দেশের নাট্যশালার মূলভিত্তিমাত্র সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে; ইহার উন্নতি হইবার এখনও বহু বিলম্ব। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদিগের দেশের রঙ্গভূমিগুলি যে প্রকার বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহার অসীম উন্নতি আশা করা যাইতে পারিত। কিন্তু অবস্থাদি সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, আমাদিগের সেই আশা নিরাশায় পরিণত হইবে।

দেখাগিয়াছে যে, ন্যাশানাল থিয়েটার স্থাপন করিবার জন্য, ও তাহার উন্নতির জন্য যে কয়জন মহোদয় প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরিশেষে নাট্যজগতে বিশ্বপ্রসারিণী খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক এক জন এ প্রকার অভিনয়ের কৌশল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে এ পর্য্যন্ত কোনও অভিনেতাই তাহাদিগের অনুকরণ করিয়াও উঠিতে পারেন নাই। এমন অনেক দিবস গিয়াছে, যখন অনেক দর্শক কেবল মাত্র তাঁহাদিগেরই অভিনয় দর্শন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া স্থানাভাবে বাটি প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও এমন অনেকগুলি প্রাচীন অভিনেতা নাট্যশালা আলোকিত করিতেছেন, যাঁহারা এক এক বিষয়ে এরূপ অভিজ্ঞ যে তাঁহারা যেন স্বভাবতঃ সেই সমস্ত গুণদ্বারা ভূষিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়! ইঁহাদিগের তত্ত্বাবধানে রঙ্গালয়ে অনেকগুলি যুবক অভিনেতা উত্তমরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, অভিনয়ের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইতেছেন। সুতরাং নাটকের অভিনয়ের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ তাদৃশ অন্ধকারকৃত নহে—বরং তাহা বিশেষ আশাপ্রদ। কিন্তু রঙ্গশালার উন্নতির সোপান নাটক রচনা সম্বন্ধে, একথা বলিতে পারা যায় না। অভিনয়ের তুলনায়, নাটক রচনায় বঙ্গসাহিত্য তাদৃশ গৌরব করিতে পারে না। যাহা হউক এই নাটক রচনা সম্বন্ধে আমরা পর প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

চিন্তা।

নীরব নিশীথে বিমানের পথে,
বিমনা চাহিয়া থাকি,
[ওগো] তারকার বনে আকাশের প্রাণে
তোরি নয়নের ছায়া দেখি।
[ওগো] নয়ন মুদিলে নয়ন সলিলে
রাঙিম আলোর বুকে;
[অই] অভিমানভরা নত আঁখি দুটী
সরমে ফুটিতে থাকে।
[বুঝি] ভাবনায় চাঁদের কিরণ—
হৃদয়ের সারা গুহাতে;
[তাই] আবেগ লহরী উজানে বহিয়া
কেঁদে মরে হৃদি তটেতে!
[উঠে] সাঁজের অনিলে প্রাণের কাহিনী
ভাষা হীন তোর ভালবাসা!
[তাই] অনিল পরশে অবশ হৃদয়
ঘুম চোখে চায় শততৃষা।
[ওগো] তাই মনে হয় ঘেরিয়া আমায়
কত শত ছায়া মূরতি;
হাতে হাতে ধরি দিতেছে পাহারা
হারা'বার ভয়ে সারারাতি।
[ওলো] তাই যেন বুক চেপে ধরে কেহ
এলায় হৃদয় বাঁধুনি;
[কোন] বিরহের দেশ হতে কাণে পশে
চির বিরহের কাহিনী!

[ওগো] তাই অকারণে নয়ন ছাপায়ে,
ঝ'রে পড়ে দুটী আঁখি জল;
[তাই] হৃদয়ের এই অরাজক ভূমে,
জেগে উঠে শত কোলাহল!
[ওলো] নয়নে নয়নে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
র'য়েছি দিবস রজনী
তবু ত হৃদয় দূর ভেবে কাঁদে
কেমন বিরহ কি জানি!
[ওগো] চাঁদের আলোতে নদীর কূলেতে
মুখো-মুখী করি' দুজনে
চক্রবাক বঁধু বঁধুয়ার সাথে
কাঁদে যথা ঘোর বেদনে!
সাধ যায় মোর জীবনের কূলে
বিরলে বসিয়া তেমনি
মুখোমুখী করি' গাহিব কাঁদিয়া
এই জ্বালাময় কাহিনী!
এই সীমাহীন তৃষা পারহীন আশা
মিলনে বিরহ খেদ
দুজনে গাহিব দুজনে শুনিব
মিটা'ব প্রাণের বেদ!
দূর দূরান্তরে তরল নীলিমা
উঠিবে বিদরি' মোদের গান;
দেবতার বালা জাগিবে শয়নে
শুনিয়া মোদের করুণ তান।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

আমার জীবনের দু'টী দিন।

প্রথম দিন।

আজ গোষ্ঠবিহার। তদুপলক্ষে এক বৃহতী মেলা বসিয়াছে। মেলায় কত রকমারি জিনিষ, কত রকম রকমের লোক আসিয়াছে, তার সংখ্যা হয় না। রাস্তার দুই পার্শ্বে স্থানে স্থানে নানা ফ্যাসানের ঘোড়া ও গাড়ী, গাড়ীতে ধন-কুবেরদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বসিয়া মেলার রঙ্গ তামাসা, কেনা বেচা, লোকের ভিড় দেখিতেছিল। সেই জন-স্রোত ঠেলিয়া, একটি দ্বাবিংশ বয়স্ক যুবক একখানি ব্রুহামের সাম্নে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকের বদন মণ্ডল সরলতা, স্নেহ ও মহিমা মণ্ডিত। ব্রুহামের ভিতর হইতে অনূ্যন দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা মুখ বাড়াইয়া কত কি দেখিতেছিল। সেই বালিকাকে দেখিবামাত্র যুবক হৃদয়ের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত আবেগভরে তাহার কচি হাত দুখানি আপনার দুই হাতের ভিতরে পূরিয়া, অতি মৃদু অথচ স্নেহরস-সিক্ত স্বরে বালিকাকে জিজ্ঞাসিল, "নিরো! তোমরা ভাল আছ ত?" বালিকা উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার সঙ্গের জনৈক আত্মীয় লোক তাহাকে এই বলিয়া নিবারণ করিল যে, ও গরিব ওর সহিত কথা কহিলে লোকে ঘৃণা করিবে। এই কথা কয়টি যুবককে শুনাইবার অভিপ্রায়েই একটু উচ্চৈস্বরে কহা হইতেছিল, সুতরাং যুবকের শুনিতে বাকী রহিল না।

যুবক কাতর ভাবে বালিকার মুখপানে একবার চাহিয়া একটু কষ্টের হাসি হাসিল। দেখাদেখি বালিকারও কোমল অধর-প্রান্তে একটু হাসির বিজুলী খেলিল। উভয়ের হাসি কত বিভিন্ন! যুবক বালিকার হাসির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিল, কিন্তু বালিকা তাহার হাসির অর্থ বুঝি বুঝিল না, অথবা তাহার বুঝিবার সে শক্তি তখনও পরিস্ফুট হয় নাই। যুবক ক্ষুণ্ণমনে ধীরে ধীরে চলিয়া, সেই মেলায় লোক-প্রবাহের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। অদৃশ্য হইয়া সে মেলার উৎসবে মাতিল না। বরাবর চলিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর নির্জ্জন সৈকতে উপস্থিত হইল। নদীর আকুল অব্যক্ত কুলুকুলু-ধ্বনিতে যুবকের প্রাণ আরও আকুল হইয়া উঠিল। সে মনে ভাবিল, নদী

কত আশায় বুক বাঁধিয়া, সাগরোদ্দেশে চলিয়াছে। সাগর যদি তা'কে প্রত্যাখ্যান করে, নদীর হৃদয়ও ত আমারই মতন ভাঙ্গিয়া পড়িবে! নদীর আকাঙ্ক্ষা বা আশা, সাগর হৃদয়ে পড়িয়া পূর্ণ হইয়া যায়। আমি ক্ষুদ্র; ক্ষুদ্র বালুকা কণা হইতেও ক্ষুদ্র। আমাকে নদীর আশা ত সাজে না। সাজেনা বলিয়াই আমি তাহাতে মিশিতে চাহি না; তাহাকে দেখিয়া, শুধু চখে দেখিয়া কত সুখী হই! সংসার আমার সে সুখেও বাদ সাধিতেছে। আমি ত সংসারের কোনই ক্ষতি করি নাই; তবে সে কেন আমার এই সামান্য আশাটুকু মিটাইয়া লইতে দেয় না? লোকে রাজ্য চায়, রাণী চায়, আরও কত কি যাহা আমি ধারণাও করিতে পারিনা, চায়; তাহা পায়। আর আমি? আমি, ফোটা ফুল বলিয়াই বলি, তাকে দূর হইতে একবার দেখিয়া লইতে চাই, বেশী কিছুই ত চাই না। এটা কিছু নূতন নয়, যে, যে বস্তুটা প্রকৃত পক্ষে ভালবাসে, তাকে দেখিয়াই সুখানুভব করে। আমার অন্তরে মুহূর্ত্তের জন্য ইহা ব্যতীত অন্য কোনরূপ বাসনার উদয় হয় নাই। কিন্তু, এতেও সংসার আমার শত্রুতা সাধিতেছে! সে বলে, আমি গরিব। তখনও গরিব, এখনও গরিব। কিন্তু যখন তাদের বাড়ীতে থাকিতাম, তখন আমার সহিত তার কত কথাই হইত, তাতে ত কোনই দোষ ছিল না। এখন কি দোষ আসিয়া মধ্যে ব্যবধান হইয়াছে, বুঝিতে পারি না।

দ্বিতীয় দিন।

নীরো ফুল বড় ভালবাসিত। যুবক তাহাদের বাড়ীতে থাকিতে এক এক দিন ফুল দিয়া তাহাকে ফুলরাণী সাজাইয়া দিত। আজ প্রভাতে একটী সদ্যঃ প্রস্ফুটিত সুন্দর গোলাপ পুষ্প হাতে লইয়া, সে নীরোদের বাড়ীর গেটের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল; আশা,—দেখা পাইলে ফুলটি তাকে দেয়। এক মিনিট দুই মিনিট করিয়া, প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তথাপি নীরোর দেখা নাই। যুবক একবার ভাবিল, নীরো আমার কে? তার জন্যে আমার এত মাথা ব্যথা কেন? চলিয়া যাই, বুঝি আজ দেখা হইবে না। আবার পরক্ষণেই ভাবিল,—'না এতক্ষণই রহিয়াছি, আর একটু দেরী করিয়া

যাই, দেখা হইলেও হইতে পারে।' আরো কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পর, নীরো গেটের অনতিদূরে দ্বিতীয় গোলাপ সদৃশ ফুটিয়া উঠিল। যুবক দেখিল, এ গোলাপ, ও গোলাপে কত প্রভেদ! যাইহক, ছুটীয়া গিয়া সাগ্রহে ফুলটি তাহার হাতে দিল। পূর্ব্বের সেই লোকটি কোথা হইতে আসিয়া, বালিকার হাত হইতে গোলাপটি ছিনাইয়া লইয়া পার্শ্বস্থিত একটী অপরিষ্কৃত স্থানে নিক্ষেপ করিল, এবং কঠোর ও কর্কশ ভাষায় যুবককে নীরোর সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়া দিল। সেই কথায়, কি জানি কেন নীরোর বদন মণ্ডলে একটুখানি বিরক্তি ছায়া প্রতিভাত হইল। সেই প্রথম এবং জীবনে সেই একবার, তাহার জন্য নীরোকে কাতর দেখিয়া, যুবক বিস্ময়ান্বিত এবং মর্ম্মাহত হইল। তাহার তখনকার মনের ভাব ব্যক্ত করা অপেক্ষা, অনুভব করা অনেকটা সহজ। সে মুহূর্ত্তে কেহ তাহার হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিলেও অনুমান, তাহার তেমন কষ্ট বোধ হইত না।

এই ঘটনার পর, যুবকের অবশিষ্ট জীবন, পীত-বসন, শূন্য অর্ণবপোতের ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। একটী ক্ষুদ্র বালিকা তাহাকে স্বর্গের এক সিঁড়ি উপরে তুলিয়া দিয়াছিল। তাহারই অভাবে যুবক নরকের কৃমী কীট হইল। একটী ক্ষুদ্র বালিকার শুদ্ধ দর্শন লালসায় বঞ্চিত হওয়ায়, একটী উন্নত জীবের এই ভীষণ অধঃপতন! সৃষ্টির এক মহান্ রহস্য! মানুষের বিদ্যা বুদ্ধিতে ইহা চির তমসাবৃত।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশ্নোত্তর রহস্য।

প্র। কলিকাতার কোন্ স্থানের লোকেরা জামা সেলাই করিয়া দিনপাত করে?

উ। দরজিপাড়া।

প্র। কোন্ গৃহটী পদ্মফুলে বিরচিত?

উ। কমলকুটীর।

প্র। ভূতলে তারকা উদয় হয় কোথায়?

উ। ষ্টার থিয়েটারে।

প্র। রাধাবাজারের দক্ষিণে কোন বাজারটি অবস্থিত?

উ। শ্যামবাজার। [ক্রমশঃ]

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

অভিনয় সমালোচনা।

মান—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি, প্রাচীন ভগবদ্ভক্ত মহাজনগণ-লেখনী-প্রসূত পীযূস পূর্ণ, মধুর ভাবময়ী পূর্ণ বিকশিত কবিতা-পুষ্প, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহোদয় কর্ত্তৃক নবসূত্রে গ্রথিত হইয়া, আজ সাধারণ সমীপে "মান্" রূপে সমুপস্থিত। যে লীলা মানব-হৃদয়ে এক প্রেমের প্রবাহ ছুটাইয়া দেয়, সেই রাধা-কৃষ্ণের জগতোন্মত্তকারী প্রেমলীলা ব্যতীত "মান" আর কিছুই নহে। এ প্রেমলীলা যদিও পুরাতন তত্রচ, গ্রথকের সুনিপুন হস্তে পড়িয়া সেই "নিতুই নব" সামগ্রী, আজ আরও নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। একে মহাজনগণের প্রেমভাবোচ্ছ্বসিত মন-মুগ্ধকারী সঙ্গীতরূপ বিবিধ বর্ণের সুগন্ধী-পুষ্প, তাহার উপর আবার সুনিপুন গ্রথকের পুষ্প বিন্যাস কৌশলে "মান"-মাল্য ছড়াটী যে আজ কি সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

"মান" একখানি "অপেরা"। অপেরা শব্দের বাঙ্গালা অর্থ গীতিনাট্য। সঙ্গীত, নৃত্যাদির চরমোৎকর্ষই যে অপেরা, ইহা আধুনিক রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষগণ প্রায় বিস্মৃত হন এবং তজ্জন্যই তাঁহারা "শিব গড়িতে বানর" গড়িয়া বসেন। "মান"-গ্রথক ও মরকত রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষগণ কিন্তু তদ্বিষয়ে যথেষ্টই মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

"মান"—আরম্ভ হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের যমুনাতীরে শ্রীরাধিকার সহিত প্রথম সাক্ষাত হইতে। সেই বিশ্ব-প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ, যেন কিছুই অবগত নহেন এরূপ ভাবে, তৎসখা সুবলকে "অপরূপরামা" কে? জিজ্ঞাসা করায়, সুবল, "তিনি যে সেই গোলকের লক্ষ্মী" তাহা বুঝাইয়া দিলে, লীলাময় তাঁহাকে প্রাপ্তির ইচ্ছাচ্ছলে জীবজগতকে তাহার প্রেম শিক্ষা দিবার অভিলাসে, এই "মান লীলা" খেলিয়াছিলেন। অপর দিকে রাধা যমুনাতীরে সেই মোহন মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনাবধি কেমন এক প্রকার বিমনা হওতঃ, সখী-সম্ভাষণ ইত্যাদি হইতে বিরত হইয়া একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। অবশেষে প্রধানা সখী বৃন্দার বিশেষ অনুরোধে কহিলেন,—

"কি দেখিনু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তারি আঁখি ঠারে॥"—ইত্যাদি

সখীগণের আর বুঝিতে বাকি রহিল না। রাধার যে প্রেম-বিরহ বিকার উপস্থিত তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল। সখী বিশখা সেই কালিয়াবরণকে নন্দদুলাল শ্যামচাঁদ সাব্যস্ত করিলে, শ্রীরাধা আবার অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন,—

"সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥"—ইত্যাদি

আহা! রাধার এই তন্ময়ভাবে কাহার না হৃদয়ে প্রেমউৎস উছলিয়া উঠে? গীতি-নাট্যখানির সকল স্থানেই এইরূপ মনোহর ভাব বিন্যস্ত, সুন্দর সঙ্গীত লহরীতে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক সঙ্গীতের স্তরে স্তরে, কথায় কথায়, হৃদয়োন্মাদী আনন্দ-লহরী প্রবাহমান। তাহার উপর আবার অভিনেতৃগণের সুন্দর অভিনয়ে তাহা স্বতঃই স্বাভাবিক অনুমিত, ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়া হৃদয়ে বাস্তবিকই এক উন্মাদিনী শক্তি সম্প্রসারিত—সেই বিশ্ব প্রেমিক-প্রেমিকার বিশ্ব মোহিনী প্রেম সকল দর্শকেরই হৃদয় উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল।

কুটীলা কুটীলার কুটিল তাড়নায় মাঝে মাঝে প্রেমে বিচ্ছেদ ও সেই বিচ্ছেদ নিবারণ জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বিভিন্ন রূপে রাধার সম্মুখে সমুপস্থিতি, অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

"মরকতে" মানের অভিনয় অতি সুন্দর, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে। রাধার প্রেমোন্মাদ বাস্তবিকই দেখিবার জিনিশ। বৃন্দা ও অন্যান্য সখীগণের অভিনয় অতি সুন্দর। নারদের গভীর ভাবপূর্ণ গীতে কেনা বিমোহিত হইয়াছিল? এছাড়া রঙ্গমঞ্চের সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপট গুলির সমাবেশে অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং আমরা বহুকাল এরূপ সুন্দর গীতিনাট্যের অভিনয় দেখি নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সাধারণকে, পুরাতন আদি কবিগণের কবিতা সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য এবং গ্রথকের ও অভিনেতা-অভিনেতৃগণের গুণের পরিচয় লইবার জন্য, মানের অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি।

সমালোচনা।

সাবাস চুরি—(গোয়েন্দাকাহিনীর ১ম সংখ্যা) চোরবাগান ইউ-নিয়ান লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ৵১০।

এখানি, ডিটেক্টিভ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত "দারোগার দপ্তরের" অনুকরণে, অথচ তাঁহার অপেক্ষা অনেক সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সাধারণের, চুরি ডাকাতী, খুন ইত্যাদি বিষয়ক গল্প পড়িতে বড়ই ভাল লাগে; শরৎ বাবুর পুস্তক পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহার পুস্তক, প্রিয়নাথ বাবুর পুস্তক অপেক্ষা অনেক সস্তা। সাধারণের নিকট ইহার আদর প্রার্থনীয়।

বাসনা—মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পত্রিকা খানি চলিতেছে বেশ, লেখা ও ছাপা মন্দ নহে। অগ্রহায়ণের শেষের কবিতাটী কভারে কেন চলিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। বাঁধাইবার সময় যখন কভার ছিড়িয়া ফেলা হইবে তখন বোধ হয় পদ্যের অর্দ্ধাংশ বাজেআপ্ত হইয়া যাইবে।—এটা কি উচিত? যাহা হউক আমরা "বাসনা"র দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সৎসঙ্গ—পত্রিকা খানি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি। ক্রমে লেখা ইত্যাদি সাধারণের প্রীতিকর হইয়া উঠিতেছে। "সৎসঙ্গ" নিজের নামের সার্থকতা সম্পাদন করতঃ দীর্ঘজীবনের সহিত সাহিত্য সংসারে পরিচীত হইলে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।

সুহৃদ্—মাসিকপত্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক। ইডেন হিন্দুহষ্টেলের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। পত্রখানির অর্দ্ধেকের বেশী বাঙ্গালা ও অবশিষ্ট ভাগ ইংরাজী। এ সংখ্যায় "পার্ব্বতী" নাম্নী যে একটী গল্প প্রকাশিত হইয়াছে তাহার আমরা সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। তাহাতে ভাষা ও বান্ধুনীর অভাব বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" একটী ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ—এখণ্ডে শেষ হয় নাই। অন্যান্য প্রবন্ধ গুলি মন্দ হইতেছে না। 'The New Leaven of Bengal' এসংখ্যায় ইংরাজি প্রবন্ধ—মন্দ হয় নাই।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে ॥"

২য় খণ্ড। } পৌষ, ১৩০১ সাল। { ২য় সংখ্যা।

আমি কে?

"আমি যাইতেছি"—"আমি করিতেছি" ইত্যাদি বাক্য আমরা সর্ব্বদাই প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু যাইতেছি করিতেছি ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা "আমি" যে কে? "আমি" বস্তুটা কি? অথবা "আমি" বলিতে কি বুঝিব? তাহারই অবগতির জন্য, অদ্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। অবশ্য আমার এই পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ দ্বারা, আমার যাওয়া, করা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয় না; সুতরাং সে কদাচ কর্ত্তাস্বরূপ—"আমি" হইতে পারে না। অপিচ যিনি এই সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা—তিনিই আমি।

দেহ ও সমস্ত প্রবৃত্তি আত্মা দ্বারা পরিচালিত, সেই আত্মার কর্ত্তৃত্বে সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্পন্ন হইতেছে; অতএব সেই আত্মাই "আমি"। সেই আত্মা কে? কোথা হইতে আসিলেন? আমার আমিত্বের মূল কোথায়? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু বলিবেন;—আত্মা পরমাত্মার অংশ, আত্মা ও পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম একই পদার্থ, অর্থাৎ "সোঽহং" আমি তিনিই, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমি এবং আমি তিনিই। আর খৃষ্টান বলেন;—"In Him we live, and have our beings." অথবা আমি সেই পরমাত্মার প্রতিরূপ। কারণ তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলে ঈশ্বর বলিতেছেন;—"Let us make man in our own image, and after our own

likeness." সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে কেবল হিন্দুই ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব স্বীকার করেন; হিন্দু বলেন—সৃষ্টি স্রষ্টার অংশ বা বিকাশ মাত্র, পদার্থগত কোন ভেদ্য নাই; সুতরাং তুমি—আমি, কীটানু সমস্ত তিনিই, আমি তিনিই অর্থাৎ "সোঽহং"।

স্রষ্টা ও সৃষ্ট, অথবা কারণ ও কার্য্য এক পদার্থ হইলেও সমশক্তিশালী বা আমরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যাহাকে সমতুল্য বলি—তাহা নহে। হীরক ও কয়লা একই পদার্থ; তাই বলিয়া হীরকের যে মূল্য, যত আদর, কয়লার কখনই তাহা নহে। এক গণ্ডূষ জল ও মহাসমুদ্রে প্রভেদ নাই; তবে এক গণ্ডূষ জল, মহাসমুদ্রের ন্যায় ক্ষমতাশালী নহে। এইরূপ সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টার বিকাশ বা অংশ; কিন্তু তিনি স্রষ্টা, তাঁহার ক্ষমতা অসীম, আমি সৃষ্ট, আমার ক্ষমতা সসীম। সেই অসীম অনন্তশক্তির অংশরূপী আত্মাই আমার আমিত্ব সুতরাং সৃষ্ট পদার্থ অবশ্যই বলিতে পারে—"সোঽহং"—আমি সেই।

"আমি তিনিই" বলিলেই যে তিনিই আমি, তাহা বুঝায় না। যদি তিনিই আমি হইতাম, তাহা হইলে কেবল আমি কেন, আমি—তুমি কীটানুকীট, ইষ্টক, প্রস্তর সকলেই ত পরব্রহ্ম হইতাম; সকলেই অনন্তশক্তিশালী হইয়া কত কত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতাম! যেমন ধাতুই খনিজ বটে কিন্তু খনিজই ধাতু নহে, মানব মাত্রেই নশ্বর বলিয়া কি নশ্বর মাত্রেই মানব হইতে পারে? সেইরূপ "আমি তিনিই" কিন্তু তিনি আমি নহি। তবে আমাতে তাঁহার অংশ—তাঁহার তাঁহাত্ব যখন রহিয়াছে, তখন অবশ্যই বলিব,—"আমি তিনিই"।

কিন্তু তিনি স্রষ্টা, আমি সৃষ্ট, তিনি কারণ—আমি তাঁহার কার্য্য। তবে কি—কারণ ও কার্য্য একই পদার্থ? কার্য্যে কি কারণের অংশ আছে?

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের স্থূল দৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে হইবে। বস্তুর তারতম্য বা ইতর বিশেষ আমাদের স্থূল দৃষ্টির ফল মাত্র। আমরা বস্তুকে বড়, ছোট, তিক্ত, অম্ল, দূষিত, পবিত্র, সজীব, নির্জ্জীব প্রভৃতি যে সকল আখ্যা প্রদান করি, সে সমস্তই আমাদের কল্পনা

প্রসূত। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে আর ভেদ জ্ঞান থাকে না, সমস্তই এক হইয়া যায়। তখন দেখা যায়,—পদার্থ মাত্রেই পঞ্চ ভূতাত্ম, পরমাণু সমূহের বিকার বা বিকাশ মাত্র। আমি যাহা অম্ল বলি—অপরের হয়ত তাহা তিক্ত, আমার দূষিত—অপরের পবিত্র, আমার পক্ষে যাহা বড় কাহারও হয়ত তাহা ছোট; বস্তুতঃ এ সকলই আমাদের কল্পনা মাত্র। এই মানবদেহ ও মৃত্তিকাপিণ্ড কি এক পদার্থ নহে ? সেই দেহের পোষক খাদ্য, যাহা জ্ঞান, বুদ্ধি চৈতন্যের উপাদান, তাহা কি মৃত্তিকার অংশ বা বিকার মাত্র নয় ? আজ যাহাকে আমরা অপবিত্র বা অতি তুচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিতেছি, কল্য সেই বস্তুই বিকৃত হইয়া হয়ত আমার শরীরের রক্তরূপে—অতিপবিত্র—অতিমহতে পরিণত হইবে। অতএব আমরা যে পার্থক্য জ্ঞানে সর্ব্বদা অভিমান করি, তাহা কিছুই নহে। কীটাণুও যাহা, আমার দেহও তাহাই, ইষ্টক প্রস্তরাদিও তাহাই; কেবল সেই একের বিকার বা অবস্থান্তর মাত্র।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে ব্রহ্মাণ্ড কেবল পরমাণু-সমষ্টি মাত্র তাহাই সৃষ্ট, আর পরব্রহ্ম তাহার স্রষ্টা। এখন ব্রহ্মাণ্ড ও পরব্রহ্ম এক পদার্থ কি না ? তাহাই দেখা যাউক।

মহাকাব্য "শকুন্তলা" কালিদাসের সৃষ্ট। শকুন্তলা কার্য্য, কালীদাস কারণ; এস্থলে এই কার্য্যে কারণের সত্ত্বা আংশিক ভাবে বর্ত্তমান আছে। শকুন্তলাতে এমত বিষয় আছে, যাহা লইয়াই কালীদাসের কালীদাসত্ব, যাহা অবশ্য অন্যের রচিত পুস্তকে নাই। মৎকৃত বস্তুতে আমার আমিত্বের অংশ বা বিকাশ অবশ্যই আছে, তবে সে বস্তু ও আমি কেমন করিয়া ভিন্ন পদার্থ হইব ? যখন শকুন্তলায় কালীদাসের পূর্ণ-বিকাশ দেখিতে পাই, তখন কেমন করিয়া বলিব যে শকুন্তলায় কালীদাসের অংশ নাই, অথবা কালীদাস ও শকুন্তলা এক পদার্থ নহে ? আমার সৃষ্ট বস্তু যখন আমার অংশ স্বরূপ হইয়া আমি তিনিই, তখন আমার আত্মা কেন না বলিবে "আমি তিনিই", ব্রহ্মাণ্ড কেন না বলিবে "আমি তিনিই ?"

"আত্মা বৈজায়তে পুত্র" এই শ্রুতি বচনে, উক্ত পুত্র ও পিতা অবশ্য এক পদার্থ;—পিতা কারণ, আর পুত্র তাঁহার কার্য্য; কিন্তু এই কার্য্যে

কারণের অংশ পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। পুত্রতে পিতার বিকাশ বা বিকার স্পষ্টই বিদ্যমান রহিয়াছে; এ স্থলে পুত্র কি বলিতে পারে না "আমি তিনিই"? তবেই যখন মৎকৃত বস্তুতে আমার আমিত্ব, শকুন্তলায় কালীদাসের কালীদাসত্ব ও পুত্রে পিতার পিতৃত্ব আংশিক বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন অবশ্যই এক পদার্থ। এক স্রষ্টা এবং অপর সৃষ্ট হইলে, শক্তির তারতম্য থাকিতে পারে, পদার্থগত প্রভেদ থাকিতে পারে না।

তবেই আমি, তুমি, কীটানু সকলেই তাঁহার অংশ সুতরাং আমরা তিনিই। ইহাই হিন্দুর "সোঽহং"। এই "সোঽহং" লইয়াই হিন্দুর হিন্দুত্ব, এই "সোঽহং" হিন্দু যেমন বুঝিয়াছেন আর কোন ধর্ম্মাবলম্বী সেরূপ বুঝিতে পারেন নাই, সৃষ্ট ও স্রষ্টাকে এক পদার্থ, ইহা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কার্য্যতঃ বুঝিলেও তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। হিন্দুই কেবল মানবদেহ হইতে প্রস্তরাদি অচেতন পদার্থতেও তাঁহার বিকাশ, তাঁহার অংশ দেখিতে পান। সর্ব্বভূতে যে তিনি বর্ত্তমান তাহা—"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ" এই গীতা বচনেই প্রতীত হয়। ইহা বুঝিয়াই হিন্দু সর্ব্বজীবে সমদর্শী, আত্মাভিমান শূন্য এবং প্রতিমা পূজক। হিন্দু দারু, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতিতেও অনন্ত শক্তির বিকাশ দেখিয়া ভাবে বিভোর হন ও তাহার সম্মুখে প্রণত হয়েন। হিন্দুর প্রতিমা পূজার এই মূলসূত্র, এই "সোঽহং" তত্ত্বই ইহার কারণ। প্রতিমায় যখন তাঁহার স্বত্বা বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেমন করিয়া নিষেধ করিয়া মাথার দিব্য দিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিয়া রাখিব—"প্রতিমা পূজা করিও না"? যদি অনন্ত শক্তিকে পূজা করিতে পারি, তবে তাহার অংশকে কি পূজা করিতে পারিব না? কেবল স্থূল দৃষ্টির বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বিচার করিলে চলিবে না; এ বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দিব্যচক্ষে দেখিয়া বিচার করিলেই এই প্রতিমা কি? আমি কি? বিশ্ব কি? তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। আর সকলেই সমস্বরে বলিবে "সোঽহং"

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

—•—

ত্রিধারা।

প্রথম ধারা—প্রতীক্ষা।

পূরণিমা নিশি, ভালে বাঁকা শশী,
নয়নে ঘুমের ঘোর ;
নীল নভ কোলে, যায় ঢ'লে ঢ'লে,
নিশা হয় হয় ভোর।
মলয়ের থরে, অনুরাগ ভরে,
পিয়াসে বসে চকোর ;
অমিয় আশায়, শশী পানে চায়,
নিশা হয় হয় ভোর।
নীরব নিথর, আছে চরাচর,
পাখী শাখী নাহি গায় ;
তারা জ্যোতি ধারা, যেন দিশেহারা,
বহে কি না বহে বায়।
মিলিত নয়ানে, যেন কি ধেয়ানে,
জগৎ ভরিয়া আছে ;
যেন কি স্বপন, করে বিচরণ,
জগতের আগে পাছে !
মধু নিধুবনে, বেতস বিতানে,
পা'বে ব'লে মনোচোর ;
যাপি'ছে যামিনী, রাধা বিনোদিনী,
নয়নে বহিছে লোর।
কুসুমের থরে, সাজা'য়ে বাসরে,
মলয়জে লিখি' তনু ;
কুসুম শয়নে, রচি' সযতনে,
কাম-ফুল, শর-ধনু ,—

সেফালি মালতী, তুলি' সাধে অতি,
গাঁথি' বিনা সূতা হার ;
উপজিল চিতে, কানুরে বরিতে,
অনুরাগ সে রাধার।
চৌদিকে নিরখি', আর যত সখী,
ঘুমে আছে অচেতন ;
একা জাগি' রাই, ভাবিছে সদাই,
চিত চোরা শ্যামধন।
মণিহারা ফণি, মনে দুঃখ গণি,
হতাশে যেমতি চায় ;
বিহনে মুরারী, তেমতি সে প্যারী,
দুটী আঁখি ভেসে যায় !—
"আসিব বলিয়ে, গেল আশা দিয়া,
সে শ্যামসুন্দর মোর ;
"শ্যামের ধেয়ানে, চাহি' চাঁদ পানে,
রজনী করিনু ভোর।
"মৃদু বায়ুভরে, পাতা মর মরে,
চমকে থমকে চাই ;
"ভাবি দাসীবাসে, আসে পীতবাসে,
হরষে দেখিতে ধাই।
"পিক কলস্বনে, ভাবি মনে মনে,
বাঁশরী বাজিল ওই !
"মুরলীবদন, কোথা প্রাণধন,
কই শ্যাম মোর কই ?

"চিত্ত মন হারা, পাগলিনী পারা,
আমি যেন মোর নই ;
"না দেখি' নাগরে, সরমের ভরে,
মরমে মরিয়ে রই।
"শিখী পাখা চূড়, রতন নূপুর,
যাধের মোহন বাঁশী ;
"সাজাইব ব'লে, বড় কুতূহলে,
গাঁথিনু মালার রাশি।
"ভিজাইনু তা'য়, আঁখি নীরে হায়!
গেল তবু শুকাইয়া ;
সে যে কম হার, রাধা মত তা'র,
নহে ত কঠিন হিয়া।

মাতি' প্রেমরঙ্গে, লিখিতে শ্রীঅঙ্গে,
অলকা তিলকা চাঁদ ;
আনিনু হরষে, মলয়জ রঙ্গে,
বিধাতা সাধিল বাদ।
কাল প্রাতে হায়, দিব যমুনায়,
ভাসা'য়ে কুসুম সাজ ;
বিনা সেই কালা, কুসুমের মালা,
মলয়জে কিবা কাজ?
শ্যাম নাম ধরি', শ্যাম রূপ স্মরি',
ডুবিব যমুনা জলে ;
ব'লে যা'ব তা'রে, সঁপিতে আমারে,
মোর শ্যাম পদতলে।"

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চি।

—•—

আমার শিক্ষা।

[সত্য ঘটনামূলক।]

অগ্রহায়ণ মাস। রাত্রি আন্দাজ দুই প্রহর। হিমাণীপাতে গ্যাসের আলোক সত্ত্বেও দূরস্থিত বস্তু-নিচয় আবছায়ার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আকাশে চন্দ্র ও নক্ষত্রগুলি যেন-কি-এক গভীর শোকে ম্রিয়মাণ; কাহারও মুখে সে উজ্জ্বল অথচ মধুর হাসি দেখা যাইতেছিল না। অবিশ্রান্ত-কার্য্যে ব্যস্ত অশান্তি-পূর্ণ কলিকাতা সহরের জনস্রোত ও কোলাহল ক্রমশঃই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। দুই একখানি ছ্যাক্‌রা-গাড়ী, শোক-দুঃখ-নৈরাশ্য-খিন্ন মানব-জীবনের ন্যায় অতি ধীরে—অতি শ্রান্ত ভাবে—মরি-বাঁচি করিয়া, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারই শেষ শব্দ এবং পার্শ্বদেশ প্রবাহিতা পতিতোদ্ধারিণী পবিত্র সলিলা ভাগীরথীর অস্ফুট-কল-নাদ, কেবল শ্রুতিমূলে পশিতেছিল মাত্র।

এমন সময়ে আমি—একাকী উৎকট মানসিক পীড়ায় অস্থির হইয়া, কথঞ্চিৎ শান্তিলাভাশায়, ভাগীরথী-তীরে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। প্রিন্সেপের (Prinsep's ghaut) ঘাট ছাড়াইয়া, কিছু দূরে যাইলে, শুনিতে পাইলাম, একজন কে গাহিতেছে :—

"আমি শিখেছি দোকানদারী।
(ওরে) ভাঙা মন জোড়াতে পারি,
তোরা ভাঙা মন জোড়া দিবি কেগো আয় !"

গানটি শুনিয়া আমি একটু থমকিয়া দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন সময়ে এমন স্থানে, আমারই মতন কোন সংসার-কঠোরতা-বিদ্ধ, দারুণ নৈরাশ্যপীড়িত হতভাগ্য ভিন্ন, অপর কেহ আসিতে পারে না। আরও বুঝিলাম, হৃদয়ের অপরিসীম—অকথনীয় যন্ত্রণারাশি, সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে স্থান না পাইয়া, তাহার এই প্রাণস্পর্শী—আকুল-অব্যক্ত-গভীর-ব্যথা-বিমিশ্রিত সঙ্গীত-স্রোতে বাহিরে উথলিয়া পড়িতেছে। ধীরে ধীরে—এক পা দু'পা করিয়া তাহার নিকটে গেলাম। আমাকে দেখিয়া, লোকটি যেন একটু অপ্রতিভ হইল। আমি নীরবে দাঁড়াইয়া, তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। লোকটির বেশ-ভূষা এবং অযত্নে-রক্ষিত বিশুষ্ক-মলিন চেহারা দেখিয়া, আমি সংসারের শিক্ষিত জ্ঞান-গরিমার বিরাশীর ওজন দ্বারায় তাহাকে একবার মাপিয়া জুঁকিয়া দেখিলাম,—সে একটা অন্তঃসার শূন্য পাগল ব্যতীত আর কিছুই নয় !!

বলিহারি, মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি !!! মানুষ যখন অন্যের হৃদয় মন বুঝিতে পারে না, তখনই তাহাকে পাগল বলিয়া, উপহাস করে ! তাই নয় কি ? সংসারে কে পাগল নয় ? তুমি, আমি—সকলেই। কেহ ধনের, কেহ মানের, কেহ যশের, কেহ জ্ঞানের, কেহ ভালবাসার—এই যা' একটু প্রভেদ ! মানুষ পাগল তখন, যখন একটি মাত্র বিষয় বা চিন্তা, সর্ব্বোপরি তাঁহার মনে আধিপত্য বিস্তার করে। লোকে বলে, "রাধা, কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী"। ইহার গূঢ়ার্থ এই যে, রাধিকা অন্তরে বাহিরে—সর্ব্বত্র এক কৃষ্ণরূপ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। কোন বিষয়ে তন্ময়ত্ব বা অন্তর্লীনতা না জন্মিলে, কেহ পাগল হইতে পারে না।

পাগল হওয়া সকলের পক্ষে সহজ-সাধ্য নহে। থাক ও সব দার্শনিকের কূট তর্ক।

তাঁহাকে মৌনী দেখিয়া আমিই অগ্রে কথা কহিলাম। জিজ্ঞাসিলাম,—"তোমার নাম কি ?"

লোকটি আমার মুখপানে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, একটি মর্ম্মভেদী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল, কোনই উত্তর করিল না। আমি আবার প্রশ্ন করিলাম,—"তোমার নাম ?"

"আমার নাম শুনিয়া, তুমি কি করিবে ?"—একটু দৃঢ়তা-ব্যঞ্জকস্বরে এই কয়েকটি কথা উচ্চারিত হইল।

আমি। আবশ্যক আছে। বলিতে আপত্তি কি ?

লোকটি। আমার নাম ? আমার নাম এক্ষণে পাগল। তোমার দরকার কি ?

আমি। তুমি ক্ষণকাল পূর্ব্বে গাহিতেছিলে যে, ভাঙ্গা মন জোড়া দিতে পার। সত্যই কি ? নিষ্ঠুর সংসারের কঠিনতম নিষ্পেষণে আমার হৃদয় মন বিধ্বস্ত—বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! তুমি জুড়িয়া দিতে পার কি ?

পাগল আবার গাহিল ;—

"আমি শিখেছি দোকানদারী।
(ওরে) ভাঙ্গা মন জোড়াতে পারি"—ইত্যাদি।

গান গাওয়া শেষ হইলে, পাগল আমায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার মন কিসে ভাঙ্গিয়াছে, ভাই ?"

আমি। প্রণয়ে মিলনাভাবে! তোমার মন ভাঙ্গিয়াছে কিসে, ভাই ?

পাগল। আমার কথা এখন থা'ক। তোমার মন ভাঙ্গিবার কারণ, তুমি বলিলে,—প্রণয়ে বিচ্ছেদ। আমি তোমাকে যে যে প্রশ্ন করিব, তার যথাযথ উত্তর পাইলে, তোমার মন জোড়া দিয়া দিতে পারি।

আমি। ঠিক উত্তর পাইবে।

পাগল। তুমি এখন সংসারী কি সংসার-বিরাগী ?

আমি। এখনও সংসারেই আছি ; কিন্তু সংসারের প্রতি পূর্ব্বের আর তত্‌টা টান নাই।

পাগল। তুমি ভালবাসিয়া প্রতিদানে ভালবাসা কি প্রত্যাখ্যান পাইয়াছিলে?

আমি। ভালবাসা পাইয়াছিলাম। শুধু মিলন-আশায় বঞ্চিত হইয়াই, আজ এইরূপ কক্ষ-ভ্রষ্ট-নিরাশ্রয় তারার ন্যায় এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! আমার জীবনে সকল আশায়, সকল সুখের খেলায় 'দাঁড়ি পড়িয়াছে'! ভাই পাগল! আমি এই বিশাল সংসারে শুধু—শুধু এক বিন্দু ভালবাসা,—একটু স্নেহ-মাখা সকরুণ দৃষ্টির ভিখারী! আমার সব থাকিতেও, আমি আজ পথের কাঙ্গাল—চিরদুঃখী! এ দোষ কাহারও নয়, আমারই। আমি যদি মন্দভাগ্য না হইব, তবে সকলে আমায় অস্পৃশ্য জ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করিবে কেন?

পাগল। তত্রচ তুমি ভাগ্যবান্ ও সুখী। তোমার জীবনের সব দুঃখ, সব আশা এখনও ফুরায় নাই; শুধু আংশিকরূপে ফুরাইয়াছে। এক্ষণে তোমার যদি আবার কেহ তেমনই করিয়া সমস্ত হৃদয়টা দিয়া ভালবাসে, তবে তুমি আবার সুখের প্রত্যাশা কর কি?

আমি। করিতে পারি।

পাগল। তাহা হইলে, তুমি স্নেহ-বন্ধনের অভাব বশতঃই সংসারে বীতশ্রদ্ধ। এই অভাব সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে। কেননা, একের প্রণয়ে বিচ্ছেদ সঙ্ঘটনা হওয়ায়, তোমার যে মনোকষ্ট হইয়াছে, অন্যের অকৃত্রিম-আত্মস্বার্থ-ভোলা-প্রেম-সর্ব্বস্ব হৃদয়ের সংস্পর্শে তুমি সে কষ্ট বিস্মৃত হইতে পার। সুতরাং তোমার জীবনে এখনও সুখের নেশার ঝোঁক একটু লাগিয়া রহিয়াছে। অতীত প্রণয়ের জ্বালাময়ী স্মৃতির হ্রাস প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, সংসারের প্রতি বিরাগ কমিয়া, উত্তরোত্তর অনুরাগের বৃদ্ধি হইবে। আমার এই কথা, পাগলের প্রলাপ বলিয়া, তোমার নিকটে প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু, ভাই! সংসারে মনুষ্য জীবনে কিছুই অসম্ভব নয়! সংসারের রীতিই এই। মুহূর্ত্তকাল যাহাকে না দেখিলে, জগৎ সংসার শূন্য দেখিতাম, চন্দ্র-সূর্য্য ম্লানবোধ হইত, হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত, জীবন দুর্ব্বিষহ যন্ত্রনা ভারে নত হইয়া পড়িত, আজ তাহাকে হারাইয়াও ত জীবিত রহিয়াছি! মানুষের স্নেহ-মমতারএই পরিণাম!!

আরও, একদিন যে ভাবীবিরহ-বিচ্ছেদের কল্পনায়ও শরীর শিহরিয়া উঠিত, মন অবসন্ন হইয়া পড়িত, আজ সেই বিষম বিচ্ছেদ-বিষও ত হৃদয়ে পোষণ করিয়া, সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি! মানবের এই ভাগ্য বড়ই নিদারুণ! মানুষ সব সহিতে পারে! এ জীবনে দুই বিন্দু চক্ষের জলে, আশা ভালবাসা, বিরহস্মৃতি, শোক, তাপ, দুঃখ, সমস্তের শান্তি—শেষ! দুঃখ-নৈরাশের প্রথম বেগধারণ করা কষ্ট-সাধ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাই! তাহাও ত স্নানাহারের সহিত দিন দিনই শিথিলতর হইতে থাকে! কিছু দিন পরে, তার নামগন্ধও থাকে না! যাহার জীবনে কণামাত্রও সংসার-সুখ-তৃষ্ণা, মায়ার রক্ষণ নাই, প্রকৃত পক্ষে তাহারই মন ভাঙ্গিয়াছে। অতএব তোমার মনত ভাঙ্গে নাই; ভাঙ্গিলে, আমি জোড়া দিতে পারিতাম। তুমি সংসারের কীট, সংসারেফিরিয়া যাও।”

ক্ষণকাল পূর্ব্বে, পাগল মনে করিয়া, যাহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম, সেই পাগলের জ্ঞান-গর্ভ বাক্য শুনিয়া, আমার আর বাক্যস্ফুরণ হইল না, নিরুত্তর হইলাম। মনে ভাবিলাম—হায়! অতীত প্রেমের পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া তাহারই চিন্তায় বা ধ্যানে নিজের স্বত্বা বা নিজত্ব বিলীন করিয়া যদি এমনই পাগল হইতে পারিতাম! বুঝি মিলনাপেক্ষা বিরহীর চিরজীবনব্যাপী ব্যাকুলতাই অধিকতর সুখকর! আসিবার কালে বলিলাম—“ভাই পাগল! তোমার কথা বার্ত্তায় তোমাকে একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী বলিয়া আমার বেশ ধারণা হইয়াছে। তোমার দুর্দ্দশাগ্রস্থ জীবন-কাহিনী শুনিবার জন্য, আমার বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে। কৌতু-হল নিবৃত্ত করিবে কি?”

পাগল। আজ নয়, আর একদিন।

আমি। কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব?

“আগামী শিবচতুর্দ্দশীর দিন—এই খানে”।—এই বলিয়া পাগল ইডেন গার্ডেনর [Eden Garden] দিকে চলিয়া গেল। আমি, উভয়ের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সাক্ষাতেরবিষয় চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। শিব চতুর্দ্দশীর দিন পাগলের পুনঃ দর্শন পাইলে, আশা আছে, তাঁহার বিচিত্র ঘটনা-পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত সকলকে শুনাইব।

পরিশিষ্ট।

• পাগল আমায় যে কয়েকটি কথা বলিয়াছে, তাহা অপরকে ভাল না লাগিতেও পারে। কিন্তু ঐ কয়েকটি কথায়, আমার এক গভীর শিক্ষা হইয়াছে। উহাতে এখন কিছু বিশেষ নূতনত্ব কিম্বা বিশেষত্ব নাই, যাহাতে এক জনের জীবন-গতি সম্যক পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তবে সময়, স্থান এবং ঘটনার ইতর বিশেষতায়, সময়ে সময়ে এক একটি বিষয় বা বাক্য মনুষ্য জীবনে আশ্চর্য্যরূপে কার্য্য করিয়া থাকে,—ইহা অস্বীকার যো নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

— ০০ —

কোথায় গেল ?

এই যে মলিনা, হীনা ক্ষীণা, রুগ্না শিশুটী শয্যায় শুইয়া শুইয়া শুইয়া, কত কথা বলিয়া, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় কখন স্তিমিত ভাব ধারণ করিয়া কখন বা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, কখন বা আশায় কখন বা নিরাশার সাগরে ডুবিতেছিল, সে কোথা' গেল ? এ পৃথিবী তন্ন তন্ন করিলাম. কোথাও ত তাহার সন্ধান পাইলাম না। হায়! আর কি সেই পবিত্র, সেই স্বচ্ছ শলীলের মত নির্ম্মল, সেই প্রভাতশিশির বিধৌত কুসুমের মত সুন্দর মুখখানি ইহ জীবনে দেখিতে পাইব না? প্রতিধ্বনী হইল—"পাইব না"। প্রতিধ্বনী দৈববাণীর ন্যায় বোধ হইল। মন বড়ই অস্থির হইল। ভাবিলাম—যাহাকে এত করিয়া সযতনে প্রতিপালন করিলাম—যাহার আধ আধ কথা শুনিয়া ক্ষণেকের জন্য সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিতাম, যাহার পবিত্র মুখ কমল দেখিয়া ক্ষণেক মন পূত হইত, তাহাকে আর দেখিতে পাইব না!

হিন্দুশাস্ত্রে বলিতেছে যে মানুষ মরে না। মানুষ অবিনাশী। মানুষের আত্মা পুরাতন বস্ত্র ত্যাগের ন্যায় পুরাতন' দেহ ত্যাগ করে মাত্র। সুতরাং যে জন্মিয়াছে, সে মরিবে, যে মরিয়াছে সে আবার জন্মিবে। অতএব মানুষের মৃত্যুতে শোক করা বৃথা।

শাস্ত্রের কথা শিরোধার্য্য, কিন্তু পাপীর মনে সব সময়ে শাস্ত্রের পবিত্র কথা স্থান পায় না, উপরে কেবল ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। যদি শাস্ত্রের কথা সত্য বলিয়া মনে দৃঢ় প্রতীত হইত—তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছ—ইহা যেমন সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, যদি শাস্ত্রের কথা সেইরূপ প্রত্যক্ষীভূত হইত তাহা হইলে, "মরিলে শোক করা বৃথা" এই বাক্যে মন প্রবোধ মানিত। কিন্তু হায়! ঘোর অবিশ্বাসী আমি। শান্তি আর কোথায় পাইব ? মন সর্ব্বদা জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে তথায় অনিলও সময় বুঝিয়া হু হু করিয়া বহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে শান্তি অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু কৈ সব-ই বৃথা। অবিশ্বাসী কি শান্তি পায় ?

ভগবানের লীলা বড়ই প্রহেলিকাময়। যে যাইবার, সে যায়; আমি কেন বসিয়া বসিয়া তাহার জন্য কাঁদি ? সে কোথায় গেল, তাহা জানিবার জন্য আমার মন কেন এত উতলা হয় ? তাহাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ কেন অস্থির হয় ? কেন ইচ্ছা হয় যে দৌড়িয়া গিয়া কোথায় প্রাণের পুত্তলটী লুকাইয়া আছে, তাহাকে বাহির করিয়া একবার বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখি। কিন্তু হায়! যতই আমি ধাবিত হই, ততই হতাশ হই। সমুদ্র মগ্ন ব্যক্তি যেমন প্রাণ রক্ষার আশয়ে তরঙ্গায়িত জলরাশির উপর যখন সন্তরণ চেষ্টা করে, সেই সময় উর্ম্মিরাশি আসিয়া তাহাকে নিমজ্জিত ও নিরস্ত করে; আমারও তেমনি নিরাশার তরঙ্গ আসিয়া অশান্তির অতলস্পর্শ কন্দরে নিমজ্জিত করিতেছে। তবে কি আর শান্তি পাইব না ?

ভগবান! তোমায় সকলে সমদর্শী, দয়াময় বলিয়া পূজার্চ্চনা করে, সাধক তোমার উদ্দেশে গায়,—

"দয়ার যার নাহি বিরাম
ঝরে অবিরত ধারে"

কিন্তু হায়! আমার অদৃষ্টে এই অবিরাম দয়ার কি বিরাম হইল ? আমি পাপী অবিশ্বাসী বলিয়া কি আমায় চরণে স্পর্শ করিলে না নাথ! হায়! আমার পাপ অবিশ্বাস বড়ই অধিক, তাহা না হইলে আমার শান্তি হারাইব কেন ?

পাপীর শাস্তি হইল বটে, কিন্তু নাথ! তোমার সমদর্শী ও দয়াময় নামে কলঙ্ক পশিল। তোমার জিনিষ তুমি লইয়াছ, আমি আর তাহার জন্য কি বলিব, কিন্তু আমার হৃদয়ে তজ্জন্য কেন শেল-যন্ত্রণা উপস্থিত হইল? অবিশ্বাসী পাপীকে শাস্তি দিতেছ বলিয়া কি? মানুষ কেনই বা পাপী, কেনই বা পুণ্যাত্মা হয়। রাম কিসের জন্য তোমার প্রিয়-পাত্র হইয়া পুণ্যাত্মার শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন, আর শ্যামের কি দোষ যে তাহাকে একবারে পাপনিচয়ে নিমজ্জিত করিলে? যদি কার্য্যাকার্য্য, বিশ্বাস অবিশ্বাস, পাপ ও পুণ্য পথের পরীক্ষা হয়, তবে রামকে বা কেন সুকার্য্যে ও সুবিশ্বাসে নিয়োজিত কর, আর শ্যামকে বা কেন অকার্য্যে ও অবিশ্বাসে প্রতারণা কর? তুমি সর্ব্বকার্য্যে নিয়ন্তা—তুমি সর্ব্ব জীবকে সর্ব্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতেছ। রামকে কেন পুণ্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সুখী করিতেছ? আর শ্যামকে না পাপ কার্য্যে লিপ্ত করিয়া নিমিত্তের ভাগী করিতেছ! হে নাথ! এই কি সমদর্শী বিশ্বনিয়ন্তার কার্য্য!

ভগবান বলিয়াছেন,—মানবের কার্য্যাকার্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন নাই। এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে 'তাঁহার' উপর সকল ফল অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিবে। ভাল, যদি তাহাই হয়, তবে সকলের কেন এক মন হয় না? সে ইহা বুঝিতে পারিল, আমি পারিলাম না কেন? সে পারিল বলিয়া কি শান্তি পাইল, আমি পারিলাম না বলিয়া কি শান্তি হারাইলাম! তাই আবার বলি,—যদি ভগবান সমদর্শী, তবে তাহায় আমায় এ প্রভেদ কেন? সে বা কেন যন্ত্রণার হাত এড়াইয়াছে, আমি বা কেন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছি? সে বা কেন শান্তি পাইয়া আনন্দে হাসিতেছে, আমি বা কেন কয়েক দিনের ক্ষণিক শান্তি পাইয়া আবার তাহা হারাইলাম?

হে নাথ! দয়াময় বলিয়া তুমি ভুবনে বিখ্যাত, কিন্তু আমার উপর কেন এত নির্দ্দয়? আমি যে সেই প্রাণের পুত্তলীটার জন্য যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছি, ইহা কি তুমি অন্তর্য্যামি হইয়া অজ্ঞাত রহিয়াছ? যিনি দয়াময়, তাঁহার অপরের কষ্ট দেখিয়া একটুও কি কষ্ট হয় না? পাপী,

অবিশ্বাসী বলিয়া একটীবার দয়া কর। প্রাণ বড়ই কাতর হইয়াছে; নয়নমণি হারাইয়া অন্ধ হইয়াছি,—চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছি। বলিয়া দাও নাথ! সে কোথায় গেল? একবার সেই সরল শান্তমুখখানি দেখিয়া আসি; একবার সেই প্রাণের পুত্তলীটীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসি।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু।

তুমি।

তুমি, তিমিরগগণে, উজল তারকা,
আঁধার হিয়ার আলো;
তুমি, কালিমা-লুকান, শরৎ-চাঁদিমা
প্রেমের প্রবাহ ঢাল!
তুমি, অমিয়া মাখান, ননীরপুতলি,
সরলা নলিনী বালা;
তুমি, বিষাদের গানে, বীণার ঝঙ্কার,
বিষাদ আতপে গলা।
তুমি, শ্যামের বাঁশরী উছলিত প্রাণা,
মোহন যমুনা-কূল!
তুমি, পরিমল ভরা মলয়া নাচান,
লাজময়ী বন-ফুল।
তুমি, ভাবে ঢল ঢল বসন্ত বল্লরী,
মরতে নন্দন ছবি;
তুমি, কমলের মনে, কুমুদ জড়ান,
চাঁদেতে সাঁজের রবি!
তুমি, সরম লুকান অস্ফুট শোকের
একবিন্দু অশ্রুবারি;
তুমি, অচেনা সাগরে, গভীর নিশীথে,
নাবিকের ধ্রুব-তারি।

তুমি, হতাশ জীবনে কুয়াষার মাঝে
অস্ফুট আশার বাণী;
তুমি, প্রজাপতি পাখে মু-খানি লুকান
বিজনে গোলাপ রাণী।
তুমি, অনাবৃষ্টি দিনে শ্যামল জলদে,
মধুর বিজলী হাসি;
তুমি, অনাহারে ক্ষীণ আতুরের মনে,
স্বপ্ন লব্ধ ধনরাশি!
তুমি, দুর্দ্দিনের দুখে নিরাশা স্তবধ,
জীবনে হরির নাম;
তুমি না হাসিলে মরেলো! ভুবন
হাসেনা ত্রিদিব ধাম!
রবি শশী গ্রহ সকলি মলিন
তোমার মলিন মুখে;
নীলিম আকাশ নীলিমা হারায়
ফুটেনা তারকা বুকে!
পরাণ ভরিয়া তোমারে হেরিনু
অধুনা মিটিল আশ,
যেনরে একটা হিয়ার গহ্বর
তবুও পূর্ণতা বাস!

ও মুখ চাঁদেতে বুঝিবা স্বজনি!
মোহের মদিরা ছিল,
চাহিতে চাহিতে হিয়ায় পশিল
পরাণ আসাড় ভেল।
ওমুখ নেহারি ঘুমান জীবনে
কি যেন স্বপন জাগে,
সেই দেশ ছবি আছিনু যেদেশে,
মানব জনম আগে!
ওমুখ চাঁদেতে চাহিতে চাহিতে
ভুলে প্রাণ সব জ্বালা,
শৈশবের স্মৃতি নূতন হইয়ে
হৃদি মাঝে করে খেলা!
নিতি নিতি হেরি নূতন মাধুরী
শারদ গগণ প্রায়,
তোমার ওমুখে রয়েছে ফুটিয়া
কভুনা পুরাণ হয়!
পিপাসা বাড়িল বুঝিতে নারিনু
তুমি যে কি সুধা সই!
মরণ অবধি হেরিলে নারিব
প্রেমরসে ভোর ভই!

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মায়া।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

৪

বছর ফেরেনি—গরিব বাপের সেই নোনাধরা এক তলাতে আরও নোনা ধরেছে, কোনও ঘরের কড়ি ঝুলেছে, কোনও ঘরের জানলা দরজা ভেঙ্গে চুরে ঝুঁকে প'ড়েছে; উঠোনে ঘাস—গলি পথে মাকড়ষার জাল—গজিয়েছে—ছড়িয়েছে; তার উপর ব্যাচারীর চাকুরি গেছে—আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত হয়েছে, উৎসাহ উচ্ছ্বাস, জীবনের উল্লাস একে একে ছুটে পালিয়ে গেছে! সে গরিব বাপ আর নাই, গরিব বাপ ভিখারী হ'য়েছে—গরিব বাপের ছায়াটী মাত্র আছে;—একখানা মাংস-শিরা-হীন কঙ্কাল, যেন একটু জোর বাতাসে ভেঙ্গে চুরে প'ড়ে যা'বে ব'লে, আল্‌তো আল্‌তো দাঁড়িয়ে আছে! সে বাপের জ্বালা, বাপই জানে। মায়ার মাতে আর পদার্থ নাই—সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে অভাগিনী এখন শয্যাশায়িনী হ'য়ে আছে। জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে—এখন ছায়ের ঢিপিতে পরিণত হ'য়েছে! একটু জোরে ফুঁ দিলেই

হয়ত চারিদিকে ছড়িয়ে পোড়ে উড়ে যাবে—অভাগিনীর চিহ্ন মাত্র থাক্‌বে না!

"মেয়ে আস্‌বে" "মেয়ে আস্‌বে" ক'য়ে দিন গেল—সপ্তাহ গেছে,—পক্ষ গেছে,—মাস গেছে—বৎসর যায়। কৈ মেয়েত এলো না? হয়ত আর আস্‌বে না! হয়ত তারা আর পাঠাবে না! অভাগিনী মা'র প্রাণে আর সয় না যে! আর দেখ্‌তে পা'বে না—এ ভাবনার ধারণা কিছুতেই সইছে না—বুক ভেঙ্গে গেছে—সেই ভাঙ্গা পিঁজরের ভিতর প্রাণ পাখী—আর থাকতে চাচ্ছে না। মায়ার পীড়িত ভিখারী বাপ, কোঠর-লগ্ন-চক্ষে একদৃষ্টে তা'রপানে চেয়ে আছে—পাখী কখন পালায়? রুগ্না বৈদ্যের ঔষধ নেয় না, পথ্য পায় না,—পেলেও খায় না; আগে পাঁজর ভাঙ্গা নিশ্বেস ফেল্‌তো—এখন আর ফেলে না; ফেল্‌তে ভাঙ্গাবুকে বড্ড লাগে! হাপুস্ নয়নে কাঁদ্‌তো, এখন আর কাঁদে না—কাঁদ্‌তে আর পারেনা গো! শীর্ণ মুখে পাগলিনীর হাসি হাসে, আর অতি ক্ষীণস্বরে রুগ্ন স্বোয়ামীর হাত ধ'রে মাঝে মাঝে বলে—"ওগো! আমার সোণার প্রিতিমে যে ভেসে যায়! তোমার পায়ে পড়ি—এনে তারে স্থাপিত কর—দেখে মরি—ম'রে বাঁচি।" দুঃখিনী প্রলাপ বকে,—ছেঁড়া কাঁথার উপর, থেকে থেকে উঠে ব'সে, আর ঘুরে প'ড়ে ভিরমী যায়। মায়ার দুর্ব্বল বাপ. মোরে মোরে তার শুশ্রূষা কর্ত্তে এগোয়! পারে না—জলের গ্লাস কম্পিত হাত থেকে প'ড়ে যায়—এক পা' না এগোতে, মাথা ঘুরে ওঠে—সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌তে থাকে;—অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ কর্ত্তে কর্ত্তে, রুগ্নার পার্শ্বে শরীর এলিয়ে দিয়ে; শুয়ে পড়ে; বুঝি মূর্চ্ছাও যায়! হায় হায়! এরূপে আর কতদিন কাটবে? আর যে দিন কাটে না! সর্ব্বস্ব গেছে,—ঘটি বাটী পর্য্যন্ত বিক্রী হ'য়েছে, আর যে দিন কাটে না! প্রাণ ভেঙ্গে গেছে—বুকের ভেতর থেকে রক্তাক্ত হৃদয় টুকু মুস্‌ড়ে ছিঁড়ে নেছে—আর যে দিন কাটে না!

যতদিন পায়ে বল ছিল, ভিখারী পাপ এতদিন রোজ—একবার দুবার, কোনদিন বা তিনবার কোরে, বেহায়ের পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌তে

যেতো! কঠোর বেই হেসে উড়িয়ে দিত! শ্লেষের শূলে বুক বিঁধে রক্তপাত কর্ত্তো! কখন দরওয়ান চাকর দিয়ে, অপমান কোরে বাড়ী থেকে তাড়াতে চাইতো—তা'ও সহ্য ক'রে সে বেচারী না গিয়ে থাকৃতে পাত্তো না;—চেপে চুপে একআদ্ দিন থাকৃতে চাইলে, মায়ার দুঃখিনী মা, দু'টি পায়ে ধোরে—কেঁদে ভাসিয়ে দিত। বাপ্ আবার যেতো—কেঁদে ফির্তো আবার যেতো! না গেলে, মা আবার কাঁদ্তো, আবার যেতো! মেয়ে কিন্তু আসেনা, মেয়ে তারা দেয় না তা আস্বে কি? মেয়েকে তারা দ'গ্ধে দ'গ্ধে মেরে ফেল্‌ছে—সে আস্‌তে পায় কই? মেয়েকে তারা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটে ফেল্‌ছে, সে আস্‌তে পায় কই? তাকে মারে, সে কাঁদে না; তাকে বকে সে মুখবুজে থাকে—খোলে না! চুপে চুপে রয়, চুপে চুপে সয়! স্বোয়ামী এখনও পূরো যুবা নয়, বালকত্ব আছে—মা অন্ত প্রাণ। অতশত বোঝে না বা বুঝতে লজ্জা পায়; তা'ই আমাদের মায়ার জ্বালা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে বড়ব্যথা পায়; আবার ভুলে যায়। বাপ মার জলন্ত পীড়ন চোল্‌তে থাকে। ঘা খায় বালিকা, কাঁদে—নীরবে কাঁদে। আর সেই নীরব কান্না গিয়ে বাজে, মায়ার দুঃখিনী মায়ের বুকে! পীড়াশয্যায় পাশে পতি পীড়িত, রোজ রোজ আর যাওয়া ঘটে না। একদিন খপর এল' মায়াকে তার শাশুড়ী. বিনি অপরাধে মেরে খুন্ ক'রেছে; বাছার মুখদে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়েছে। মায়ার মা মরাকান্না কেঁদে উঠ্‌লো! বাপ বেচারী বিভ্‌ভুল্ হোয়ে, কাঁপ্‌তে কাঁপতে উঠে—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ঘরের কোণ থেকে লাঠি গাছটি নিয়ে—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তা'তে ভর ক'রে—হীনবেশে যেন দীনের দীন—মলিনমুখে পথে বেরিয়ে বেইয়ের বাড়ীরদিকে এগিয়ে চল্লো। মন দৌড়ুতে চায়, দেহ পারে না! যায় যায়, হাঁটু ধ'রে ব'সে প'ড়ে! এ হিসেবে আর কতদূর যেতে পারে? আহা পারে না! ওই পারেনা, ওই-ওই আহা ওইযে! আর যাওয়া হ'লোনা! হাতের লাঠি খোসে পোড়্‌ল, মাথার ভেতর যেন বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌ল'। বুকে যেন বাজ্ বাজ্‌ল'! তারপর অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার। চোখে কাণে কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে, হাৎড়ে হাৎড়ে দু'পা এগিয়ে একজন ভদ্রলোকের রোয়াকে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বোসে

প'ড়্লো। ব'সে থাক্‌তে না পেরে শুয়ে প'ড়্‌তে হোলো। ছিন্ন বস্ত্রাবৃত রুগ্ন শরীর মৃতের ন্যায় বোধ হ'তে লাগ্‌লো! এক এক ক'রে রাস্তায় লোক জমে গেল। গৃহস্বামী ভদ্রলোক, বাহিরে এসে, মায়ার পিতাকে 'পড়সী' বলে চিন্‌তে পাল্লেন। রোগীর রোগক্লিষ্ট মুখের রক্তবর্ণ শিবনেত্র দুটী, ভদ্রলোকের মুখপানে স্থাপিত হ'ল। দুটী বড় বড় গরম জলের ফোঁটা—জলের কেন, বুক নেঙড়ান তাহা রক্তের ফোঁটা, চখের কোণ দিয়ে, শুষ্ক, শীর্ণ কপোলদেশ ভাসিয়ে গড়িয়ে পড়্‌লো! কথা কইবার সামর্থ্য ছিল না; দু'একবার মাত্র চেষ্টা ক'রে যেন মৃত্যু-যোগ-সাধনে চক্ষু মুদ্‌লেন! ভদ্রলোক বিপদ্‌ভেবে—লোকজন নিয়ে, সেই নির্জ্জীবপ্রায় রুগ্ন দেহ, ধরা-ধরি ক'রে তুলে, বাটীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। রুগ্নাপত্নি-দেহ পার্শ্বে রুগ্নপতিদেহ পতিত হ'লো। নীরব নিস্তব্ধ কক্ষে, ক্ষীণ, অতিক্ষীণ শোনিত শোষক শ্বাসের মাত্র শব্দ, থেকে থেকে শ্রুত হ'তে লাগ্‌লো! আর? আর যেন কালের করালচ্ছায়া বিভীষিকার রাজত্ব হ'তে নেমে এসে, অমাবস্যার অন্ধকারের ন্যায় দরিদ্র-দম্পতির মলিন দেহ ঢাকাদিয়ে ফেল্লে! ভাঙ্গা বাড়ীখানা খাঁ খাঁ কোর্ত্তে লাগ্‌ল!!

৫

এতদিনের পর আজ মায়া মুখফুটে বোলেছে—প্রাণের দায়ে আজ মায়া স্বোয়ামীর পায়ে মাথারেখে অনেক কথা ক'য়েছে! সেই গয়লা বুড়ো খবর দিয়ে গেছে—"মা মরে! বাপ্ মরে!" অভাগিনী এক বার কি তাদের দেখ্‌তে পাবেনা? এজন্মের মত একবার কি আর মনের সাধে "মা" "মা" বলে প্রাণ ভ'রে ডাকৃতে পাবেনা? ওগো! তোমরা মায়ার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিও, একবার তাকে যেতে দেও; মায়াকে যত পার যন্ত্রণা দিও, এক বার তাকে যেতে দেও; একবার এক দণ্ডের তরে তার মৃতপ্রায় বাপ্ মাকে দেখে আস্‌তে যেতে দেও; একবার সেই শূন্য পুরিতে আছড়ে প'ড়ে প্রাণ ভরে কেঁদে আস্‌তে যেতে দেও! মায়া বই যে তাদের এজগতে কেউ নাই! মৃত্যুকালে একটী বার তার চাঁদ মুখ দেখে তাদের মর্ত্তে দেও! তারা প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ ক'রে মর্ব্বে—যেতে দেও! বাছা! তোমার ভাল

হ'বে, যেতে দেও। স্বোয়ামী পিশাচ নয়—মানুষ! তার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো—চক্ষে জল এলো—অর্থ পিপাসু বাপের কঠোর নির্য্যাতন মনে হ'লো—ভ্রূসমেৎ কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো—মায়ের সাঙ্ঘাতিক পীড়ন মনে হ'লে—সর্ব্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধ'রলো। তারপর নিজের নিরীহেরভাবে, নিশ্চেষ্টতা মনে প'ড়ে, ঘৃণায়—লজ্জায়—পাতকের ভয়ে—সর্ব্ব শরীর কেঁপে উঠ্‌ল—শীর্ণা বালিকার হাত ধ'রে, তার অনেকদিনের অনেক কান্না, অনেক চক্ষের জল—একদিনে একেবারে মুছাবার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল!!

মায়ার শ্বশুরের আজ বড় আনন্দ—আজ জোচ্চোর বেইয়ের সেই তার কাছে বাড়ী বন্ধকরূপ মহা জুচ্চুরির আজ মহা দণ্ডের দিন! আইনের চক্রে, আদালতের সাহায্যে সব ঠিক! সেই লোনাধরা, ঝর্ ঝরে বাড়ী খানি—সেই গরীব ব্যাচারীর সেই গরীব ভিটেখানি গ্রাস করা হ'য়েছে, আজ তারির দখলের দিন! মায়ার শ্বশুরের আজ বড় আনন্দ, মরাকে মারিবার আনন্দ—এ পিশাচের আনন্দ—এ আনন্দ মর্ত্তে নরকের ছবি! এ আনন্দ বিকৃত সমাজের বিষাক্ত দৃশ্য কাব্য! ভুত প্রেত এর নায়ক; দানা দত্তি এর পার্শ্বচর! এরা খল খল হাসে; দরিদ্রের দর দরিত শোণিত সপ্ সপ্ শোষে! চক্ চক্ শব্দে অন্ত্র তন্ত্র শিরা মজ্জা চোষে! কড় কড়ে অস্থি কঙ্কাল চিবায়। মহাধ্বংশের মহা ভেরী নাদে সমাজের দুয়ারে দুয়ারে তাণ্ডব নৃত্য ক'রে বেড়ায়! ওই দ্যাখ! ঐ মূর্ত্তি কি না? মায়ার শ্বশুর দরিদ্র বেইয়ের বাস্ত আজ চরণে দলিত কোর্ত্তে এল কি না? ওই দ্যাখ! পুলিশ অগ্রগামী! মায়ার শ্বশুর "দাঙ্গা হ'তে পারে"—বলে দরখাস্ত করে ছিল, তাই আজ পুলিস অগ্রগামী! কিন্তু দাঙ্গার লোক কৈ? কৈ? বাড়ীর বাইরে—ভেতরেত কোন শাড়া শব্দ নাই? একি যেন মরণের নিস্তব্ধতা বিরাজ কর্চ্চে! সুমুখে ভাঙ্গা রোয়াক—রোয়াক দখল হ'লো; রোয়াকের গায়েই ঘর,—ঘর দখলের হুকুম হলো। ঘরের চোকাঠে পা' দিতে না দিতেই, ভেতর থেকে দু'টো বিকট দাঁড়কাক্ পাখসাট্ মেরে কঠোর ডাক্ ডাক্তে ডাক্তে ভাঙ্গা দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের

বার হ'য়ে উধাও হ'য়ে উড়ে গেল! পাহারওয়ালা "রাম-রাম" শব্দে পাঁচ পা পেছিয়ে পড়লো—ঘরের মধ্য হ'তে একটা গভীর শ্বাস পতনের শব্দ শোনা গেল—পর মুহূর্ত্তেই ক্ষীণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ! সবাই চমকিত—ত্রস্ত, অথচ নীরব! পরস্পরের চক্ষু পরস্পরের পানে—কাণে সেই আর্ত্তনাদ!! এবার মায়ার শ্বশুর অগ্রসর হ'ল। তৃপ্তি-বিস্ফারিত চক্ষে শার্দ্দূলের চাহনি চেয়ে দেখ্‌তে পেলে,—ভূতলে মলিন শয্যা—শয্যায় দু'টী কঙ্কালসার নরনারী, শয্যার সঙ্গে মিশিয়ে শুয়ে আছে। নারী কত কাল নীরব নিশ্চল—নর কঙ্কালে এখনও মৃদু মৃদু শ্বাস বইছে! গৃহে তৈজস পত্র কিছুই নাই। শয্যাপার্শ্বে একটী মাটীর পাত্রে জল, আর একটীতে অল্প মাত্র দুধ—হয়ত কোনও দয়ালু পড়সী রেখে গেছে! মায়ার শ্বশুর বেইকে চিন্‌তে পাল্লে—মনে কল্লে,—বেনবেটী বেয়ারামী বটে কিন্তু এর সব ভিট্‌কিলিমি। মনে কোর্চ্চে এ দেখে যদি মায়া দয়া হয়;—তা কিছুতেই হচ্চে না, আজ তাড়িয়ে ভিটেছাড়া ক'রে তবেপ্রাণের সাধ মিট্‌বে। আমার সঙ্গে চালাকি? আমার সঙ্গে জুচ্চুরি? আমায় ফাঁকি?

মায়ার বাপের মুদ্রিত চক্ষু অল্প মাত্রায় খুলে গেল; নাভি থেকে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে একটা গভীর প্রশ্বাস বায়ু নাশাপথদে না বেরুতে পেরে, ঠোঁটের বাঁধন ঠেলে বেরিয়ে মহা বায়ুতে মিশে গেল! মায়ার শ্বশুর, মুমূর্ষুকে চাইতে দেখে—জোর নিশ্বেস ফেল্‌তে দেখে, বিকট-স্বরে পুলিশকে হাত ধ'রে টেনে তুলে—গলাধাক্কা দিয়ে বেরকরে দেবার হুকুম দিচ্চে—এমন সময় বালিকার করুণরোলে বাড়ী ঘর পূর্ণ হ'য়ে গেল! উন্মাদিনীর ন্যায় এলোথোলো কেশে—বেশে, করুণরসের জীবন্ত প্রতিমা অভাগিনী মায়া মেয়েটী আমাদের, ছুটে এসে মাতৃ কঙ্কালের গলা জড়িয়ে ধ'রে বুকে মাথা রেখে শুয়ে পড়্‌ল। পর-ক্ষণেই—একি? ছিলামুক্ত ধনুর ন্যায়—আঘাতিত ফণিনীর ন্যায় সবলে উঠে, বাপের সেই শিবনেত্র পানে চকিতা হরিণীর ন্যায় চেয়ে দেখ্‌লে! এখন আর একটী শ্বাস বায়ু বিকৃত কণ্ঠ-শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত-মুখ-দ্বার দিয়ে ছুটে বেরিয়ে বাহিরের বায়ুতে মিশে গেল—"মায়ারে! তুই এতদিন পরে কি দেখ্‌তে এলি? এসে এ কি দেখ্‌লি?"

মায়ার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠ্‌লো; মার মৃতদেহ পানে একবার বিকট নেত্রে চাইলে—বাপের শেষ নিশ্বেস বেরুতে দেখ্‌লে! সজোরে একবার প্রাণ ভোরে উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠলো! তা'র পর সর্ব্বনাশ! মায়া যে আর কাঁদে না—যেন আর কাঁদ্‌তে পাচ্চে না! মুখখানা লাল হ'য়ে উঠ্‌লো! রক্তবর্ণ ঘূর্ণিত চক্ষু থেকে যেন লাল আলোকের ছটা বেরুতে লাগ্‌লো! দম্‌বন্ধ হ'য়ে—কপালের শিরাগুলো যেন দড়ার মত ফুলে উঠলো। তীরবেগে দাঁড়িয়ে উঠে অনেকক্ষণের অনেক চেষ্টার পর—সজোরে একবার "উঃ মাগো" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সোণার প্রতিমা যেন ভেঙ্গে চূরে পড়ে গেল। যুবক স্বোয়ামী শুশ্রূষার চেষ্টায় মুখ তুলে দেখে—আহা সেই সোণার মুখ পাঙ্গাশবর্ণ হ'য়ে গেছে! ঠোঁটের পাশে কসদে, অভাগিনী মায়ার ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরুচ্চে! মায়া আর সে ভাসা চোখে চেয়ে দেখ্‌লে না। সে চোক বুঝি জন্মের মত মুদিত হ'লো!! যে দারুণ রোগে মায়া দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পাল শুষ্ক হয়ে যাচ্ছিলো আজ তার শেষ! যে দারুণ ব্রত ধোরে আজ এক বৎসর কাল মায়া আশায় আশায় ভুলে থেকে আস্‌ছিলো আজ তার শেষ! সে মরণ ব্রতের আজ এই কঠোর উদযাপন!!!

তার পর? তার পর মায়ার শ্বশুর পুলিশ লয়ে আস্তে আস্তে সরে গেল। জ্ঞান পাপী কাপুরুষ বড় ভয় তার। ক্রুদ্ধ তনয়ের মুখপানে চাইতেও তাই ভয় হ'লো! ক্রুদ্ধ তনয় কাঁদ্‌লে না; একবার জন্মের মত বালিকা মায়ার মুখপানে চেয়ে চক্ষু মুদে মুখ ফেরালে! ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সংগ্রহ কোরে তিনটী শবদেহ শ্মশানে ল'য়ে পাশাপাশি তিনটী চিতায় সৎকার ক'র্ত্তে লাগ্‌লো। ছোট খালের এপারে শ্মশান, ওপারে মায়ার শ্বশুর বাড়ী। দাউ দাউ ক'রে চিতা জলে উঠ্‌লো। অকস্মাৎ তিনটী জলন্ত চিতা হ'তে তিনটী অগ্নিকণা উৎক্ষিপ্ত হোয়ে, ঐ বাড়ীর পাশের এক অতি বৃহৎ খড়ের গাদায় পড়্‌লো। খড়ের গাদা ধ'রে গিয়ে ক্রমে একতল, দ্বিতল, ত্রিতল বাড়ীটী সমেত পুড়িয়া ভষ্ম শেষ হ'লো! পরদিন শুনা গেল—বাড়ীর ভেতর থেকে কেউ বেরুতে পারে নি। সকলকেই পুড়ে প্রাণ দিতে হয়েছে! অনেককে জীবন্ত পুড়িয়ে—জীবন্তে পুড়ে প্রাণ

দিতে হয়েছে। মায়ার খোয়ামী শ্মশান হ'তে কোথায় চলে গেছে, তার খোঁজও হইল না—কেউ খোঁজ নেওয়ায় রহিল না।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

—•○•—

দিল্লি।

"Lone mother of dead empires"—*Childe Harold.*

অনন্ত প্রবহমান কাল-স্রোতের মুখে পড়িয়া, প্রতি নিয়ত জগতের অবস্থায় যে কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? আলোচ্য দিল্লি নগরী তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যিনি আর্য্য হিন্দুজাতির অতীত কীর্ত্তিকলাপ অবগত আছেন, তাঁহার নিকট দিল্লির নাম অজ্ঞাত নহে। আজ তৈলহীন ক্ষীণবর্ত্তি স্তিমিত-নিষ্প্রভ নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাবৎ দিল্লি নগরী সুদূর প্রসারিণী যমুনা তরঙ্গিনীর পশ্চিম তীরে ডিম্ ডিম্ করিয়া জ্বলিতেছে। কতবার কত কত প্রবল বাত্যা সুদূর এসিয়া প্রান্ত হইতে আসিয়া, দিল্লির উপর বহিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দিল্লির অস্তিত্ব লোপ করিতে পারে নাই। যদি কেহ ভারতবর্ষের আধুনিক অবস্থা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি বর্ত্তমান দিল্লিকে দেখিয়া, সে বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। মৃত্তিকাসাৎ হিন্দু-দেব-মন্দির, মুসলমানগণের অতীতকীর্ত্তির শ্রীভ্রষ্ট অবস্থা ও ভগ্নাবশেষ দর্শনে, সকলেরই মনে হইবে যে, আজ হিন্দুজাতি নিষ্পন্দ ও মুসলমানগণ বজ্রাহত বৃক্ষতুল্য নিস্তেজ ভাবে ভারত শশ্মানে অবস্থান করিতেছে!

সমগ্র জগতের ইতিহাসে যে শিক্ষা প্রদান করে, এক মাত্র দিল্লি-বিবরণে তদপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তি একমাত্র দিল্লির বিষয় চিন্তাকরিয়া, নলিনী-দলগত-জলবৎ নশ্বর দেহের ক্ষণস্থায়িতা, বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর চঞ্চলতা, এবং

চক্র ভ্রমনের ন্যায় অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনশীলতা, প্রভৃতি বুঝিতে সক্ষম হন। উন্নতি কিম্বা অবনতি জগতের চিরন্তন নিয়ম। যে দিল্লির প্রভাবে, একদিন অর্দ্ধ এসিয়া প্রকম্পিত হইত, যে দিল্লির ঐশ্বর্য্যে এক দিন সমগ্র জগৎ বিস্মিত হইত, আজ সেই দিল্লি—শৃগাল মূষিকের বাসভবন রূপে পরিণত! যে দিল্লি এক দিন সমগ্র ভারত পদানত করিয়াছিল, আজ সেই দিল্লি জগতের পরিবর্ত্তনশীল নিয়মের-নিকট পদানত।—একটী সামান্য নগরে পরিণত !!

পৌরাণিক কালের প্রায় ২৷৩ শতাব্দী পূর্ব্বে, দিলুনামক জনৈক রাজার নামানুসারে এই স্থানের নাম দিল্লি হয়। তিনি আলেক্‌জন্দারের আক্রমনের পূর্ব্বে, ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। * এই দিলু রাজার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পাণ্ডুবংশীয় নরপতিগণ এইস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যে সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ে এই স্থানকে ইন্দ্রপ্রস্থ বলা হইত। এই ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্টিরের পরিবর্ত্তী ত্রিশ জন নৃপতি, রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। পরে খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে, উক্ত রাজ্যের জনৈক মন্ত্রী, রাজ বিদ্রোহী হইয়া, উক্ত বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন। তৎপরে, অন্য দুইটী বংশের কয়েকজন নৃপতি রাজত্ব করিলে পর, খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা বিক্রমাদিত্য, উহাদের ও যুধিষ্ঠির-রাজ্যের লোপ সাধন করেন। ইহার পর হইতে কয়েক শতাব্দী, দিল্লি রাজহীন অবস্থায় থাকে। পরে ১১শ শতাব্দীতে তুয়ার বংশীয় রাজপুত সাম্রাট্ অনঙ্গপাল এইস্থানে রাজত্ব করেন। ইহার দৌহিত্র বীর পুঙ্গব পৃথ্বীরাজের রাজত্বকালে, গজনীশ্বর সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক ভারত আক্রান্ত হয়; এবং তৎকর্ত্তৃক এই পৃথ্বীরাজের জীবন-সূর্য্যের সহিত হিন্দু জাতির স্বাধীনতা-সূর্য্যও চিরকালের নিমিত্ত অস্তাচল-শিখরে প্রোথিত হয়।

দিল্লির প্রাচীন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। ইহার ধ্বংসাবশেষ, আধুনিক দিল্লি হইতে প্রায় ১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই ইন্দ্রপ্রস্থে হিন্দু

* Vide Mr. Brigg's translation of *Ferista* Vol. I. Page 45.

জাতির অনেক কীর্ত্তি রহিয়াছে। সাধারণে ইন্দ্রপ্রস্থকে "ইন্দারপৎ" কহে এবং এইস্থানে হিন্দুদিগের একটী পুরাতন দুর্গ থাকাতে ইহাকে "পুরান কেল্লা"ও * কথিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে যেস্থানে আগমবোড়ের ঘাট, পূর্ব্বে এই স্থানে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক রাজসূয়যজ্ঞ সমাহিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে স্থানে মধ্যমপাণ্ডব অর্জ্জুনের দুর্গ ছিল, এক্ষণে সেই স্থানে "হুমায়ুন-মস্‌জিদ্‌" বর্ত্তমান। এই স্থানের অনতিদূরে সেরশাহ বাটী-নির্ম্মাণ করিয়া, এই সমগ্র স্থানকে "সিয়ারগড়" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে তাহাতে দিল্লিকে "ইন্দ্রপৎ" বলিতে বিরত হয় নাই। বোধ হয় হিন্দুজাতির লুপ্তগৌরবের স্মরণার্থই এইরূপ হইয়াছে।

ভারতে মুসলমান বিজয়ের পর হইতেই, দিল্লি নগরী ইহাদিগের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। প্রথম পাঠান সম্রাট কুতবুদ্দীন, যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানকে কুতব-দিল্লি বলা হয়। দিল্লির অসামান্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, মুসলমান সম্রাটগণ সকলেই এই স্থানে বসিয়া ভারতের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা অজস্র ধনরাশি বিনিময়ে, বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদ, মিনার, মস্‌জিদ্‌ ও কবরস্থান নির্ম্মাণ করতঃ উক্ত স্থানকে আরও শোভাময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহাদের এই সব কীর্ত্তি, আজিও জগতের সম্মুখে ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের সাক্ষী দিতেছে। খৃঃ ১৪শ শতাব্দীতে, ইবন্ ভাতুতা ভারত ভ্রমণে আসিয়া, এইরূপ লিখিতেছেন,—"এই সাম্রাজ্যের (ভারতের) রাজধানী—দিল্লি, সৌন্দর্য্যে ও প্রভাবে জগতের অন্যান্য নগরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের সমতুল্য প্রাচীর জগতের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় প্রাচ্য-জগতে এরূপ নগর আর দু'টী নাই।"

আধুনিক দিল্লি ও ইহার প্রাচীন অংশের পরিধি প্রায় ২০ মাইল; কিন্তু কেবল দিল্লির পরিধি প্রায় ৭ মাইল মাত্র। মোগল সম্রাট্ সাহজাহান, দিল্লির যে অংশকে নিজব্যয়ে সজ্জিত ও অলঙ্কৃত করেন,

* মুসলমানগণ এই কেল্লা অধিকার করিয়া, ইহার অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। দেখিলে মুসলমানদিগের কৃত বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহাকেই বর্ত্তমান সময়ে দিল্লি বলা হয়। বিভিন্ন বিভিন্ন নৃপতি ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে অবস্থিতি করিয়া, সেই সেই অংশকে নিজ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন; প্রমাণ—সাহাপুর, সাহাজানাবাদ, তোগলকাবাদ, ফেরোজাবাদ্ ইত্যাদি। আধুনিক দিল্লি প্রাচীরে বেষ্টিত; কাশ্মীর, দিল্লি, কলিকাতা, লাহোর, আজমীর, কাবুল ও তুর্কোমান এই সাত নামযুক্ত তাহাতে সাতটী ফটক আছে। দিল্লি নগরীর রাস্তাদি বেশ পরিষ্কার। চাঁদনিচক্ নামক প্রশস্ত রাস্তা নগরের মধ্যে প্রধান।

কুতবুদ্দীনের নাম-প্রসিদ্ধ "কুতবমিনার" জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ। ইহা মর্ম্মর, শ্বেত ও রক্তবর্ণ প্রস্তরে মিশ্রিত। ইহা যখন প্রথমে নির্ম্মিত হয় তখন উহা ৭ তলা এবং উচ্চে ৩০০ ফিট্ ছিল। * পরে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ইহার উপরের দুই তলা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে ইহার উচ্চতা ২৪২ ফিট—৬ ইঞ্চ। এই মিনার, কাশ্মীর ফটক হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দিল্লিতে † আর একটী আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে ইহা "লোহার কা লাট্" বা লৌহস্তম্ভ। কোন ব্যক্তি, কখন এবং কেন যে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার স্থিরতা নাই। কেহ বলেন, যে পঞ্চদশ শত বৎসর অতীত হইল রাজা ধাব নামক জনৈক নরপতি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কেহ বলেন, ইহা পাণ্ডু নরপতিদিগের। যাহা হউক এই লৌহস্তম্ভ এতকাল রৌদ্র, তাপ, জল, ঝড়—সহ্য করিয়া আসিতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহাতে মরিচা পড়ে নাই কেন, ইহা আধুনিক সুসভ্য প্রাতীচ্য জগতের রাসায়নিক পণ্ডিতগণও যাহা স্থির করিতে পারেন নাই। প্রাচীন কালের হিন্দুরা রসায়নশাস্ত্রে যে কত দূর উন্নত ছিলেন, এই স্তম্ভ তাহার একটী দৃষ্টান্ত স্থল।

দিল্লির যে অংশে মোগল সম্রাটগণের প্রাসাদ ছিল, তাহা এক্ষণে জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। যদিও ইংরাজ রাজের কার্য্যে ইহার

* কেহ কেহ বলেন, এই মিনার জনৈক হিন্দু রাজা [জয়চন্দ্র] তাহার কন্যার [সংযুক্তা] যমুনা দর্শনাভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করেন, পরে কুতবুদ্দিন ইহার জীর্ণ সংস্কার করিয়া নিজ নামে অভিহিত করেন। আবার কেহ কেহ বলেন— ইহা কুতবের বিজয়স্তম্ভ।

† পুরাতন দিল্লি।

অনেকাংশের সংস্কার হইয়াছে তথাপি ইহা দেখিলে মনে স্বতই বিস্ময়ের উদয় হয়। সম্রাট্ আকবর নির্ম্মিত জয়মল্ল ও পুত্ত নামক দুই জন বীর-কুল-তিলক রাজপুতের প্রতিমূর্ত্তি, এই প্রাসাদের ফটকে সম্মুখে স্থাপিত ছিল কিন্তু এখন ইহার চিহ্ন মাত্রও নাই। * বীর সম্রাট্ আকবর, বীরের সম্মান জ্ঞাত ছিলেন তজ্জন্য এই বীরদ্বয়কে বীরোচিত স্থানে বসাইয়াছিলেন, কিন্তু কুটীল বুদ্ধি আরঙ্গজেব ইহাদিগের ধ্বংস সাধন করেন। এই প্রাসাদের প্রধান প্রবেশ দ্বারের নাম—লাহোর গেট। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর রক্ত-বর্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত ও ১১ মাইল বিস্তৃত। এই স্থানের নিকটেই 'দেওয়ান অম্' বা সাধারণ বিচারালয়। এই স্থানে সাম্রাট সাহাজাহানের একটী বহুমূল্য শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত সিংহাসন ছিল; তিনি তদুপরি বসিয়া বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এই সিংহাসনের মূল্য ৪ লক্ষ রজত মুদ্রা।

সাম্রাট সাহাজাহান নির্ম্মিত "জুম্মা-মসজিদ্" জগতের মধ্যে একটী প্রধান উপাসনালয়। ইহা ২০১ ফিট্ লম্বা ও ১২০ ফিট্ চৌড়া এবং নগরের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার সম্মুখে একটী বৃহৎ জলাধার বর্ত্তমান আছে। এই মসজিদের উভয়পার্শ্বে দুইটী প্রকাণ্ড মিনার আছে। ইহা নির্ম্মাণে দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়, ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত, হয়। শুনিতে পাওয়া যায় যে এই মসজিদে মহম্মদের কতকগুলি শ্মশ্রু, একটী পোযাক, হোসেন ও হাসেন লিখিত কোরাণ ও মহম্মদের পদচিহ্ন, রক্ষিত আছে। সাম্রাট্ সাহাজাহানের অন্য একটী কীর্ত্তি—"দেওয়ান খাস" বা মন্ত্রী সভা। এই প্রসোদে সাম্রাট রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বিদেশীয় রাজা, রাজকুমার ও দূতদিগকে সংবর্দ্ধনা করিতেন। এই সভায় পারস্য ভাষায় লিখিত আছে যে "যদি মর্ত্ত্যে কোন স্বর্গ-তুল্য স্থান থাকে তবে "দেওয়ান খাস'—এই দেওয়ান খাস"। বাস্তবিক দেওয়ান খাস যে স্বর্গ তুল্য সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। এই স্থানে স্বাধীন

* Benior (?) ইহা দেখিয়া গিয়াছিলেন।

সাম্রাট সাহাজাহান, মনের সুখে স্বর্গীয় স্বাধীনতাসুখ ভোগ করি- তেন। যাঁহার নিকট সমগ্র ভারতবর্ষ অবনত মস্তক, যাঁহার সম্মান-সৌরভ জগৎকে আমোদিত করিয়াছিল, যাহার রাজ মুকুটের মূল্য ৪ কোটী মুদ্রা, যহার এক পোষাকের মূল্য ৫ কোটী ও মণি মাণিক্য-খচিত ময়ুর সিংহাসনের মূল্য ৬ কোটী, কোহিনুর যাঁহার শিরোভূষণ যাঁহার উপাধি "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" যিনি এরূপ মনের সুখে স্বর্গীয় ও পার্থিব সুখ ভোগ করিতেন, তিনি যে ইন্দ্র- তুল্য ও তাঁহার রাজ সভা যে স্বর্গ তুল্য ইহা বলাই বাহুল্য।

দিল্লিতে "যন্তর মন্দির" বা যন্ত্রালয় নামক একটী প্রাসাদ আছে; ইহা বিকান্নীর রাজ শোবে জয়সিংহের অক্ষয় কীর্ত্তি। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই স্থানে বসিয়া জ্যোতীষ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। "কুতব ইস্লাম্ মসজিদ্" নামক আর একটি মসজিদ্ এক সময়ে দিল্লির সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ধর্ম্মালয় ছিল; ইহা কুতবুদ্দিন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহাতে ১১ লক্ষ টাকা ব্যায় হয়; কিন্তু এখন ইহা শ্রীভ্রষ্ট অবস্থায় পতিত। "লালকোট" দুর্গ ও "অনঙ্গপাল দিঘী" নামক গড়টী, প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া আছে। সম্রাট্ হুমায়ুনের কবর দিল্লি হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর প্রাসাদ। ইহা নির্ম্মাণে ১৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। এই স্থানে হুমায়ুন, তাহার বেগম হামিদা ভানুর ও দারার কবর আছে। এতদ্ভিন্ন ফেরোক্স সা, সাহান্দার সাহা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আলমগীর এই স্থানে চির নিদ্রায় অভিভূত। দিল্লির এক ফেরোজা- বাদ নামক স্থানে ২০টী প্রাসাদ্ ১০টী মনুমেণ্ট ও ১০টী প্রধান প্রধান কবর দৃষ্ট হয়। সাম্রাট্ সাহাজাহানের যে স্থানে কবর, সে স্থানের নাম "জাহাঁন পান্না"। এখানে ৫২টী ফটক ও ৭টী কেল্লা আছে। লোকে ইহাকে "সাত কেল্লা দেওয়ান দরজা" কহে। এই স্থানে জগতের একজন প্রধান ঐশ্বর্য্যশালী নরপতি, তাহার পার্শ্বে তদীয় কন্যা জাঁহানদারা চির নিদ্রিত ও নিদ্রিতা। জাঁহান্দার কবর শ্বেত মার্ব্বেলের নির্ম্মিত এবং তদুপরি পারস্য ভাষায় লিখিত আছে যে,

"আমার এই কবরের উপর যেন লোকে কেবল মৃত্তিকা ও শ্যামল ঘাস নিক্ষেপ করে, কারণ নম্র লোকদিগের কবরে নিক্ষেপ করিবার এই দুইটীই উপযুক্ত দ্রব্য।"

দিল্লিতে দেখিবার জিনিশ অনেক, শিক্ষাকরিবার উপায়ও অনেক, ইউরোপে ইতালীর রাজধানী প্রাচীন রোম ও এসিয়ার ইতালী ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি, উভয় নগরীই মানবেতিহাসের প্রধান রঙ্গমঞ্চ। যখন রোম নগরী তীবরের তীরে দাড়াইয়া সমগ্র প্রাতীচ্য জগতকে পদানত করিয়া আপন মস্তক উঠান নাই, তাহার বহু পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির দিল্লিতে একচ্ছত্র নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। রোম অপেক্ষা দিল্লি অনেক প্রাচীন। রোমক বীরগণ যেমন স্বদেশ জন্য অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, প্রাচীন হিন্দু বীরগণও তাঁহা-দিগের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিলেন না, বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ভারতের ইতিহাসও রোমের ন্যায় অনেক অলৌকিক ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ।

দিল্লি! তুমি মানব-ভাগ্যের একটী প্রধান পরীক্ষাস্থল; কত শত বংশের কত শত নৃপতি তোমার বক্ষে রাজত্ব করিয়া কাল চক্রের আবর্ত্তনে অনন্ত কাল সাগরে মিশিয়া গিয়াছেন; তুমিও কালবশে কত মূর্ত্তি ধারণ করিরাছ! আজ মামুদ, ঘোরী, কাল কুতব, পরশ্ব বাবর আসিয়া তোমার বক্ষে কত লীলাই করিল! কত কত বিজেতা আসিয়া তোমায় রক্ত বস্ত্র পরিধান করাইল, তুমিও চক্ষু জলে যমুনার স্রোত বেগতর করিলে। অভ্রংলিহ হিমাদ্রির নির্জ্জন গহ্বর নিসৃত নীল সলিলা যমুনা তটবর্ত্তী যে দিল্লীতে ভারতে আর্য্য-কুল-কেশরী প্রাতঃস্মরণীয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিয়া গিয়াছিল, তুমি কি সেই দিল্লি? যে দিল্লিতে হিন্দুরাজ চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ, বীরাঙ্গনা সংযুক্তার সহিত স্বাধীনতা সুখ ভোগ করিয়া স্বাধীনতার নিমিত্ত জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তুমি কি সেই দিল্লি? তুমি আর্য্য-হিন্দু জাতির রাজধানী কিন্তু হিন্দুর সে সাহস, সে একতা সে বীরত্ব কোথায়? এখন তাহা কেবল আভিধানিক শব্দরূপে

পরিণত হইয়াছে। দিল্লি! তুমি কেবল হিন্দুর রাজধানী নও মুসলমান সাম্রাট্‌গণেরও তুমি; তোমার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহারা তোমাকেই রাজধানী করিয়া ছিলেন। দিল্লি! তুমি চিরদিনই রাজভোগে প্রতিপালিত কিন্তু আজ কেন শীত-সঙ্কুচিত্ বৃদ্ধের ন্যায় ভারতের মানচিত্রের একপার্শ্বে সঙ্কুচিত অবস্থায় রহিয়াছে? অহো! পরিবর্ত্তনশীল কালের মহিমায় আজ তোমার এই হীনাবস্থা! বোধ হয় কিছু শতাব্দী পরে তোমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইবে! কিন্তু অতীত-সাক্ষী ইতিহাস, চিরদিন তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিবে। যত দিন জগতে ইতিহাসের সম্মান থাকিবে, যত দিন মানব আগ্রহ সহকারে ইতিহাস পাঠ করিবে, ততদিন, দিল্লির অস্তিত্ব নশ্বর জগৎ হইতে লুপ্ত হইলেও স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস পৃষ্ঠে লিখিত থাকিবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা সংবাদ পত্র।

যে দেশ যত সভ্য এবং উন্নত সে দেশে সংবাদ পত্রের সংখ্যা এবং আদর তত অধিক। বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালা ভাষায় আজ কাল সংবাদ পত্রের সংখ্যা বড় কম নয়। আদর কিন্তু তত অধিক বলিয়া বোধ হয় না। ইহার কারণ বাঙ্গালা দেশে এখনও তত সভ্য বা উন্নত হইতে পারে নাই।

সংবাদপত্র লোক শিক্ষা বিস্তারের এক প্রধান উপায় এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির পরিচয় স্থান। বাঙ্গালীরা জাতীয় জীবন লাভ কতদূর হইয়াছে বাঙ্গালা সংবাদ পত্র গুলির অবস্থা দেখিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়।

কিছুকাল পূর্ব্বে এ দেশে বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা অতি কম ছিল। আজ কাল সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অবস্থা এখনও শোচনীয়। কত নূতন পত্র প্রকাশিত হইতেছে, দু দশ দিন

মধ্যে আবার তাহাদের কোথায় অন্তর্দ্ধান। ভাব গতিক দেখিয়া বোধ হয় দেশের লোকের সাহিত্যের প্রতি ততটা অনুরাগ নাই ; সংবাদ ও সাময়িক পত্রের প্রয়োজনীয়তা এখনও অধিকাংশ বাঙ্গালী বুঝে নাই। শিক্ষা এবং সভ্যতাভিমানী বাঙ্গালীর ইহা বড়ই নিন্দার কথা। যে দেশে উপযুক্ত সংবাদ ও সাময়িক পত্র নাই সে দেশের লোক অন্ধ এবং অজ্ঞান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশের ও সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রকৃত অভাব অভিযোগ, পত্র-পত্রিকার দ্বারা আমরা যত শীঘ্র এবং যত অধিক পরিমাণে জানিতে পারি এত আর কোন কিছুতেই জানিবার উপায় নাই। বাঙ্গালীর সাহিত্যে এবং সংবাদ ও সাময়িক পত্রে অনাস্থা ও অনাদর দেখিয়া বেশ বিশ্বাস হয়—বাঙ্গালী পরস্পরের অভাব অভিযোগ জানিবার জন্য বড় উৎসুক নয়—সহৃদয়তা ও সহানুভূতি প্রকাশের ইচ্ছা বড় কম। যাহারা জাতীয়-জীবন লাভের জন্য এত ব্যস্ত তাহাদের পক্ষে এতটা দোষারোপ বড়ই নিন্দার কথা !

আমরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াও যে সকল জাতীর অনুকরণ করিতে এত ব্যস্ত, সেই সকল জাতীর সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের প্রতি অনুরাগ শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। হাটে, মাঠে, পথে সর্ব্বত্রই এবং সকল অবস্থার লোকই কর্ম্ম করিতে করিতে যে দু দণ্ড সময় পায় একখানা না একখানা সংবাদ বা সাময়িক পত্র লইয়া দেশের আলোচনায় নিযুক্ত—আর আমরা দু দণ্ড সময় পাইলেই বৃথা কার্য্যে পর-নিন্দায় সময় টুকু কাটাইয়া অপার আনন্দ বোধ করি। ইহার মূল—কতকটা ঘোর স্বার্থ-পরতা। কেবল আমরাই স্বার্থপর—আর আর সভ্য দেশের লোক স্বার্থপর নয় এ কথা আমি বলিতে চাহি না। ব্যক্তি মাত্রেই স্বার্থপর। তবে সভ্য দেশের লোক আপনার স্বার্থের সহিত দেশের সমুদয় লোকের স্বার্থ জড়িত ইহাই ভাবিয়া থাকে আর আমরা ভাবি আমি এবং আমার পুত্র কন্যার ভাল মন্দই আমার বিবেচ্য, অপরের ভাল মন্দতে আমার বড় কিছু আসিয়া যায় না। সভ্য জাতীর চরিত্রে এ সঙ্কীর্ণতা বড় নাই। কোথাও কাহার কোন স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িতেছে—ইহা জানিতে পারিলেই দেশের সকল লোকই

আপনাপন স্বার্থের বিঘ্নকারক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে এবং তাহার প্রতিবিধান করিতে যত্নবান হয়। যত দিন না সফল কাম হয় তত দিন তাহারা কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। আমরা এতটা ভাবিতে পারি না। "যে মরে সে মরুক আমার কি" এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে আমরা বিলক্ষণ পটু। তাই সংবাদ বা সাময়িক পত্রের উপদেশ গুলা অনেক সময়ে আমাদের বিরক্তিকর হয়। যে দু একটা হুজুকের কথা থাকে তাহা লইয়া বেশ দু দণ্ড হাসি ঠাট্টা চলিয়া যায়। যে সংবাদ পত্র কোন ব্যক্তি বা সমাজকে লক্ষ্য করিয়া দু এক হাত অকথা কুকথা বলিতে পারিল সেই পত্র ও তাহার সম্পাদক উভয়েই দু চারিটা বাহবা পাইল।

দুর্ভাগ্য বশতঃ এ দেশে এইরূপ হুজুক প্রিয় পাঠক পাঠিকার সংখ্যাই অধিক। কিন্তু কেবল হুজুকের জন্য সংবাদ পত্র নয়। কেবল রহস্য-বিদ্রূপ-উপন্যাস দ্বারা সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করা সংবাদ বা সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্য নয়। ধীর গম্ভীর ও নিরপেক্ষভাবে লোকের ও সমাজের দোষ গুণ প্রদর্শন এবং দেশের প্রকৃত অবস্থা লোককে জানাইয়া জানাইয়া তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান করাই সাময়িক পত্র পত্রিকার কর্ত্তব্য। সম্পাদকের এ দায়িত্বের জ্ঞান থাকা চাই। "শুধু সম্পাদকের জীবন বড়ই কঠিন জীবন" বলিয়া এক প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে চলিবে না। আজ কাল অনেকগুলি সংবাদ ও সাময়িক পত্র দেখিতে পাই বটে, কিন্তু দু'চারিখানি ব্যতীত প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের সংবাদ বা সাময়িক পত্র কই? স্বাধীন ভাবে গভীর ভাবপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা সমালোচনা কয়খানি সংবাদ বা সাময়িক হইয়া থাকে? দেশ কাল এবং সাধারণ লোক সংখ্যার রুচি বুঝিয়াই অনেক সম্পাদক গা ঢালিয়া দিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর সংবাদ পত্র দ্বারা দেশের অবনতি ভিন্ন কখন উন্নতির আশা বিড়ম্বনা। কিন্তু তাহারাই বা কি করিবেন। দেশ মধ্যে পশার প্রতিপত্তি চাই, উদরান্নের সংস্থান করা চাই ত! কিন্তু সত্য সত্যই কি দেশের অবস্থা এত শোচনীয়? আমরা কি এতই অসার হইয়া পড়িয়াছি?

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং ঘোর স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া কখন কখন কেহ কেহ কোন গতিকে একখানি সংবাদ

পত্র প্রকাশিত করেন। ক্রোধ বা বিদ্বেষের উপশম হইল সংবাদ পত্রও লোপ পাইল। কথাটা কতদূর সত্য বলিতে পারি না। কিন্তু অনেক সংবাদ পত্রের লেখার ভাব ভঙ্গী এবং সম্পাদকগণের ব্যক্তি বিশেষের উপর কৃপা কটাক্ষ দেখিয়া কথাটা একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। এই শ্রেণীর সংবাদ পত্র দেশের কণ্টক এবং সম্পাদকগণ দেশের কলঙ্ক স্বরূপ। দু চারিটী বন্ধু মিলিয়া হুজুগে মাতিয়া অতি কষ্টে একখানি সংবাদ পত্র প্রচার করিলেন। আত্মীয় কুটুম্ব এবং বন্ধুগণের প্রবন্ধাদি-রই তাহাতে স্থান হইবে অপরের লেখা গ্রাহ্য নয়। তবে কাহাকেও যদি কেহ ইতর ভাষায় গালি দেন, অগ্রে স্থান হইবে—কিন্তু তাঁহার প্রতিবাদ মুদ্রিত হইবে না। বলিতে পারি না কিন্তু আমাদের বোধ হয় সম্পাদক পদাভিষিক্ত হইলে মতি গতির যেন কেমন একটু বেশ বিকৃতি হইয়া থাকে। গ্রন্থাদি সমালোচনার ত কথাই নাই, কোন লব্ধ প্রতি-ষ্ঠের গ্রন্থই উৎকৃষ্ট। সম্পাদক মহাশয়ের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের ছাই ভস্ম লেখা এক প্রকার অতুলনীয়। এতদ্ভিন্ন আর কাহারও পুস্তক প্রকাশ যোগ্য নয়। শুনিতে পাই এখন অনেক সম্পাদক আছেন যাহারা সমা-লোচনা কিরূপ ভাবে করিতে হয় তাহা একেবারেই অবগত নন। তবে দায়ে পড়িয়া অপরকে বেগার ধরিয়া গরীবের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। ইহারা হইলেন সম্পাদক, আর ইহাদের সম্পাদিত পত্রিকাই সংবাদ পত্র। সুতরাং তাহার স্থায়িত্বও কয় দিন? সম্পাদক হইলেন ঘোর আত্মাভিমানী অর্থলোলুপ পরছিদ্রান্বেষী স্বার্থপর এবং তোষামোদ-প্রিয় সুতরাং তাহার কর্ত্তৃক সম্পাদিত পত্রিকার আদর সেইরূপ লোকের কাছেই হইয়া থাকে। প্রকৃত সংবাদ পত্র সমগ্র দেশ ও জাতীর গৌরব। এই জ্ঞান যাহার থাকে তিনিই সম্পাদকপদের উপযুক্ত—অন্যথা বিড়ম্বনা। দেশে এক খানিও সংবাদ পত্র না থাকে সেও ভাল, তথাপি মন্দ দশ খানিতেও অনুমাত্র উপকার নাই। সেরূপ সংবাদ পত্রের আদর না হওয়াই উচিত।

কিন্তু ভাল সংবাদ পত্র পাইতে হইলেই মূল্য অধিক দেওয়া চাই। "সস্তার নানা অবস্থা"; একথাটা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিবার

নয়। তবে বাঙ্গলা দেশ দরিদ্র, সুতরাং সুলভ সংবাদ পত্র না হইলে চলে না। বঙ্গবাসীর আবির্ভাব কাল হইতে দেশে সুলভ সংবাদ পত্রের সংখ্যা বড় কম নয়। তথাপি সে গুলির তেমন আদর নাই। সে বিষয়ে সম্পাদক এবং গ্রাহক অনুগ্রাহক সকলেরই কিছু কিছু দোষ আছে। সস্তার সংবাদ পত্র অনেক সময়ে "গণেশের মুণ্ডু শিবের মাথায় এবং শিবের মুণ্ডু গণেশের মাথায়'। একরূপে প্রায় চলিত হইয়া থাকে,—বিজ্ঞাপনের ছটায়। তেমন চিন্তাপূর্ণ সার প্রবন্ধ সমূহের স্থান হয় না। অনেক সংবাদ পত্রকে ত বিজ্ঞাপনের তালিকা বলিয়াই বিবেচনা হয়। সুতরাং দেশের অভাব 'অভিযোগ পত্রাদি' আসিলেই 'স্থান নাই' 'স্থান নাই' রব পড়িয়া যায়। ইহাতে সংবাদ পত্রের প্রতি লোকের আস্থা থাকে না। কিছু কাল পূর্ব্বে দেশে যে কয় খানি সংবাদ পত্র প্রচলিত ছিল, দেশ এবং সমাজ মধ্যে তাহাদের বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল! লোকে যত্ন করিরা তাহা পাঠ করিত। তখনকার একখান সংবাদ পত্রের দ্বারায় দেশের যে উপকার সাধিত হইয়াছে—এখন দশ খানি সংবাদ পত্রের দ্বারা তাহা হয় কিনা সন্দেহ। যে দুএক খানি উচ্চ দরের সংবাদ পত্র আছে তাহাদের দ্বারাই মধ্যে মধ্যে যাহা কিছু কার্য্য হইয়া থাকে। সুলভ মূল্যের সংবাদ পত্র গুলিতে ত সময়ে সময়ে খেউড় ও তরজার লড়াই লাগিয়া যায়। এই জন্য প্রতিপত্তিও তেমনি দাঁড়ায়। যিনি দেশের জন্য—সমাজের জন্য সাধারণ্যে উপনীত তাহার প্রভাব অতি মন্দ। বলিতে দুঃখ হয় অধিকাংশ সম্পাদক গণের রীতি নীতি এবং শিক্ষার সংকীর্ণতাই ইহার মূলীভূত কারণ। সম্পাদকের জ্ঞান কেবল ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকিলে চলিবেনা। তাহার হৃদয় উদার-সরল এবং ব্যবহার অকপট হওয়া চাই, নিরভিমান এবং নিরপক্ষ হওয়া চাই; সকল দিকে তাহাকে সমভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে; দৃঢ়সংকল্প হইতে হইবে। একদেশদর্শিতা দোষ পরিহার করিতে হইবে। নিজের স্বার্থে কোন রূপ একটু ব্যাঘাত পড়িলে গুরু লঘু না ভাবিয়া হিতাহিত জ্ঞান হারা-

ইয়া একেবারে ইতর জনের ন্যায় ব্যক্তি বিশেষের বা সমাজ বিশেষের প্রতি তীব্র গালি বর্ষণ করিলে চলিবে না। কিন্তু আমাদের দেশের কয়জন সম্পাদকের এ ধারণা টুকু আছে? সকলেই স্ব স্ব প্রধান। একত্রে এক প্রাণ হইয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছা তাহাদের নাই। দেশের জন্য কোন একটা কার্য্যে দৃঢ়ব্রত হওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন বলিয়া বোধ হয়।

তাহার পর কথা বাঙ্গালী পাঠক এবং গ্রাহক বর্গের। বাঙ্গালী মুখ সর্ব্বস্ব। কথায় এবং কার্য্যে তাহাদের অতি অল্পই সৌসাদৃশ্য। এ বাহাদুরিটা আমরা কখন ছাড়িতে পারিব না। কথায় কথায় আমরা আমাদের সাহিত্যানুরাগের ভাণ করিয়া থাকি। কিন্তু কার্য্য কালে অগ্রেই পশ্চাৎ পদ। সাহিত্যের প্রতি আমাদের আস্থা অতি অল্প। বাঙ্গালী বাবু বৃথা আমোদ প্রমোদে অযথা মুক্ত হস্ত কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি কল্পে তাহার চেষ্টা বা সহানুভূতি, অতি অল্প। অথচ ভারতের সাহিত্য, দর্শনই ভারতের এক মাত্র গৌরব। আর সেই দেশে সাহিত্যের আদর নাই সংবাদ পত্রের আদর নাই! তবে আর সংবাদ পত্রে চলে কিসে? বাঙ্গলার যে সাহিত্যের সেবক, সংবাদ পত্রের সম্পাদক, লক্ষ্মী-দেবীর কৃপা তাহার প্রতি বড় একটা নাই—অধিকন্তু আপামর সাধারণের কাছে প্রায় পাগল এবং অকর্ম্মণ্য; বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সভ্য জগতে কোন রকমে কেহ এক খানি পুস্তক প্রণয়ণ করিতে পারিলে বা সংবাদ পত্র চালাইতে আরম্ভ করিলে তাহার আর ভাবনা নাই। বলিতে পারি না আর কতদিনে আমাদের এ দুর্দ্দৈব দূর হইবে।

আর এককথা; গ্রাহক অনুগ্রাহক বর্গের অযত্ন হইলে সংবাদ পত্র চলিতে পারেনা। সংবাদ পত্র না থাকিলে দেশের দুরবস্থা দূর হয় না, প্রকৃত উন্নতি হয় না। আমরা যাহাদের অনুকরণ করি তাহাদের সাহিত্যের অনুরাগ অদ্ভুত বলিয়া বোধহয়। একপরিবারের মধ্যে দশ জন লোক থাকিলে সেই দশ জনের প্রত্যেকের এক এক খানি পুস্তক থাকা চাই। সংবাদ পত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু

বাঙ্গলা দেশে কাহারও এক খানি পুস্তক থাকিলে বা কাহারও বাড়ীতে একখানি সংবাদ পত্র আসিলে সে গ্রামের লোকের আর না কিনিলেও চলিয়া যায়। কি শোচনীয় পার্থ্যক্য! আর দেখ পাঠ্য-সমিতির কথা বলিতেছি। সভ্য দেশে গৃহে গৃহে পাঠ্য-সমিতি। সেই গুলিতে কত পুস্তক সংবাদ পত্র চলিয়া যায় কিন্তু আমাদের দেশে পাঠ্য-সমিতি অনেক গুলি আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঠাগার স্থাপিত করিয়াই স্থাপন কর্ত্তারা পুস্তক এবং সংবাদ পত্র ভিক্ষা করিতে বহির্গত হন অথচ ইহাদেরই ক্রয় করিবার কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সাহিত্য বা সংবাদ পত্রের ইহাতে কত উৎসাহ বর্দ্ধন হইবে বল? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া উভয় পক্ষই একটু বনিয়াদি চাল চলন পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে প্রকৃত কার্য্য হয় তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য নয় কি?

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

মতামত।

মিনার্ভায় "সভ্যতার পাণ্ডা"—"সভ্যাতার পাণ্ডা" বিভিন্ন নব্য, ভব্য, সভ্য মহোদয়গণের বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত Photoর সমষ্টি। এই ফটোয় ষণ্ড-মূর্ত্তি Refomer (সংস্কারক), গর্দ্দভ (Teacher) শিক্ষক, হাড়গিল্লা (Commissioner), পুত্র চিত্রে—সজীব নব্য বঙ্গের আদর্শ বিলাত গমনোদ্যত পিতামাতার জীবান্ত মুখাগ্নি কারক পাশ্চাত্য সভ্যতালোকে সম্যক্ উদ্ভাবিত যুবক প্রকাশিত। ইহার সকল গুলিই সামাজিক—সুতরাং দেখিয়া শিখিবার জিনিশ। আমাদের বিশ্বাস এ Photo দর্শক মাত্রেরই চক্ষে পড়িয়া প্রত্যেককে কিছু না কিছু শিক্ষা দিবে। ইহা ব্যতীত ষড়ঋতুর দৃশ্য ও তদ্বিষয়ক সংগীতাবলী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী।

মরকতে "আবুহোসেন"—পূর্ব্বে "মিনার্ভায়" যে আবু দর্শকমাত্রেরই নিকট হইতে প্রশংসা পাইয়া উক্ত রাজমঞ্চের নাম জাহির করিয়াছিলেন, এখন সেই নটচূড়ামণি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মরকতে আবুবেশে সেই মনোহর অভিনয় করিতেছেন। আবুর অংশ বাদ দিয়া উপমা করিতে গেলে, মরকতের মোসেনা অপেক্ষা-

কৃত উচ্চআসন পায়। এতদ্ভিন্ন সমুদয় প্রায় একই প্রকার। আমরা "ময়কতের" আবুহোসেন দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণপ্রীতি পাইয়াছি।

সাহিত্য-সমালোচনা।

সুহৃদ্—অগ্রহায়ণ—পৌষ। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" শেষ হইয়াছে। প্রবন্ধ, লেখকের বহু পাঠের পরিচায়ক হইলেও সর্ব্বাঙ্গীন হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। স্থানে স্থানে ভাষার দোষে প্রবন্ধ সম্যক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। মোটের উপর বলিতে গেলে মন্দ হয় নাই। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় লিখিত "শেষ উপহার" একটী ছোট গল্প; বেশ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তেমন উল্লেখযজ্ঞ প্রবন্ধ আর নাই।

সখা ও সাথী—পৌষ। এ সংখ্যায় বেভারেণ্ড লালবিহারী দের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধে সখা ও সাথীর সাথী বালকবালিকাদিগের উপকার দেখিবে। ভাষা আর একটু ভাল হইলে বেশ হইত। "পাপিয়া ও জোনাকি" কবিতাটী ইংরাজ কবি Cowper এর Nightingale and the Gloworm এর অনুকরণে লিখিত হইয়াছে—মন্দ হয় নাই। এসংখ্যার "সখাও সাথী"তে ৭টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ৩ টী ব্যতীত সবগুলিই পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর, আমাদের মতে এটা কিন্তু ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

বাসনা—পৌষ। অগ্রহায়ণের যে পদ্যটী কভায়ের কাগজে চলিয়া গিয়াছিল সেই পদ্যটী কভারের অংশ হইতে আবার মুদ্রিত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। এসংখ্যায় ৩।৪টি "ক্রমশঃ" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। "দোঁহাবলীর সংস্কৃত ও ভাষা" মন্দ হইতেছে না। "সংসার ও সাধনা" একটি ক্রমশঃ প্রকাশিত ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ—এরূপ প্রবন্ধের আদর সর্ব্ব স্থানে হওয়াই উচিত। আর যত কাঁদাইবি-নিঠুর সংসার" একটি কবিতা; নামটী শুনিয়া যতটা আশা করিয়া ছিলাম কাযে কিন্তু নিরাশ হইতে হইয়াছে"। কবিতাটী সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

সৎসঙ্গ—পৌষ। "সভ্যতা কাহাকে বলে?" বি-এ উপাধি ধারী শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায়-লিখিত প্রবন্ধ। এরূপ প্রবন্ধের আমরা আদর করিতে প্রস্তুত থাকিলেও বিবিধ পত্র পত্রিকার করুণায় ইহা 'ছ্যা ছ্যায়' পরিণত হইয়াছে 'কুকুট—শ্রী—এক-এ ফেল কর্ত্তৃক লিখিত একটী হাস্যোদ্দীপক সুন্দর প্রবন্ধ। "হিন্দু ধর্ম্ম" যতটুকু বাহির হইয়াছে তত টুকু মন্দ হয় নাই।

দাসী—ফেব্রুয়ারি। গত জানুয়ারি হইতে দাসীর আকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের পরিবর্ত্তন হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্বে দাসীতে বেশীর ভাগই দাসাশ্রম সংক্রান্ত বিষয় প্রকাশিত হইত। এখন হইতে দাসী—দাসী না থাকিয়া সাহিত্যে সেবিকা হইয়াছেন।—এটা মন্দ নহে—কিন্তু সাহিত্য সাহিত্য করিয়া দাসী যেন দাসাশ্রম ভুলিয়া না জান—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। দাসী—দাসাশ্রমকে যেরূপ সাহায্য করিতে ছিল—আকার প্রকারের সুগঠনার্থ ব্যয়বাহুল্য জন্য তাহার হ্রাস হইলে আমরা বাস্তবিকই বুঝিব—"দাসী এখন ব্যবসায়ের সামগ্রী।"

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে ॥"

২য় খণ্ড। } মাঘ, ১৩০১ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

যামিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের কথা।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবল বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত। সিপাহীগণ ধর্ম্মরক্ষা-বলে বলীয়ান হইয়াই হউক, কিম্বা স্বদেশ রক্ষা ব্রতে ব্রতী হইয়াই হউক, ইংরাজদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। ইংরাজসৈন্যগণ যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতে লাগিল ; ইংরাজ অধিবাসীগণ প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়নে প্রয়াস পাইলেও অধিকাংশই উন্মত্ত দেশীয় সৈন্যের দ্বারা হত হইল। দেশীয় অধিবাসিগণও ভীত হইয়া যে স্থলে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, সে স্থান পরিত্যাগ, করিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে হরিচরণ বসু নামক জনৈক বাঙ্গালী, ইংরাজসৈন্য-গণের চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া, কাণপুরে বাস করিতে ছিলেন। প্রথমে ইনি কলিকাতা সহরেই চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু তেমন সুবিধা না হওয়াতে স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করতঃ তিনি সৈন্যদলে চিকিৎসক

নিযুক্ত হইয়া রাওলপিণ্ডিতে গমন করেন। কার্য্যে দক্ষতাবশতঃই হউক, কিম্বা অন্য কোনও কারণে হউক, তিনি রাওলপিণ্ডি হইতে কাণপুরে বদ্‌লি হইলেন—এখানে আসিয়া তাঁহার বেতনও বৃদ্ধি হইল।

হরিচরণ বাবুর পরিবারের মধ্যে কেবল তাঁহার স্ত্রী, একটী অষ্টম বর্ষীয় পুত্র ও দশম বৎসরের কন্যা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। কন্যাটির নাম যামিনী। বারিকের লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেলের পত্নী, যামিনীকে বড় ভাল বাসিতেন,—তিনি হরিচরণ বাবুকে অনেকবার বলিয়াছেন যে এ প্রকার সুন্দরী বালিকা বিলাতে অতি অল্পই দেখা যায়। এ প্রশংসাটি অত্যধিক স্নেহবশতঃ প্রদত্ত হইত কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকার অলৌকিক সৌন্দর্য্য যে দেখিত—সেই মোহিত হইত।

কেবল তাহাই নহে; যামিনী গৃহের অনেক কাযে—যেমন রুটি প্রস্তুত ও আনাজ কুটিতে—বেশ পারগতা দেখাইতে পারিত। একদিন নাকি রন্ধন করিতে চাহিয়াছিল, তাহাতে তাহার মাতা তাহাকে "ছেলে মানুষ" বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছিলেন। যামিনী সে দিন রাগ করিয়া ভাত খায় নাই।

বালিকা আপনাকে গৃহকর্ম্মে নিপুণা একজন প্রবীণা বলিয়া মনে করিত; পুতুল লইয়া খেলা করাকে নিতান্ত বাল্য-চপলতা বলিয়া তাহার ধারণা জন্মিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু যামিনীর এই চির আনন্দ আর রহিল না!

যে বৎসর হরিচরণ বাবু কাণপুরে আসেন, তখন যামিনী আটবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া নয় বৎসরে পড়িয়াছে; সুতরাং তাহার বিবাহের জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যামিনীর বিবাহে একটা বিশেষ প্রতিবন্ধক দাঁড়াইল। আজ কাল যেমন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাঙ্গালীর প্রাদুর্ভাব, তখন এত ছিল না। সুতরাং পাত্র পাওয়া বড় দুর্ঘট হইয়া উঠিল। একবার ভাবিলেন—দেশে গিয়া বিবাহ দিয়া আসিবেন। ছুটীর

জন্য সাহেবের নিকট আবেদন করিলে, সাহেব নানা ওজর আপত্তি করিয়া ছুটী দিতে অস্বীকৃত হইলেন। আর একটি কথা, হরিচরণ বাবুর ইচ্ছা ছিল না যে, স্বদেশে গিয়া মেয়েটির বিবাহ দেন, কারণ কর্ম্মস্থান হইতে কন্যাকে বহুদূরে রাখিবার তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না।

বহু অনুসন্ধানের পর এলাহাবাদে একটি পাত্র পাওয়া গেল; ছেলেটি দেখিতে শুনিতে ভাল, স্থানীয় একটি ইস্কুলে মাষ্টারি করে, বেতন টাকা কুড়ি। খাবার পরিধার সংস্থান মন্দ নহে। দুঃখের বিষয় পিতা মৃত হইয়াছেন, একমাত্র মাতাই এক্ষণে পুত্রের অবিভাবিকা।

কিন্তু ইহাতে হরিচরণ বাবুর কোনও আপত্তি ছিল না, বিশেষতঃ কন্যাদায় হইতে যত শীঘ্র পরিত্রাণ পাওয়া যায়—ততই মঙ্গল।

যথা সময় যামিনীর বিবাহ হইয়া গেল। শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় যামিনী অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিল। কারণ বিবাহ কি? তাহা সে জানিত না—বিবাহ করিলে পিতা মাতাকে ছাড়িয়া যাইতে হয়, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এতটা কল্পনা করিয়া লইতে পারে নাই।

আট দিন পরে যামিনী আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পাড়ার মেয়েরা শ্বশুরালয়ে যামিনীকে কেমন আদর যত্ন করিয়াছিল, তাহাই আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—কিন্তু সে কাহারও কথায় বড় একটা উত্তর দিল না। অনেকে বলাবলি করিল—যামিনীর শাশুড়ীর অনেক টাকা কড়ি আছে সেই জন্য যামিনীর এত গর্ব্ব হইয়াছে!

মাকে আড়ালে পাইয়া যামিনী কাঁদিয়া বলিল,—"আমি আর সেখানে যাব না।"

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আচ্ছা না যাবি—যাস্ না" মনে মনে বুঝিলেন যে একটু জ্ঞান হইলে এ সব আবদার আর থাকিবে না।

বিবাহের চারি পাঁচমাস পরে যামিনীর শাশুড়ী বধূ আনিবার নিমিত্ত তাগাদা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু হরিচরণ বাবু নানা আপত্তি করিয়া কন্যাকে পাঠাইতে অস্বীকৃত হইলেন। বিশেষতঃ এলাহাবাদে যাইতে হইবে শুনিয়া, যামিনী কান্না আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং যামিনীকে পাঠান হইল না।

কিন্তু লোকমুখে শুনা গিয়াছিল যে, তাহার শশ্রূঠাকুরাণী নাকি ইহাতে বিশেষ অপমানিত হইয়াছেন মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৫৭ সালের জুন মাসের প্রারম্ভ। সমুদয় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কখন বিদ্রোহীগণ নগর লুণ্ঠনে আগমন করে— এই ভয়ে সকলই সশঙ্কিত। তাহারা আজ আসিবে, কাল আসিবে এই প্রকার নানা জনরব শুনা যাইতে লাগিল। দোকানী পসারী দোকান পসার বন্ধ করিয়া পলায়ন করিল, কচিৎ কদাচিৎ দুএকজন লোক রাজপথে গমন করে—অধিকাংশ লোকেই হয় সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে, না হয় আপনাপন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরে বস বাস করিতেছে।

কাণপুরের সুপ্রশস্ত বারিকের মধ্যে বিশ্বস্ত সৈন্যগণ নিরন্তর কুচ-কাওয়াজে ব্যস্ত। ইংরাজসৈন্যাধ্যক্ষ—কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিবেন, তাহারই জন্য ভাবিতেছেন। কাণপুরবাসিগণের ভয়ের আর একটী কারণ ছিল এই যে, এখান হইতে নানাসাহেবের বাসস্থান বিঠুরগ্রাম বহুদূরবর্ত্তী না হওয়ায়, সিপাহীগণের অগ্রেই এইখানে আগমন করা কিছু অসম্ভব নহে।

যখন সহরের রাস্তায় রাস্তায় বিদ্রোহসূচক বিজ্ঞাপন দেখা গেল, তখন ভয় আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। যাহারা এ পর্য্যন্ত নিতান্ত সাহসি-কতার সহিত বাস করিতেছিল, তাহাদিগের অধিকাংশই পলায়ন করিল।

হরিচরণ বাবুর বাড়ী ঠিক বারিকের পার্শ্বে, সুতরাং তাঁহার তাদৃশ ভয়ের কারণ ছিল না; কিন্তু তিনি স্ত্রীপুত্র লইয়া এপ্রকার অবস্থায় নিশ্চিন্তচিত্তে বাস করিতে পারিলেন না।

ঠিক এই সময়ে যামিনীর শশ্রূঠাকুরাণী যামিনীকে পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত উপর্য্যুপরি দুইখানি পত্র লিখিলেন। একে চারিদিকে বিদ্রোহ, তাহাতে আবার এলাহাবাদে গমন করিবারও সুবিধা নাই, এই দুইটি

কারণ দেখাইয়া হরিচরণ বাবু বিশেষ বিনয় সহকারে লিখিয়া পাঠাইলেন 'যে যামিনীকে এক্ষণেও পাঠাইতে পারা গেল না।'

শশ্রুঠাকুরাণী এই প্রকারে অপমানিত হইয়া অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। পাড়াফাটাইয়া বলিলেন,—"তার কিসের এত জোর রে? মেয়ে দিয়েছে এই তার ভাগ্যি—তার উপর আবার এমন অপমান করা? বেঁচে থাক্ আমার কৈলাস—যদি আমি 'পিত্যমিত্তিরের' মেয়ে হই তবে এর দাদ্ তুল্‌বো।"

বলা বাহুল্য কৈলাসচন্দ্রই যামিনীর স্বামী, এবং তাহার দাদা মহাশয়ের প্রকৃত নাম নৃত্যকৃষ্ণ মিত্র; গুরুজনের নাম করিতে নাই বলিয়া কৈলাশের মাতা পিতাকে "পিত্যমিত্তির" বলিয়াই উল্লেখ করিতেন।

এবার হরিচরণ বাবুর নিকট কড়া তলব গেল; পত্রে লিখিত হইল "যদি যামিনীকে শীঘ্র না পাঠান হয় তাহা হইলে পুনরায় কৈলাসের বিবাহ দেওয়া যাইবে।"

হরিচরণ বাবু পত্র পাইয়া বিশেষ ভাবিত হইলেন—একদিকে প্রাণের আশঙ্কা, অন্যদিকে যামিনীর শশ্রুর এই প্রকার ভীতি প্রদর্শনে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীর সহিত অনেক পরামর্শ করিলেন; অবশেষে স্থির হইল যে এই সময়ে কন্যাকে কোনও মতে পাঠাইতে পারা যায় না। কারণ—প্রথমতঃ, তাহাকে কে বা রাখিতে যায়; তিনি নিজে স্ত্রী ও পুত্রকে রাখিয়া এলাহাবাদে যাইতে পারেন না; দ্বিতীয়তঃ, চারিদিকে বিদ্রোহীগণ অত্যাচার করিবার প্রয়াস পাইতেছে; তৃতীয়তঃ, এলাহাবাদেত শীঘ্র বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে কে তাঁহার কন্যাকে রক্ষা করিবে? তাহার পর তাঁহারা ভাবিলেন যে বৃথা ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে—এক বধূ জীবিত থাকিতে আবার কে পুত্রের বিবাহ দিতে চায়? সর্ব্বশেষে ভাবিলেন যে,—সুবিধা হইলেই যামিনীকে শশুরালয়ে রাখিয়া আসিবেন, এবং বৃদ্ধার পায় ধরিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিবেন, তাহা হইলেই সমস্ত মিটিয়া যাইবে।

অবিলম্বে পলায়ন করাই স্থির হইল। দূরদর্শী সৈন্যাধ্যক্ষ পরিণাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং হরিচরণ বাবু আবেদন করিবামাত্রই

তিনি তাঁহাকে যাইবার নিমিত্ত অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। বলিলেন--"বাবু! তুমি যে প্রকার পরিশ্রমের সহিত কাজ করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে শীঘ্র ছাড়িতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু আমি তোমার প্রাণনাশের কারণ হইব না--সুবিধা হইলে ইহার পর দেখা করিও।"

হরিচরণ বাবু স্ত্রী পুত্র ও কন্যা এবং দুইজন সিপাহী লইয়া ২রা জুন তারিখে সহর পরিত্যাগ করিলেন!

৫ই জুন তারিখে বিদ্রোহীগণ নগর বেষ্টন করিয়াছিল!

বৃন্দাবন অঞ্চলে বিদ্রোহের আশঙ্কা অল্প বিবেচনা করিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিলেন।

পথে শুনিলেন কৈলাশ আবার বিবাহ করিয়াছে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরিচরণ বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন! ইহাও কি কখন সম্ভব? সংবাদ আনাইয়া জানিলেন যে জনরবটী অমূলক নহে, বুঝিলেন—যামিনীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যামিনী কিছু বুঝিতে পারে নাই--তাঁহারা তাহাকে বুঝানও আবশ্যক বোধ করেন নাই। এখন কি করা যুক্তিযুক্ত তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

অবশেষে ভাবিলেন, যে যাহা হইবার হইয়াছে যামিনীর কপালে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে—এখন যদি তাহার শাশুড়ী তাহাকে গৃহে লয় তাহা হইলেও মঙ্গল। এলাহাবাদে অনেকগুলি পত্র লিখিলেন, কোনও পত্রেরই উত্তর আসিল না। বিরক্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া হরিচরণ বাবু এলাহাবাদবাসী তাঁহার কোনও বন্ধুর নিকট সমুদয় বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত একখানি পত্র লিখিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি পত্রের উত্তর পাইলেন; তাহাতে লিখিত আছে যে "কৈলাসের মাতা জোর করিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়াছে—এবং কৈলাস বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলে তাহার মাতা গলায় দড়ি দিতে গিয়াছিল। অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্বে একটা কৃষ্ণবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহারা এক্ষণে

এখানে নাই; বিদ্রোহের সময় কোথায় পলাইয়া গিয়াছে বলিতে পারি না।

বিদ্রোহীগণ ১৫ই জুলাই এলাহাবাদে আগমন করে।

পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার কতকটা আনন্দ হইল; জানিলেন যে এ বিবাহে কৈলাশের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং যদি যামিনীকে লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে সে তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলেও করিতে পারে, কিন্তু লইয়া যাইবেনই বা কোথায়? তাহারা কোথায় গিয়াছে কাহাকেও বলিয়া যায় নাই।

হরিচরণ বাবু দিনরাতই ভাবেন—'কেন তখন পাঠাইয়াদিলাম না—তাহা হইলে ত এত বিপদ ঘটিত না'; যামিনীর পরিণাম ভাবিতে ভাবিতে তিনি অনেক সময়ে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িতেন।

তাঁহার স্ত্রীর বাল্যকাল হইতেই হাঁপানি রোগ ছিল—যে কয় বৎসর পশ্চিমাঞ্চলে সুখসচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন, সে কয় বৎসর এ রোগ কতক প্রশমিত হইয়াছিল। যামিনীর জন্য দিনরাত দুর্ভাবনায় আবার তাহা বাড়িয়া বিশেষ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল।

সে সময়ে বৃন্দাবনে ভাল চিকিৎসক ছিল না; সুতরাং হরিচরণ বাবু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; চারিমাস ভুগিয়া যামিনীর মাতা সংসার অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেলেন! শেষ মুহূর্ত্তে যামিনীকে কেবল বলিয়া গেলেন,—"মা! সতী-ধর্ম্ম ভুলিস্ নে।"

যামিনী 'মা, মা' করিয়া আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল—তাহার ছোট ভাইটিও ভগিনীর ক্রন্দনে যোগদান করিল। চিরকাল হাসিয়া খেলিয়া কাটাইয়াছে—সেই জন্য আজ এই শোক তাহাদিগের নিকট বড় ভীষণ বলিয়া বোধ হইল!

হরিচরণ বাবু বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

এই দুর্ঘটনার পর তাঁহার বৃন্দাবনে থাকিবার আর তিলমাত্র ইচ্ছা রহিল না; গম্ভীরভাবে যামিনীকে বলিলেন "মা! চল্ আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাই।"

যামিনী দেখিল—আজ তাহার মস্তকে গুরুভার সংসারের ভার পতিত হইয়াছে; ইহার সহিত তাহার বাল্যকালের সুখস্মৃতি মনে হইল মনে পড়িল সেই গৃহিণীপনার কথা! একদিন মার কাছে যে আবদার করিয়াছিল আজই তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছিল! মার মনে কষ্ট দিয়াছে বলিয়া আপনাকে শতবার ধিক্কার দিতে লাগিল; আর হু হু করিয়া চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

হরিচরণ বাবু পুত্র-কন্যা লইয়া স্বদেশের দিকে যাত্রা করিলেন। বিদ্রোহের ভয়ে যখন কাণপুর হইতে পলায়ন করেন তখনও সেই ভয়ের মধ্যে তাঁহার কতটা আহ্লাদ, কতটা আশা ছিল! কিন্তু আজ কতকাল পরে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইতেছেন, কিন্তু তাহার উপযুক্ত আনন্দ কোথায়?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যখন তাঁহারা ফিরিতেছেন, তখন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ! তখন বিদ্রোহাগ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। এক সময়ে যেমন ভীমনাদী কোলাহল, সমুদয় ভারতকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, এক্ষণে তেমনি শান্তি বিরাজ করিতেছে! কে ভাবিতে পারে যে এই শান্তিক্ষেত্র একদিন রক্তময় রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল?

হরিচরণ বাবুর পৈতৃক নিবাস, হুগলী জেলার অন্তর্গত নিজ পাণ্ডুয়া ওরফে পেঁড়োয়। বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, সেই চিরপরিচিত গৃহ আজ অরণ্যে পরিণত! জানালা কপাট পতনোন্মুখ! ঠাকুরদালানে পারাবতগণ পুরুষানুক্রমে নির্ভয়চিত্তে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে। পৈতৃক ভিটার এ-প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া, হরিচরণ বাবুর চক্ষে জল আসিল! একদিন কত চেষ্টা, কত আহ্লাদ করিয়া তাঁহার পিতামহ এই বাটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—আজ তাঁহার হস্তে তাহার এই দুর্দ্দশা!

পাড়ার দু'একজন প্রতিবেশী আসিয়া তাহাদিগের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিল; দু'একজন বর্ষীয়সী আসিয়া যামিনীকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাদিগের শোকের আর একটি কারণ ছিল, হরিচরণ

বাবুর পিতার জীবিত কালে তিনি প্রতিবাসিগণকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন—তাহারা আজ পর্য্যন্ত তাহা বিস্মৃত হয় নাই।

কিছুদিন অপর বাড়ীতে থাকিয়া, তিনি জীর্ণ ভিটার সংস্কার করিলেন। যে ঘরে যামিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, হরিচরণ বাবু একদিন তাহাকে তাহা দেখাইয়া দিলেন; যামিনী সেই ঘরে গিয়া মার জন্য খুব কাঁদিল।

কিন্তু এদিকে অর্থের বিশেষ অনাটন উপস্থিত হইল। সৈন্যদলে ডাক্তারি করিবার সময় হরিচরণ বাবু যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সমুদয়ই ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। স্বগ্রামে বসিয়া যে চিকিৎসা করিবেন তাহারও সম্ভাবনা নাই। কারণ ইহাতে রোগী যে দুষ্প্রাপ্য হইবে তাহা নহে—কিন্তু কেহই যে তাঁহাকে অর্থ দিবে না—তাহা সুনিশ্চিত।

বহু চেষ্টা করিয়া তিনি কাছাড়ের কোনও চা-বাগানের চিকিৎসকপদ প্রাপ্ত হইলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কোনও বাঙ্গালিই ওসব অঞ্চলে যাইতে সাহস করিত না; কিন্তু হরিচরণ বাবু উপায়ান্তর না দেখিয়া তথায় যাইতে বাধ্য হইলেন—বেশ পরিপুষ্ট বেতনও পাইতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ সেখানকার জল বায়ু কি প্রকার তাহা জানিতেন না; দ্বিতীয়তঃ, সেখানে সকলকে লইয়া গেলে, তাঁহার পুত্র বীরেন্দ্রের পাঠের বিশেষ অসুবিধা হইতে পারে বিবেচনার প্রথমেই পুত্র ও কন্যাকে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না।

যামিনী পিতার সহিত যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি যখন বীরেনের কথা বলিলেন, তখন সে আর কোনও আপত্তি করিল না।

মাতার অভাবে তাহাকে কতটা আত্মসংযম করিতে হইবে, এখন সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সময় ও স্রোত কাহারও অধীন নহে। সংসারের সুখ ও দুঃখের সহিত ইহাদিগের কোনও সম্বন্ধ নাই। কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না

করিয়া, কাহারও আবেদন বা অনুশোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ইহারা অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে!

দেখিতে দেখিতে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, হরিচরণ বাবু সেইখানেই কার্য্য করিতেছেন—ইহার মধ্যে এমন অবসর পান নাই যে যামিনীকে দেখিতে যান।

কিন্তু যামিনীর ও কিরূপ? উহার সেই অতুল্য সৌন্দর্য্য কোথায় গেল? তাহার অপূর্ব্ব লাবণ্য বা কোথায়? বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর বটে কিন্তু শরীরে যৌবনের প্রবাহ কোথায়? বয়ঃক্রমের অনুযায়ী প্রফুল্লতাই বা কোথায়? এই ছয় বৎসরের মধ্যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে? এখন যামিনীকে দেখিলে প্রায় চেনা যায় না!

প্রথমে সে কিছু বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু কালক্রমে সব বুঝিতে পারিল, সব জানিতে পারিল! জানিতে পারিল—তাহার অবস্থা দেখিয়াই মা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, বুঝিতে পারিল—তাহার ন্যায় দুর্ভাগিনী আর কেহ নাই। প্রথমে সে নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া কাঁদিত, কিন্তু একদিন বীরেন্দ্র তাহা দেখিতে পাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছিল। সেই অবধি যামিনী কাহারও সমক্ষে বা নির্জ্জনেও কাঁদিত না; বুঝিত যে সংসারটা এমনি নির্ম্মম, এমনি স্বার্থপর, যে পরকে কাঁদিয়াও হৃদয়ভার লাঘব করিতে দিতে চাহে না। সেই অবধি সে গম্ভীর হইল। দুঃখ-কষ্ট এরূপ ভাবে দমন করিতে অভ্যাস করিয়াছিল যে, কেহ তাহার মুখ দেখিয়া তাহার হৃদয়-ভাব বুঝিতে পারিত না—কিন্তু হৃদয়ে ভীষণ দাবানল জ্বলিত! এই প্রকার অবিশ্রান্ত দুঃখকষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল—তাহা নিস্তব্ধ সমুদ্রের মত গম্ভীর ও প্রশস্ত বটে, কি বড় ভয়ানক!

বীরেন্দ্র কলিকাতায় পাঠ করিত, প্রতি শনিবারে পেঁড়োয় আসিয়া দিদির সহিত দেখা করিয়া যাইত। এই দুদিন বীরেন কেবল কলিকাতার গল্প করিত—তন্মধ্যে তাহাদিগের সাহেব মাষ্টার ও ইস্কুল বাড়ীর কথাই অধিক থাকিত!

একদিন বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "দিদি! মহাভারত তোমার কতটা পড়া হ'ল?"

যামিনী উত্তর করিল,—"এই কর্ণ পর্ব্বটা প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে"।

বীরেন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—"এত শীঘ্র? তাহ'লে তুমি দিন রাত পড় বল?"

যামিনী বলিল, "আর কি কোর্ব্ব ভাই! মহাভারতখানা পোড়লে মনটা কতকটা শান্ত হয়।" কথাটা বলিতে বলিতে যামিনীর চক্ষু প্রান্তে ছু-এক ফোঁটা জল দেখা দিল।

অকারণ দিদির চক্ষে জল দেখিয়া বীরেন্দ্র সে দিন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

সম্মুখেই সুবিস্তৃত পূজার ছুটি। বীরেন্দ্র পিতাকে লিখিল যে এবার কলেজে পূজার লম্বা ছুটি সুতরাং দু'জনে কাছাড়ে বেড়াইতে গেলে মন্দ হয় না, পিতার পূর্ণ সম্মতি পাইয়া উভয়ে যাত্রা করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চা বাগানের পার্শ্বেই হরিচরণ বাবু বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। হরিচরণ বাবুরও সে প্রফুল্লতা নাই। কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে মনটা কতকটা ভাল থাকে সেই জন্য এবং ছেলে মেয়েকে যাহাতে কষ্ট না পাইতে হয় এই জন্য চাকরি করিতেছেন। কিন্তু এক একবার যামিনীর কথা ভাবিলে সংসারের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা হয়; মনে হয় বিবাগী হইয়া চলিয়া যান। এলাহাবাদ ও অন্যান্য স্থানে অনেকবার কৈলাসের অনু-অনুসন্ধানের নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলই হয় নাই।

দোতালার জানালায় বসিয়া যামিনী চাবাগানের চা-চয়ন দেখিতে থাকে। অনেকগুলি পাহাড়িয়া কুলি বালিকার সহিত তাহার বেশ ভাব হইয়াছে; তাহারা প্রায় তাহাদিগের বাড়ীতে বেড়াইতে আসে। আমোদ আহ্লাদ দিন পোনর বেশ কাটিয়া গেল।

একদিন রাত্র প্রায় দশটা বাজিয়াছে, এমন সময় একজন কুলি আসিয়া হরিচরণ বাবুকে ডাকাডাকি করিয়া বলিল যে সাহেব ডাকিতেছেন বড় বিশেষ। প্রয়োজন। হরিচরণ বাবু তাড়াতাড়ি সাহেবের নিকট গমন করিলেন। সাহেব,—"ডক্টর, আমার গার্ডেনের আসিষ্টেন্ট ইনস্পেক্টর মিঃ কোলেসের কালাজ্বর হোছে, টুমি চিকিট্‌সা কর, যডি আরাম কোর্টে পার, বক্‌সিস ডোবো—আমি কোলেস্‌কে বড় পছন্দ করি।" এই বলিয়া পার্শ্বের ঘর দেখাইয়া দিলেন। হরিচরণ বাবু মনে করিলেন বোধ করি কোনও ফিরিঙ্গি সাহেবের অসুখ করিয়াছে এই ভাবিয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অস্পষ্ট প্রদীপালোকে দেখিলেন পরিচিত মুখ! সাত' বৎসর পূর্ব্বে কৈলাসকে যেমন দেখিয়াছিলেন আজও সেই প্রকার দেখিলেন! উন্মত্তের ন্যায় তাহার বিছানার কাছে দৌড়াইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—"বাবা, কৈলাস"।

কৈলাস তাহা শুনিতে পাইল না,—প্রবল জ্বরে সে অজ্ঞান!

কালাজ্বর বড় ভীষণ রোগ, ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইলে পরিত্রাণ পাওয়া দায়। অতি কষ্টে ঔষধ সেবন করাইয়া হরিচরণ বাবু বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন! একেবারে যামিনীকে ডাকিলেন—সে তখন প্রদীপ জ্বালিয়া মহাভারত পাঠ করিতেছিল; সে এই প্রকার অনেক রাত্রি অবধি পাঠ করিত, পিতা তাহাতে নিষেধ করিতেন না, ভাবিতেন যাহাতে তব মনটা ভাল থাকে তাহা করুক।

পিতা ডাকিতে, যামিনী মহাভারত মুড়িয়া বাহিরে আসিয়া বলিল,—"কেন, বাবা?"

পিতা বলিলেন,—"মা! এতদিন পরে বুঝি ভগবান মুখপানে চেয়েছেন।"

যামিনী চমকাইয়া উঠিল।

হরিচরণ বাবু বলিলেন "মা! এত দিন পরে কৈলাসের সন্ধান পেয়েছি"। অস্ফুটস্বরে যামিনীর মুখ হইতে অস্ফুট চিৎকার ধ্বনি বহির্গত হইল,—"বাবা!" সে টলিয়া পড়িতেছিল শীঘ্র দেয়াল ধরিয়া সম্বরণ করিল।

হরিচরণ বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"হাঁ মা! কিন্তু বড় অসুখ কোরেছে—কাল সকাল বেলা, আমাদের বাড়ী নিয়ে আস্‌ব"।

তাহার পর যামিনী সমস্ত রাত্রি নিদ্রা গিয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু তাহার ঘর হইতে অনেকবার "ভগবানের" নাম শুনা গিয়াছিল।

তাহার পরদিন হরিচরণ বাবু কৈলাসকে নিজের বাটিতে লইয়া আসিলেন। দিনকতক সে জ্বরে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। বীরেন্দ্র বিশেষ সেবা করিতে লাগিল;—কারণ আকস্মিক উত্তেজনায় রোগ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া হরিচরণ বাবু যামিনীকে তাহার সম্মুখে বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমে যে প্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ফলে তাহা দাঁড়াইল না। কিছুকালের মধ্যে পরিমিত ঔষধ সেবনে কৈলাসচন্দ্র অনেকটা আরোগ্য লাভ করিল। সে এক দিন হঠাৎ হরিচরণ বাবুকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। কিন্তু 'তাঁহাদিগের এখানে আসিবার সম্ভাবনা নাই' বিবেচনা করিয়া সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিতে সাহসী হইল না—ভাবিল তাঁহারই মত অন্য কেহ হইবেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বীরেন্দ্রের সহিত কৈলাসের বড় ভাব হইয়াছে। কেন তাঁহারা তাহাকে এত যত্ন করেন,—কৈলাস এ প্রশ্ন অনেকবার করিয়াছিলেন, কিন্তু বীরেন্দ্র তাহার কোনও স্পষ্ট জবাব দেয় নাই। কথায় কথায় একদিন রাত্রে বীরেন্দ্র কৈলাসকে তাহার জীবনের ঘটনা বিবৃত করিতে বলিলে সে বলিল,—"আমার প্রথম এক বিবাহ হয়—সেই স্ত্রীর নাম যামিনী। যামিনীর সহিত বিবাহ হইবার পর, মাতাঠাকুরাণী তাহাকে আমাদের বাড়ীতে আনিতে পাঠান—পত্রও লেখেন, কিন্তু যামিনীর পিতা বিশেষ প্রতিবন্ধকে পড়ায় তাঁহার কথায় রাজি হ'তে পারেন নাই। আমি বুঝিতে পারিলেও, মা অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া, পুনরায় আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত বড় জেদ করিতে লাগিলেন—কিন্তু আমার তাতে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ আমার—" এই বলিয়া কৈলাস নিস্তব্ধ হইল। বীরেন্দ্র বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"হাঁ, তার পর।"

কৈলাস বলিল,—"তার পর, মা গলায় দড়ি দিতে চাহিলেন, আমার তাতে ভয় হোল। টাকার লোভেও নয়,—বা আমাকে সুখী কর্ব্বার জন্যও নয়, কেবল প্রতিহিংসা চরিতার্থ কর্ব্বার জন্য আমার ঘাড়ে একটা কাল কুৎসিৎ মেয়ে চড়িয়ে দিলেন—তাকে দেখে আমার একটা এমন অভক্তি জন্মেছিল—তা বোল্‌তে পারি না। বিদ্রোহের সময় মাকে নিয়ে কাশী পালাই, তা'কে তা'র মাসীর বাড়ী রেখে যাই।"

বীরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"তার পর, তার পর।"

কৈলাস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—"তুমি এত ব্যস্ত হোচ্চ কেন? তার পর মা কাশীতেই প্রাণত্যাগ করেন; এত যে দেনা কোরেছেন, তা কে জান্‌তো? বিদ্রোহের পর, এলাহাবাদে ফিরে এলুম,—এসেই শুনি আমার তিনি ওলাউঠায় ভবধাম ত্যাগ কোরেছেন!"

বীরেন্দ্র বলিল,—"তিনি কে? তোমার সেই কাল স্ত্রী? কি আশ্চর্য্য! তোমার তাতে দুঃখ হোল না?"

কৈলাস হাসিতে হাসিতে বলিল—"দুঃখ? আমার হাড়ে বাতাস লাগলো।" পার্শ্বের ঘরে বালার শব্দ হইল কৈলাস জিজ্ঞাসা করিল—"ও কিসের শব্দ!"

বীরেন্দ্র বুঝিতে পারিল যামিনী লুকাইয়া শুনিতেছে; বলিল—"না ও কিছু নয়—হাঁ, তার পর?"

কৈলাস বলিল—"হাঁ, তার পর মার দেনা পত্র বুঝিয়ে দিয়ে দেখলুম আমার খাওয়া পর্ব্বার যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান রহিয়াছে। তাই নিয়ে একেবারে কাণপুরে গেলুম—কিন্তু সেখানে তাঁদের খোঁজ খবর কিছুই পেলেম না। বড় কষ্ট হোল, একেবারে বাঙ্গালাদেশে এসে উপস্থিত হলুম; বহু চেষ্টার পর এই চাকরি জোগাড় হ'ল। একবচ্ছর মাত্র আছি—তার পরই এই।"

বীরেন্দ্র বলিল—"কাণপুরে যারা ছিল, তাদের দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না?"

কৈলাস ধীরে ধীরে বলিল—"কেন আগেইত বোলেছি, ইচ্ছে হোলে কি হবে, আর তাদের দেখ্‌তে পাব না! কোথায় তারা—কত দূরে!"

কৈলাসকে নিতান্ত বিষণ্ণ হইতে দেখিয়া বীরেন্দ্র তাহাকে শয়ন করিতে বলিয়া সে দিনের মত চলিয়া আসিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

কিন্তু যামিনীর মুখে এত হাসি কেন? আবার কোথা হইতে তাহার সেই বাল্যকালের শুভ্র সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসিল?

অকস্মাৎ যামিনীর এই প্রফুল্ল পরিবর্ত্তন দেখিয়া পাহাড়ী সঙ্গিনীগণ কতকটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যাহাই হউক, তাহারা তাহাকে প্রফুল্ল দেখিতে পাইয়াছে,—ইহাই যথেষ্ট ভাবিয়া সন্তুষ্ট ছিল।

এক দিন একটী বালিকা এক আঁচল বনফুল লইয়া যামিনীদিগের বাড়িতে আসিল। তখন যামিনী চুল বাঁধিতে বাঁধিতে গুণ গুণ করিয়া গান গাইতেছিল।

ফুল্লি হাসিতে২ বলিল—"যানি, তুই যে বড় গান গাইছিস আজ?"

বালিকাগণ যামিনীকে—"যানি" বলিত।

যামিনী চমকাইয়া বলিল—"ওমা, ও কে ফুল্লি নাকি? তুই ত বড় মিথ্যাবাদী, আমি গান গাইলাম কোথায়?"

ফুল্লি বলিল,—"আর মিছা বলিস্ না, আমি ত গান শুনেই এলাম, হাঁলো, তোর রূপ বড্ডি বেড়েছে দেখ্‌চি?„

যামিনী হাসিতে হাসিতে বলিল—"ফুল্লি তোর নাকি আজ বে?"

ফুল্লি রাগিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া, যামিনী তাহাকে ডাকিয়া বসাইল।

ফুল্লির ভাবী পতির বাসস্থান কোথায়, তাহাকে দেখিতে কেমন, তাহাকে ফুল্লির মনে ধরিয়াছে কি না—সে সম্বন্ধে যামিনী অনেক প্রশ্ন করিল।

কিন্তু ফুল্লি, অঙ্গুলি পীড়ন চপেটাঘাত কখন অভিমানের ভাব দেখাইয়া যামিনীর প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে—ফুলগুলি যামিনীকে দিয়া ফুল্লি বাড়ী ফিরিল

দশম পরিচ্ছেদ।

তাহার পর দিবস সন্ধ্যাকাল।

কৈলাস অর্দ্ধ নিদ্রিত ও অর্দ্ধ জাগরিতভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া আছে।

গৃহের এক কোণে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল—তাহার স্তিমিত আলোক গৃহের সমুদয় অন্ধকার দূরীভূত করিতে পারে নাই।

বাড়ীতে যামিনী ব্যতীত আর কেহই ছিল না; হরিচরণ বাবু চা বাগানে গিয়াছেন—বীরেন্দ্রও বেড়াইতে গিয়াছে।

যামিনীর বড় ইচ্ছা ইহা একবার কপাটের আড়াল হইতে স্বামীকে ভাল করিয়া দেখিয়া আইসে।

ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া সে দ্বারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল; কেন বলিতে পারি না—তখন তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, প্রদীপের ক্ষীণ জ্যোতিঃ কৈলাসের শুভ্র ও বিশুষ্ক মুখের উপর পড়িয়া শুভ্রতর দেখাইতেছিল।

তখন সে একটা স্বপন দেখিতেছিল।

সে অনেক কালের কথা। একদিন বাসন্তী সন্ধ্যার সময় কত আনন্দ উচ্ছ্বাসের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সে পরিণয় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিনকার সে আনন্দ সে উৎসাহ এই বর্ত্তমান নির্ম্মম জগতকে তাহার চক্ষে কত সরস ও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল! তাহার পর মাতৃ আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হইয়া সে জীবনের যে সমুদয় সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিল—তাহার কি ফল হইল? নব বসন্তের সেই আনন্দের সেই সুকোমল কারণটি আজ কোথায়? কোথায় গেল সেই ফুল শয্যার রাত্রিতে নব পরিণীতা বালিকাটির সহিত বহু পরিশ্রমের সহিত বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করা? আজও সেই কথা মনে পড়ে—কিন্তু—আজ সে কোথায়?

চিৎকার করিয়া কৈলাস বলিয়া উঠিল—"কোথায়?" উন্মত্তের ন্যায় সবেগে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া মনের স্বতঃ উচ্ছলিত উদ্বেগে চঞ্চল দৃষ্টিতে গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

হঠাৎ উন্মুক্ত দ্বারের নিকট দেখিল,—কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! চক্ষু মুছিয়া দুই তিনবার ভাল করিয়া দেখিল, ভ্রম ঘুচিল না। আবার সেই বহু পুরাতন সলজ্জ মুখখানির কথা মনে পড়িল—কিন্তু তাহাও যেন কতকটা অস্পষ্ট।

তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন পুরাতন ও বর্ত্তমান স্মৃতির মধ্যদেশে কে যেন অর্দ্ধ বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকার সমাবেশ করিয়া দিয়াছে! উষার অর্দ্ধালোকের ন্যায় দূরের দ্রব্য অল্প দৃষ্টিগোচর হইতেছে বটে কিন্তু তাহা উজ্জ্বল রূপে চক্ষের সম্মুখে আসিয়া প্রতিভাত হইতেছিল না!

প্রথমে যামিনী দ্বারের পার্শ্ব দেশ হইতে দেখিতেছিল বটে; কিন্তু কৈলাসকে অকস্মাৎ চিৎকার করিয়া উঠিতে দেখিয়াই হউক বা তাহার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে কখন যে সে অন্যমনস্ক ভাবে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহা তাহার স্মরণ হয় না।

কৈলাস যখন তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল তখন তাহার পলায়ন করিবার আর উপায় ছিল না। তাহার বোধ হইতেছিল যেন কোন গুপ্ত মায়ামন্ত্রবলে কে তাহাকে অকস্মাৎ প্রস্তরে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে—তাহার প্রাণ আছে বটে কিন্তু আদৌ গতি-শক্তি নাই।

কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত কৈলাস উন্মাদ দৃষ্টিতে যামিনীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ ভীতিব্যঞ্জকস্বরে বলিয়া উঠিল—"কে—কে—যামি—নী—"

অত্যধিক মানসিক উত্তেজনাবশতঃ পর মুহূর্ত্তেই কৈলাস অচৈতন্য হইয়া শয্যায় পড়িয়া গেল।

কিন্তু কৈলাসের যদি কিছু চেতনা থাকিত, তাহা হইলে তাহার বোধ হইত যে সে সজোরে শয্যার উপর পতিত হয় নাই তাহার পূর্ব্বেই দুটি কোমল হস্ত তাহার মস্তককে ধরিয়া ফেলিয়াছিল।

কতক্ষণ স্মরণ নাই কৈলাস যখন অল্পে অল্পে চেতনা লাভ করিল তখন দেখিল যে এই আত্মীয় শূন্য স্থানে তাহার চির পরিচিত পরমাত্মীয় শিয়রে বসিয়া বীজন করিতেছে! মধ্যে মধ্যে কৈলাসের বোধ হইতেছিল যেন তপ্ত অশ্রুজল তাহার কপালে পড়িতেছে!

এ অশ্রু আনন্দের—না অভিমানের?—কে জানে!

তাহার পর উভয়ের মধ্যে অনেক কথা হইল। সেগুলি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত পাঠকবর্গের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে কৈলাস অনেকবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিল—এবং যামিনী "ও কি কথা ?" বলিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইতেছিল।

উপসংহার।

ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াগিয়াছে।

বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া হরিচরণ বাবু কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রামে আসিয়াই বাস করিতেছেন।

বীরেন্দ্র কলিকাতার ছোট আদালতে ওকালতি করিতেছে, কৈলাস। কাছাড়েই কার্য্য করিতেছে—অবসর পাইলেই গ্রামে আসে।

হরিচরণ বাবু কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখন তাঁহাকে একটি অবৈতনিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়।

সন্ধ্যাবেলায় যখন হরিচরণ বাবু চত্বরে বসিয়া ধূমপান করিতে থাকেন, তখন যামিনীর দুই বৎসরের পুত্রটি কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার হুঁকা লইয়া টানাটানি করিতে থাকে। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া তাহাকে পত্নীর ভ্রাতার সম্বন্ধে আহ্বান করিয়া শীঘ্র যে তাহার সহিত একটি "রক্তবর্ণা" বধূর বিবাহ দিবেন এ প্রকার আশ্বাস প্রদান করিতে থাকেন।

যে কোনও কারণেই হউক, তখন "ভুলুবাবু" হুঁকা পরিত্যাগ করিয়া দাদামহাশয়ের শুভ্র দাড়িগুলির প্রতি বিশেষ আক্রোশ প্রদান করিতে থাকে এবং তিনি যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিলে—হাসিয়াই আকুল হয়।

দ্বারের পার্শ্ব হইতে একজনের অস্ফুট হাস্যধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। সে আর কেহ নহে বীরেন্দ্রের স্ত্রী।

বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি প্রায় দুই বৎসর হইল বীরেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

ত্রিধারা।

দ্বিতীয় ধারা—মান।

'রাধা' 'রাধা' বলি', মোহন মুরলী,
বাজিল কুঞ্জের পাশে;
পূরব অচলে, ঊষা কুতূহলে,
হাসিল কনক বাসে।
সে বাঁশরী স্বরে. অনুরাগ ভরে,
কাঁপিল যমুনা জল,
ঊষার উদয়ে, উঠিল হৃদয়ে,
সুমধুর কল কল।
ময়ূর ময়ূরী. ভ্রমরা ভ্রমরী,
জেগে হ'ল দিশাহারা;
যারে পথে পায়, ধ'রে চুমো খায়,
নাচে গো পাগলপারা।
প্রেমে শুক শারী মাতোয়ারা ভারি,
গায় 'রাধা-শ্যাম' নাম;
আবেগে আকুল, ফুটে যায় ফুল,
উরসে বসিল কাম।
নীলিম আকাশে, চমকি' উল্লাসে,
হাসিল তারকাচয়;
চাঁদ পানে চেয়ে, চাঁদে চুমো খেয়ে,
মিশিল আকাশময়।
"কোথা প্রাণ হরি?" বলি'সহচরী,
চমকিল গো সকল;
ঝরিল গোপনে, কিশোরী নয়নে,
দুই ফোঁটা অশ্রুজল!

থেকে থেকে থেকে,'রাধানাম' ডেকে,
বাঁকা করি' বাঁশী ধরি';
সে কুঞ্জ কুটিরে, পশি ধীরে ধীরে,
দাঁড়াইল বাঁকা হরি।
রসের মূরতি, সেই বৃন্দাদূতী,
হেরি' সে সুন্দর ঠামে;
হাসি হাসি বলে,—'যাও শ্যাম! চলে,
কি কাজ রাধার নামে?
"ওহে চিত চোরা! গোপনারী মোরা,
নাহি জানি ছলাকল;
"পদে প্রাণ মন, সঁপিনু যেমন,
ফলেছে তাহার ফল।
"তোমার পিরীতে, তোমার চরিতে,
মজিয়ে ঢালিয়ে প্রাণ,
"ক'রে ঢলাঢলি, দিনু জলাঞ্জলি,
কুল-শীল-লাজ-মান।
"বাঁশীস্বর তুলি', শুধু 'রাধা' বুলি,
মুখে কত ভাল বাসা,
"যথা প্রিয়জন, করহে গমন,
ছি ছি—মিছে হেথা আসা!
"ঘাটে মাঠে বাটে,প্রেম নাটে ঠাটে,
কত কর রঙ্গ ভঙ্গ;
"দেখে ব্রজ-বালা, ওহে শঠ কালা!
ধর তার তুমি সঙ্গ।

"কুল বালাকুল, সদাই আকুল,
কুল রাখিবার তরে ;
"হরিয়ে দুকুল, মজা'লে গোকুল,
মরি সরমের ডরে।
"হে চিকণ কালা! কলঙ্কের মালা,
পরাইয়ে দিলে গলে ;
"ব্রজকুল কালি, কভু বনমালি!
যা'বেনা যমুনা জলে ?
"হেথা কিবা কায? যাও নটরাজ!
প্রাণের প্রেয়সী পাশে ;
"করিবে যতন, দিবে প্রাণ মন,
যে তোমারে ভাল বাসে।
"খুলেনে বিশাখা! ওই শীখি পাখা,
নেলো কুলনাশী বাঁশী,
"নেলো পীতধড়া, কেড়েনেলো চূড়া,
বনমালা প্রেম-ফাঁশী।
"কেড়েনে নূপুর, মজাতে চতুর,
মুছে দেলো রসকলি ;
"মেখে চূণকালি, যাও বনমালি!
ভাবিতেছে চন্দ্রাবলী।
"বঙ্কিম হইয়ে, মধুর হাসিয়ে,
দিও না হে আর ধাঁধা ;
"চাহেনা তোমায়, ওহে শ্যাম রায়!
শ্যাম-তেয়াগিনী রাধা।"

মুচকিয়ে হাসি, সে রাধা-বিলাসী
শুনিল চতুরা বাণী ;
দূতীগঞ্জনায়, সরমের দায়
অপরাধ নিল মানি।
নয়নে রাধার, বহে শত ধার,
মুখ শশী বিমলিন ;
শ্রীরাধার পায়, ধরি ক্ষমা চায়,
সেই রাধা-প্রেমাধীন।
চতুরা সে দূতী, করিতে দুর্গতি,
বলিল গরব করি',—
"বৃথায় শ্রীহরি! পায়ে ধরাধরি,
যাও কুঞ্জে পরিহরি।
"কাঁদায়ে রাধায়, পড়িবারে পায়,
বড়ই নিপুণ বট ;
"চিনেছে তোমায়, ব্রজ সমুদায়,
নিপট কঠিন নট!
"ভেঙ্গেছে পরাণ, টুটিবে না মান,
বৃথা এত সাধাসাধি ;
"ছিঁড়েছে বাঁধন, হে কালবরণ!
ওহে ঘোর অপরাধি!
"তথাপি কানাই! কুলবালা রাই,
তোমাপানে ফিরে চায়।
"যদি রীতিমত, দিয়ে 'দাসখত',
বাঁধা থাক রাধা-পায়।"

[ক্রমশঃ।]

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চি

অতীত-স্বপ্নের মধুর-স্মৃতি।

যমুনা-তীরে—আগরা

মিলন অপেক্ষা—বিরহ ভাল, ফুল অপেক্ষা—ফুলের সৌন্দর্য্য ভাল, বৃষ্টি অপেক্ষা বিদ্যুত ভাল, সেই জন্যই বোধ হয়—স্বপ্ন অপেক্ষা তাহার স্মৃতি কতই মধুর!

তুমি বলিবে স্বপ্নই ভাল। আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না—তোমার স্বপ্নটুকু তুমি কতক্ষণ উপভোগ করিবে বল দেখি? ভাঙ্গিয়া গেলে আর তাহাকে পাইবে না। আবার যদি তাহার সঙ্গে ছায়ার ন্যায় যে স্মৃতিটুকু আছে, তাহাও যদি কাড়িয়া লই, তাহা হইলে তুমি ভিখারির অপেক্ষাও অধম। ইহাতেও যদি তুমি বল—তোমার স্বপ্নই ভাল, আমি বলিব—ছি! তোমার প্রবৃত্তি অতি অপমার্গগামী!

সুখের স্মৃতি, স্বপ্নের স্মৃতি একই। তবে একের মাত্রা বেশী—অপরের কম। একে সসীম—অপরে অসীম। একে অপরের কার্য্য কারণ। "স্বপ্ন"কে তুমি আলাহিদা পদার্থ ভাবিলে, আমি ভাবিব সে আমার "স্মৃতির পদাঙ্ক অনুসারি।"

এক দিন জ্যোৎস্না বিধৌত তারকা খচিত অনন্ত অসীম সুনীল নভোমণ্ডলের নীচে বসিয়া—রজনীর নীরব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ছিলাম। উপরে আকাশ, নীচে কলনাদিনী পাগলিনী যমুনা, পশ্চাতে জ্যোৎস্না প্লাবিত গগনোর্দ্ধ প্রসারিত সুধা-স্রোত-তরঙ্গিত—"তাজ" তাজ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়াছে—তাহার আশ পাশের বিটপী গুলির উর্দ্ধার্দ্ধ ভাগ জ্যোৎস্নায় শিশির স্নাত প্রসূনের মত দেখাইতেছে—সে ঘাটে আমি বসিয়া আছি, তাহার শ্বেত-মর্ম্মর সোপানে চন্দ্র রশ্মি উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছে—আর সেই কলনাদিনী কৃষ্ণ সলিলা অনন্ত স্মৃতিময়ী—ভাবময়ী দ্রুতবাহিনী যমুনা, নিজের কাল জলের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত, ধাবিত, প্রধাবিত বীচি মালার মধ্যে চন্দ্রকর লেখা চুরি করিয়া পলাইতেছিল। তখন কবি-বাক্য মনে হইতেছিল;—

"This our life, exempt from public haunt,
Find tongues in trees, books in the running brooks;
Sermons in stone, and good in every thing !!"

যে দিকে চাই আনন্দ-স্রোত তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গায়িত। যে দিকে চাই কি এক অদ্ভুত অজানা রাজ্যের স্বপ্ন--বড়ই মধুর, বড়ই তৃপ্তিময়ী, বড়ই বিলাসিতায় পরিপূর্ণ। আকাশে চাঁদ, গাছের পাতার উপর চাঁদের কিরণ, যমুনায় চাঁদ—আর আমার চির অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে যে সমগ্র চন্দ্রমণ্ডল !!—মরি ! কি মধুর স্মৃতি—মরি মরি ! কি সুন্দর সুখ স্বপ্ন !

একবার ফিরিয়া তাজের দিকে চাহিলাম। যাহা দেখিলাম—তাহা অতি মধুর। কতশত দিন, কত শত মাস, কত শত বৎসর, কত শত যুগ তোমার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—কত সুখ, কত দুঃখ, কত নিরাশা, কত মর্ম্মপীড়া, কত অত্যাচার, কত শোণিত-স্রোত, কত লুণ্ঠন, কত ক্রন্দন—তোমার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—তবুও আজও তুমি তাই ! তিন শত বৎসর আগে তুমি যেমন ছিলে আজও তুমি তাই ! পাষাণ ! পাষাণ তোমার প্রতিকৃতি, পাষাণ তোমার উপকরণ—পাষাণ তোমার প্রকৃতি। তাই আজ পাষাণ হৃদয়ে পাষাণ অক্ষরে তুমি অদ্ভুত স্মৃতি বহন করিতেছ !

কোথায় তোমার সেই বাদসাহ সাহজাহান?—যিনি দিবানিশি, সময়ে অসময়ে, সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায় তোমায় আগবার লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ মধ্যস্থ কক্ষ বাতায়ন হইতে নিরীক্ষণ করিয়া এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন !! কোথায় তাঁহার সেই প্রিয়তমা প্রণয়িনী "মম তাজমহল" যাঁহার নাম স্পর্শে আজ তুমি, মহান, গরীয়ান, যে তোমাকে আজ এত বড় করিয়া—পাষাণে অনন্ত জীবনীশক্তি দিয়া নিজে নীরব হইয়া তোমার অন্ধ তমসাবৃত্ত কক্ষতল আশ্রয় করিয়াছে ?

তোমার কূটনীতি, কে বুঝিবে? যাহারা এই ভারতবর্ষের সীমান্ত হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত পবিত্র রাজপুত শোণিতে মৃত্তিকাসিক্ত করিয়া ভারতের গলায় চিরবন্ধন শৃঙ্খল পরাইয়াছে তারা পারে নাই,—দর্শন, বিজ্ঞান তোমার প্রহেলিকা কি বুঝিবে? কবি, কাব্য তোমায় কি বুঝাইবে? আমি বুঝি—তুমি পাষাণ হইয়াও কুসুম কোমল। তুমি শ্মশান

হইয়াও প্রমোদ কানন, তুমি বিষাদ হইয়াও উল্লাসের তীব্র জ্যোতি। তুমি প্রণয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ। তোমার উপরে পাষাণ হইলেও ভিতরে থরে থরে—সুবাসিত ফুল সাজান! তাই তোমায় দেখিলেই বলিতে ইচ্ছা হয়,—

How sublime! how grand!
——— but deceptive!
Sacred to ridicule!——
And the sad burden of a merry song."

তোমার সৌন্দর্য্য অতুল—অসীম, তাই ইংরেজ ভ্রমণকারী তোমার উপর একখানি কাচের আচ্ছাদনী করিয়া দিতে বলিয়াছিল। * সেই-ই—কবি না হইয়াও—তোমার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া গিয়াছে। তাই বলি—

"তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে—"

বিশ্রাম ঘাট মথুরা।

তার পর আর একদিনের স্মৃতি। সে দিনও আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। যমুনায় জ্যোৎস্না ভাসিয়াছিল, প্রকৃতি বড়ই মধুর হাসি হাসিয়াছিল—বাতাস বড়ই মধুর বহিতেছিল, সাদা সাদা কুন্দ গুলি জ্যোৎস্নার প্রতি বড়ই বিদ্রূপ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিতেছিল—চাঁদের আলোয় জগৎ হাসিতেছে, নক্ষত্রের তাহা সহ্য হইতেছিল না; সে এক একবার ঝিকি মিকি করিয়া উঠিতেছিল। কোকিল, দয়েলা বড় সুখে তান ধরিয়া মজা মারিতেছিল। বাসন্তী রজনী, আকাশে, ধরায়—গাছের মাথায়—মন্দির চূড়ার সোপান স্তূপে—রমণীর মুখে—বড়ই জ্যোৎস্নার বাহার। প্রাণ মাতোয়ারা বিলাস বিভোরময়ী রজনী। আহা! সেই রজনীতে এক অন্ধ ব্রজবালক সেই ব্রজবাসী ও ব্রজবাসিনীদের মধ্যে বসিয়া খঞ্জনীর তালে গাহিতেছিল—

বন নাহি, বেলি নহি নহি কাহু পরসঙ্গ,
কমল ভ্রমরা, ত্যজকে ভষম্ চঢ়াবত অঙ্গ।

---

* একবার একজন বিখ্যাত ইংরাজ ভূপতি তাজমহল দেখিতে এ দেশে আসেন। তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে বিলাত হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন,—"তোমার তাজমহলের কোন দোষ না বাহির করিয়া আমি ফিরিব না"। দোষ বাহির করা দূরে থাকুক—তিনি তাজের মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া কবিত্বে পরিপূর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন—তাজের একটী প্রধান অভাব (Defect) এই এমন একটী অদ্ভুত বহুমূল্য পদার্থের উপর বায়ু ও রুটিকার প্রকোপ রক্ষার জন্য একটী সুবৃহৎ কাচাবরণ (Glass case) নাই। তাহা করিয়া দেওয়া উচিত।

রহা এক ব্রজমালতী ওয়া কিয়া উদণ্ড,
পূর্ব্বক প্রীতিক কারণে, ভষম চঢ়াবত অঙ্গ।
যব জরা ব্রজমালতী মধুকর রহা ন সঙ্গ,
গঙ্গ বরণকে হে-সখি! ভষম চঢ়াবত অঙ্গ। *

ব্রজবালকের পরিধানে, একখানি বৃন্দাবনী ধুতি। মাথায় কেশগুচ্ছ রাখালদিগের ধরণে—চূড়া বান্ধা, কপালে অলকা তিলকা, নাকে রসকলি আর তার উপর তার তার সুন্দর মুখ খানি। কিন্তু তাহা ঘোর অন্ধতার মধ্যে নিমগ্ন। বালক অন্ধ। কিন্তু দেখিলে চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত বলিয়াইবোধ হয়।

রাত্রি তখন এগারটা বাজিয়া গিয়েছে—দ্বিপ্রহরের আমল। নিশীথ জ্যোৎস্না প্লাবিত—সুসুপ্ত চন্দ্র কিরিটিনী-নিসর্গে-নিশীথের আধিপত্য। সে নৈশ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া বালকের কোমল কণ্ঠ পরদায় পরদায় সুরে সুরে উঠিতে লাগিল। মথুরায় যমুনার তীরে চাঁদিনী যামিনীতে কৃষ্ণবেশী ব্রজবালকের এ মধুর প্রেমময় ভাব যে না দেখিয়াছে তার জীবনই বৃথা। বালক গাহিতে লাগিল;—

রহা এক ব্রজ মালতী ওয়া কিয়া উদণ্ড
পূর্ব্ব প্রীতিক কারণে— ভষম চঢ়াবত অঙ্গ।

পাশে ব্রজবাসিনীগণ বালকের কণ্ঠস্বরে ডুবিয়া একমনে গান শুনিতে ছিল—কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন হো! হো! করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"হরি! হরি! ভ্রমরের ত বড় বিরহ উপস্থিত, প্রেমও আমাদের

---

* সম্পূর্ণ গানটীর অবিকল অর্থবোধক একটী কবিতা এই—

বনভূমি করি আলো, মধুর উজল রূপে,
এক ব্রজ-মালতী সুন্দর,
ফুটেরহে সারাদিন, ঘুরে ঘুরে এল তথা
মধু আশে মত্ত মধুকর।
প্রতি দিন ফুলে ব'সি, সুখে মধুপান ক'রি,
যায় ভৃঙ্গ মনোসুখে চ'লে
একদিন দেখে এসে, বনভূমি পুড়ে গেছে,
মালতীও মিশেছে অনলে।
ভস্মরাশি পড়ে আছে, মালতীর চিহ্ন নাই
শূন্য প্রায় ধু ধু দাবানলে,
আকুল ভ্রমর রাজ, কাতর পরাণে অতি
ভস্মে নামে পড়ে সেই স্থলে।
প্রিয়ার স্মৃতির চিহ্ন, এই ভস্ম পড়ে আছে
ইহাই মাখিয়া যাব চ'লে"।
নিকটে মল্লিকা ছিল, ভ্রমরেরে ডেকে বলে—
"ভাল সখে! ঘুচিল জঞ্জাল।
'মালতী যখন ম'ল, বঁধু তুমি কোথা ছিলে
পুড়িতে পারনি তার সঙ্গে?
প'ড়ে আছে ঠাণ্ডা ছাই সগর্ব্বে মাখিছ তাই
ছি! ছি! ধিক শূন্য প্রেম-রঙ্গে
শুনিয়া ভ্রমর কয়—"পুড়িতাম সে অনলে
থাকিতাম যদি সে সময়,
"গঙ্গাস্নান করি সুখে প্রেমস্মৃতি ভস্মরাশি
ধারণের বাসনা উদয়।"

কানুর সদৃশ। রাধার দুঃখে কৃষ্ণের যেমন ঘুম হয় নাই—ব্রজবালক! তোমার ভ্রমরও তেমনি প্রণয়ী দেখিতেছি। ব্রজমালতী পুড়িয়া গিয়াছে, আর মধুপানের উপায় নাই, কাযেই ভ্রমর এখন খালি ভস্ম মাখিয়া লোক দেখান উদারতা দেখাইতে আসিয়াছে—ছি! ছি! একথা বলিতেও কি লজ্জা হইল না?"

এ বিদ্রূপ-বাণী না শেষ হইতে হইতে বালক—এবার যেন রহস্য কারিণীর হাস্যালাপ ডুবাইয়া দিবার জন্যই সে সপ্তমে তুলিয়া—গাহিল—

যব জরা ব্রজমালতী মধুকর রহান সঙ্গ,
গঙ্গ বরণক্কে সখি! ভষমি চড়াবত অঙ্গ।

এ উত্তরে সকলে পরাজিত হইল; আর কেহ কথা কহিল না। চারি-দিক হইতে টাকা পয়সা, বালকের হাতে পৌঁছিতে লাগিল। আমি একটী টাকা সেই অন্ধ কৃষ্ণ বালককে দিলাম, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে সেই চির-সন্তপ্ত প্রাণে যে শান্তিধারা ধারা পাইলাম—তাহার কি তুলনা আছে?

তার পর শ্রোতারা তাহাকে বংশী বাজাইবার জন্য অনুরোধ করিল। একে চন্দ্রালোক বিধৌতা যমুনা, তাহাতে গভীর নিশীথ—আশে পাশে ব্রজবাসিনী, মাঝে কৃষ্ণ বালক বাঁশরী হাতে দণ্ডায়মান। মরি! মরি! কি মধুর রূপ! চাঁদের আলো সে মুখে পড়িয়াছে সে বাঁকা বাঁকা চম্পক-কলি বিনিন্দিত হাত দুটিতে পড়িয়াছে তাহার সে বঙ্কিম ঠামের উপর—তাহার বাঁশীটীর উপর পড়িয়াছে। বালক বাঁশীর রন্ধ্রে সুর ছাড়িল—বাঁশী গায়িতে লাগিল—

অবধি ওর ভেল সময় বেয়াপিত
জীবন বহি' গেল আশে—
তথমুক বিরহ যুবতী নঁহি জীয়তি
ফিরত মাধব মাসে—
ছল ছল কঁয়ক দিবস গমাওলি
দিবস দিবস কর মাসে—
মাস মাস কর, বরথ গোমাওলি
আর জীবত কোন আশে?"

গান যখন শেষ হইল সুর যখন শূন্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নৈশ নিস্তব্ধতায় মিশাইতে লাগিল, তখনও চাঁদ মাথার উপরে হাসিতেছে। বালক সঙ্গীত

বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। লোকজন চলিয়া গেল। আমি তখনও বসিয়া একা একা সেই যমুনাতীরে! আমার ক্ষুদ্রহৃদয় জানিনা কার প্রেমে তখন পূর্ণ ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। আকাশে দেখিলাম—শশী পূর্ণতায় পরিপূর্ণ—গাছ পালায় সজীব পূর্ণতা—যমুনার জলে—পূর্ণতা যেন তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া ছুটিতেছে, বাতাস যেন পূর্ণতায় আরও মাতোয়ারা হইয়া মন মাতাইতেছে। আর—আমার হৃদয় সেই চির সন্তাপিত হৃদয়—এখন বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে—কে যেন তাহার মধ্যখানে সিংহাসন পাতিয়া শান্তিদেবীকে পাশে লইয়া সেই অন্ধ কৃষ্ণকে আলোকিত করিয়াছিল। আহা! সে দিন যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা আর দেখিতে পাইলাম না,—পাইবও না। এ শ্রান্ত জীবনের ক্লান্তি—এ ভ্রান্ত জীবনের অবসাদ একদিন মিটিয়াছিল, হরি! হরি! সে দিন যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা আর দেখিব না—সে রূপ, সে দৃশ্য সে শান্তি, সে ভাব, সে গাম্ভীর্য্য প্রেমৌদার্য্য পূর্ণ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সৌন্দর্য্য শতজন্ম হেরিলেও বুঝি তৃপ্তি হয় না,—সে বাঁশীর রব শত জন্ম শুনিলেও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে না,—সেখানে বসিয়া শত শত রজনী যাপনে বুঝি সে সুখ হয় না; আর সে মধুর স্মৃতি, শত শত যুগ হৃদয়ে রাখিলাম—তবু যেন প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে চায় না; তাই বলিতে ইচ্ছা করে—

"জনম অবধি হাম, রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেই মধুর বোল, শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী, রভসে গোঙাইনু
না বুঝনু কৈছন না কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।
কত রসিক জন, রসে অনু মগন,
অনুভব কাহ না দেখ,
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক।"

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি দেবি, নমস্তে॥"

২য় খণ্ড। } ফাল্গুন, ১৩০১ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মভাব।

আজ কাল সাধারণের মনে কেমন একটা ধারণা হইয়াছে, কেমন একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে, বিজ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ধর্ম্মভাব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা মনে করেন, বিজ্ঞান আর ধর্ম্ম পরস্পর এমনই বিরোধী,—তাহাদের মধ্যে এমনই মজ্জাগত প্রভেদ যে, যাহা একের অবলম্বন—অপরের তাহা ত্যজ্য, যাহা একের প্রাণ—অপরের তাহাই সর্ব্বনাশ! বিজ্ঞান পড়িলে আর ঠাকুরদেবতাদিগকে মানিতে নাই, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করিতে নাই, আর সেই সকলের মূলীভূত কারণ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিতে নাই। বিজ্ঞানের কাছে ধর্ম্মের আসন বড় নীচু। বিজ্ঞানের সমক্ষে ধর্ম্মকে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইতে হয়। এবং আর কিছুদিন বিজ্ঞানের এইরূপ চর্চ্চা হইতে চলিলে সমাজ হইতে ধর্ম্মভাব একেবারেই লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

সাধারণের এইরূপ ধারণা—এইরূপ বিশ্বাস—ভ্রান্তিসংকুল হইলেও ইহার অভ্যন্তরে সেই ভ্রমের যে একটা গূঢ় কারণ আছে, তাহা অবশ্যই মানিতে হইবে। কোন ধারণা—কোন বিশ্বাস একদিনে জন্মায় না—জন্মাইতে পারে না। একটা বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে, ঘটনারাশির মধ্যে একটা সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ নিয়ম আছে কি না—দেখিতে হয়। কিন্তু সমাজে ঘটনারাশি যেরূপ দ্রুতবেগে সাগরোর্ম্মির মত সম্মুখ দিয়া যাইতেছে ও আসিতেছে, তাহাতে এক দিনে তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থির করা বড়ই দুরূহ।

ভাল করিয়া বিবেচনা না করিয়া, ভাল করিয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, যা' হউক একটা সমন্ধ নির্দ্দেশ করায় প্রকৃত কার্য্যকারণ নিয়ম স্থির হয় না। বাত্যা-তাড়িত তৃণরাশি একটির পর আর একটি উড়িয়া যাইতেছে বলিয়া একটীই অপরটীর কারণ বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। এই জন্য একটা ধারণা, একটা বিশ্বাস জন্মাইতে কিছু সময়ের আবশ্যক করে। যে বিশ্বাসের মূলে ভাবনা নাই চিন্তা নাই, সে বিশ্বাস প্রায়ই ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা বিজ্ঞান ও ধর্ম্মকে পরস্পর বিরোধী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কতকটা এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন।

বিশ্বাস জন্মাইতে আর একটী জিনিষ চাই। বিশ্বাসের একটী মূল ভিত্তি চাই। কেবল শূন্যে কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। সকলেরই যাই হউক একটা আশ্রয় চাই—একটা অবলম্বনচাই। বনিয়াদ না তুলিয়া বাড়ী প্রস্তুত করা যায় না। বীজটী না থাকিলে গাছটী জন্মিতে পারে না।

আবার বীজটী ভাল না হইলে, যেমন গাছটী ভাল রকম হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে না, অল্প স্বল্প ফল ফুল ফুটাইয়া শীঘ্রই মারা যায়, অথবা বনিয়াদ পল্‌কা হইলে যেমন বাড়ীটী বড় অধিক দিন টেঁকে না, একটা বড় গোছের ঝড় বৃষ্টিতে ধাক্কা খাইয়া ভূমিসাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ কোন বিশ্বাসের মূলভিত্তি ভাল রকম মজবুত না হইলে, সে বিশ্বাসও অধিক দিবস টেঁকিতে পারে না। বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব আছে বলিয়া যাঁহারা বিজ্ঞানশিক্ষার বিরোধী, অথবা যাঁহারা বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া ধর্ম্মের বা ধর্ম্মভাবের বিরোধী বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহবান, ইঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত-মতের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরে পরস্পরের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছেন।

নদী যেমন যে পথ দিয়া যাউক না কেন, শেষে সাগরে গিয়া মিলিবেই মিলিবে, সাগর ছাড়া নদীর আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ ধর্ম্ম যে দিক দিয়া যাউক, বিজ্ঞানে মিলিবে, বিজ্ঞান যে দিক দিয়া যাউক কেন, ধর্ম্মের সহিত মিশিবে। বিজ্ঞান আর ধর্ম্ম, উভয়ের একই স্বার্থ—একই উদ্দেশ্য—এক দিকেই উভয়ের গতি।

যদি তাই হয়, তাহা হইলে কেন লোকে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে বিরোধ আছে বলিয়া একটা রটনা করিয়া, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের উভয়েরই অবমাননা করে? ব্যাপারটা অতি সহজ—ইহার কারণ বুঝিতে বড় অধিক দূর যাইতে হইবে না। আজ কাল বিজ্ঞান শিক্ষার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা বড় সঙ্কীর্ণভাবাপন্ন, তাহার বিস্তৃতি নাই গভীরতা নাই এবং একদেশী। ক্ষুদ্র স্রোতের মত তাহার চারিদিকেই চড়া, নৌকা ভাসাইলেই চড়ায় ঠেকিয়া ফুটা হইয়া ডুবিয়া যায়। বিজ্ঞান শিক্ষার্থী যুবকেরা বিজ্ঞানের দুই চারি পাতা পড়িয়া সে সঙ্কীর্ণভাব আর ছাড়িতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন, যাঁহাকে প্রবীণেরা দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন, তাহা সামান্য জড়পদার্থ মাত্র; জড়পদার্থের পূজা করা বাতুলের কার্য্য। তাঁহারা মনে করেন, প্রাচীনেরা যাহা ভৌতিক বা দৈব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, বা বিবেচনা করিতেন, তাহা বিজ্ঞানবলে অন্যরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। দৈব বা ভৌতিকের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। তাঁহারা মনে করেন, সংসারে যাহা ঘটিতেছে, সবই স্বভাবের অপরিববর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে। দেবতা বা ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কি? তাহাদের অস্তিত্বেরই বা আবশ্যক কি?

এই একদেশী ও সঙ্কীর্ণভাবাপন্ন বিজ্ঞানশিক্ষার প্রভাবে অনেকেই ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া, সাধারণে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধ ভাব আছে বলিয়া কল্পনা করেন। কিন্তু এ কল্পনার ভিত্তিটী—মূলটা বড় মজবুত নয়। এক জন হিন্দুকে সুরাপান করিতে দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করা যে ভ্রম, সেইরূপ দুই চারি জন বা দশ জন বিজ্ঞানশিক্ষার্থীকে ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ দেখিয়া ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ আছে বলিয়া স্থির করায়ও—সেই ভ্রম।

বিজ্ঞান ভাঙ্গিতে পারে গড়িতেও পারে। কিন্তু ভাঙ্গা কাযটা বড়ই সহজ। একটী মূর্ত্তি এক ঘা লাঠি মারিলেই ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে বড় বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক করে না; কিন্তু মূর্ত্তিটী গড়িবার সময়ই সর্ব্বনাশ! তাহাতে বিদ্যা আবশ্যক, বুদ্ধি আবশ্যক, শিক্ষা আবশ্যক। এখনকার বিজ্ঞানশিক্ষার্থীরা ভাঙ্গিতে মজবুত, কিন্তু

গড়িতে পারেন না। এই জন্যই আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষাকে আমরা একদেশী শিক্ষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। আমরা ভাঙ্গার নিন্দা করিতেছি না। সংসারে ভাঙ্গা ও গড়া দুইয়েরই প্রয়োজন। কেবল ভাঙ্গিলেই কায হয় না, কেবল গড়িলেও কায হয় না। দুইয়ের সমাবেশ চাই—দুইয়ের মিলন চাই।

যাহা মন্দ, তাহা ভাঙ্গ; আর তাই ভাঙ্গিয়া ভাল জিনিষ প্রস্তুত কর তাহা হইলেই উন্নতি, তাহা হইলেই মঙ্গল। তা না করিয়া, যদি চক্ষু মুদিয়া ভাল মন্দ কিছুই না বাছিয়া সকল ভাঙ্গিতে যাও, অথচ কিছুই ভাল গড়িতে না পার, তাহা হইলে সমূহ বিপদ ও অনর্থের সম্ভাবনা।

আজকালিকার বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা কিছুই বিচার না করিয়া ভাল মন্দ সব ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অথচ গড়িবার বেলা অকর্ম্মণ্য। তাঁহারা হিন্দুদিগের পবিত্র আচার ব্যবহার রীতি নীতি, সব ছাই ভস্ম বলিয়া ত্যাগ করিতেছেন, অথচ তাহার পরিবর্ত্তে কিছুই ভাল দাঁড় করাইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা দেব-দেবী ভাঙ্গিতে চাহেন, তাঁহারা জাতি-ভেদ ভাঙ্গিতে চাহেন, তাঁহারা আমাদের পূজা-পর্ব্ব ভাঙ্গিতে চাহেন, কিন্তু এসব ভাঙ্গিতে যে সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখেন না এবং এসব ভাঙ্গিয়া কি যে গড়িবেন, তাহাও তাঁহারা খুঁজিয়া পান না।

বিজ্ঞানে বাস্তবিক অনেক জিনিষ ভাঙ্গে ও অনেক জিনিষ গড়ে। ছেলেবেলা মাকড়সার জাল দেখিয়া হয়ত গ্রাহ্য করিতাম না, কিন্তু, এখন সেই জাল দেখিয়া কত আনন্দ হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বিদ্যা বুদ্ধি বাড়ে অমনি প্রত্যেক পদার্থেই অধিকতর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই—একটা বিশ্বব্যাপী নিয়ম দেখিতে পাই ও তাহাতে সেই সর্ব্ব নিয়ন্তার এক অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হই। বিজ্ঞান না থাকিলে, সে সৌন্দর্য্য, সে নিয়ম দেখিতে পাইতাম না। জীবতত্ত্ববিৎ না হইলে একবিন্দু বীজের যে কত মাহাত্ম্য তাহা কে বুঝিত? কে এই নক্ষত্র, ছায়াপথ, ধূমকেতু প্রভৃতি নভোমণ্ডলের অনির্ব্বচনীয় শোভা ও সৌন্দর্য্য, গভীরতা ও অসীমতা অনুভব করিতে পারিত? এখন জিজ্ঞাসা করি যে এই সকল দেখিয়া, ভাবিয়া, বুঝিয়া এই সকল শোভা

ও সৌন্দর্য্য, গভীরতা ও অসীমতা অনুভব করিয়া, যে মহাশক্তি বলে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে ও চলিতেছে, যাঁহার প্রভাবে এ সকল শোভা ও সৌন্দর্য্য বিরাজমান, তাঁহার প্রতি ভক্তি বাড়ে না কমে? তাই বলি বিজ্ঞান ধর্ম্মের বিরোধী নয়—বিজ্ঞান ধর্ম্মকে নষ্ট করিতে চায় না, বিজ্ঞান ধর্ম্মকে রাখিতে চায় ও ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইতে চায়। বিজ্ঞান ভাঙ্গে ও গড়ে আগেই বলিয়াছি। শৈশবে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া ধরিবার জন্য আহ্লাদে হাত বাড়াইতাম, বিজ্ঞান সে অর্থহীন শুষ্ক আহ্লাদকে নষ্ট করে—এই খানে বিজ্ঞান ভাঙ্গে। কিন্তু সে আহ্লাদকে নষ্ট করিয়া যখন বিজ্ঞান চন্দ্রের আকার, চন্দ্রের বিস্তৃতি, শব্দহীন গন্ধহীন পর্ব্বত পরিপূর্ণ চন্দ্রের অবয়ব, চন্দ্রের গতি, গভীরতা, ও অসীমতার কথা আমাদিগকে শিখাইয়া দেয়, তখন সেই শৈশবের আহ্লাদ অপেক্ষা শতসহস্র গুণ অধিক আনন্দ হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকে এবং সেই অনন্ত মহাশক্তির মহত্ব ও অসীমত্ব ভাবিতে ভাবিতে মুগ্ধ হইয়া আমাদের আত্ম বিস্মৃতি ঘটে। এই খানে বিজ্ঞান গড়ে। শৈশবের আনন্দকে নষ্ট করিয়া আর এক প্রকার আনন্দে হৃদয়কে মজাইয়া তুলে। তাই আবার জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে সকলের আধার সেই মহাশক্তির প্রতি ভক্তি বাড়ে না কমে?

আবার অন্যপথ দিয়া দেখিতে গেলে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের একই স্বার্থ—একই উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা আকর্ষণী, তাড়িৎ প্রভৃতি শক্তি সমূহের মূলে যে এক মহাশক্তি আছে, তাহারই আবিষ্কারের জন্য মাথা খুঁড়িতেছেন। ধর্ম্মও বলে—সবই এক মহাশক্তি-সম্ভূত। ধর্ম্ম সেই মহাশক্তির ধ্যান করে, সকলের মূলীভূত কারণ বলিয়া তাঁহার পূজা করে ও তাঁহার চিন্তায় মুগ্ধ হইয়া মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়। বিজ্ঞানের মতেও তাই। ফুল চন্দন না দিলে যে পূজা হয় না, এ কথাই নয়। যদি এক মনে সেই মহাশক্তির বিষয় ভাব, যদি সব জিনিষ সেই মহাশক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেই সেই মহাশক্তির ধ্যান হইল—তাঁহার পূজা করা হইল। তাই বলি বিজ্ঞানও সেই মহাশক্তির জন্য লালায়িত—ধর্ম্মও সেই মহাশক্তির জন্য লালায়িত। তবে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের একই স্বার্থ—একই উদ্দেশ্য, একথা কেন মানি কেন পড়ুক

বিজ্ঞানকে বিরোধ ভাবে কল্পনা করি ও উভয়েকে পরস্পরের শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিই ?

তবে একটা কথা আছে। বিজ্ঞানবিৎ, তুমি হয়ত বলিবে, তোমার মহাশক্তি নির্গুণ। কিন্তু বল দেখি, নির্গুণ কেমন করিয়া বুঝিব ? আমি নিজে সগুণ হইয়া কেমন করিয়া নির্গুণকে কল্পনার ভিতর আনিব ? সে মহাশক্তির স্বরূপ কি, তাহা তুমিও জাননা—আমিও জানিনা। নিরপেক্ষ ভাবে সংসারের কোন জিনিষই জানিবার উপায় নাই। এই জন্যই স্পেন্সর সাহেব সই মহাশক্তিকে অজ্ঞাত (The unknowable) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক, প্রকৃত পক্ষে সে শক্তি যে কি ? নিরপেক্ষ ভাবে তাহা আমরা কখন জানিতে পারিব কি না, তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, সে মহাশক্তির যে টুকু জানিতে পারিব, তাহা সগুণ ভাবেই জানিব, কেন না আমরা নিজে সগুণ। সগুণ হইয়া কেহ কখন নির্গুণ কল্পনা করিতে পারে না!

কিন্তু সেই মহাশক্তি হইতে যে সমস্ত পদার্থই সমুদ্ভূত, আর আমরা সর্ব্বক্ষণই যে মহাশক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছি, এ বিষয়ে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মাঝে মতদ্বৈধ নাই *। দুইই পরস্পরের সাহায্যকারী—দুইই পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক। দুইই সেই এক মহাশক্তির উদ্দেশে ধাবমান। দুইয়ের সেই একই স্বার্থ—একই উদ্দেশ্য। আমরা সেই মহাশক্তির উদ্দেশে কোটী কোটী প্রণাম করি।

শ্রীমণিলাল শেঠ।

* "But amid the mysteries, which become the more mysterious, the more they are thought about, there will remain the one absolute certainty, that he is even in the presence of an Infinite and Eternal Energy, from which all things proceed."

H. Spencer.

ত্রিধারা।

তৃতীয় ধারা—দাসখৎ।

তোঁহারি কারণ,　এদেহ ধারণ,
গোপভাবে গোপমাঝে ;
এই ব্রজধামে,　জপি রাধানামে,
প্রেমিক মোহন সাজে।
সদা নিশি দিনে,　যমুনা পুলিনে,
তমাল কদম্ব মূলে ;
ধরিয়ে মুরলী,　"রাধা রাধা" বলি,
হৃদি প্রাণ মন খুলে।
পিক শুক শারী,　ভ্রমরা ভ্রমরী,
তরু লতা কাণে কাণে ;
বাজাইয়ে বেনু,　চরাইয়ে ধেনু,
ঘুরি 'রাধা'মন্ত্র দানে।
রাধা বিমোহন,　হের বৃন্দাবন,
রাধা নাম ফুকরায় ;
রাধা নাম স্মরি,　যমুনা সুন্দরী,
উজানে ছুটিয়ে যায়।
দিনরাত ধরি',　বিভোলা বাঁশরী,
ডাকে রাধা উভরায় ;
অধর পরশে,　রাধাধর রসে,
নব ছিদ্র ভেসে যায়।
তমাল হেলিয়ে,　বঙ্কিম হইয়ে,
যবে রাধা নাম গাই ;
হৃদি পয়োধরে,　থাক তুমি ধরে,
তোমার পরশ পাই।

জপি 'রাধা রাধা', বহি শিরে বাধা,
রাধা নাম লেখা তায় ;
রাধা নাম আঁকা, লতাপাতা শাখা,
তমাল কদম্ব গায়।
রবি সুধাকরে,　রাধা নাম করে,
করে রাধা রূপ হাসে ;
পঞ্চভূত মাঝে,　রাধা নাম রাজে,
রাধার মূরতি ভাসে।
তব শক্তি বলে,　শূন্য চক্রে চলে,
রবি শশী গ্রহ তারা ;
শক্তি হীন তায়,　ভেঙে চুরে যায়,
ছোটে পাগলের পারা।
রাধা নামে লেখা,　অলকা তিলকা,
হের ছায়াপথ গায় ;
রাধা নাম ধরি',　দিবা বিভাবরী,
বাজে বাঁশী শূন্যে হায়।
ভূষণ শিঞ্জন,　নূপুরের রণ,
শুনি সদা আশে পাশে ;
তখনি উল্লাসে, হেরি সে আকাশে,
তোমার মূরতী হাসে।
নীলনভ মাঝে,　ঘন ঘটা সাজে,
তোঁহারি কুন্তল দোলে ;
বেড়ি করে আলা,　মন্দারের মালা,
শুভ্র অভ্র কোলে কোলে।

পূরব আকাশে, উষাসতী হাসে,
সলাজ প্রতিমা তব ;
সায়াহ্ন গগনে, হেরি সে তপনে,
যোগিনী মূরতি নব
হিমাংশুর কোলে, মৃগাঙ্ক কে বলে,
তুমি সে মানিনী রাধে ;
নীল বাস দিয়ে, বদন ঝাঁপিয়ে,
আছ বসে লো বিষাদে।
মান ভাঙ্গিবারে, সাধি বারে বারে,
পায়ে দিয়ে দুটি হাত ;
হেন রূপে ঘটে, বিশ্ব প্রেম পটে,
নবছায়া লোক পাত।
শুন রাধে সতী, তুমি লো প্রকৃতি,
আমি লো পুরুষ তায় ;
আছি ছুয়ে ছুয়ে, প্রতি অণু ছুঁয়ে,
বিপুল জগৎ কায়।
আমি কখনই, তোমা ছাড়ানই,
তুমি নহ আমাছাড়া ;
তব মাঝে থাকি', তোঁহারেই ডাকি,
তোমা হয়ে দিই সাড়া।
কভু তুমি শ্যাম, কভু আমি রাধা,
কভু দোঁহে এক হই ;
কভু আধা রাধা, কভু আধা শ্যাম,
এক দেহে দোঁহে রই।
সগুণে নির্গুণে সকামে নিষ্কামে
আমি প্রেম অবতার ;
সত্ত্ব রজ তমে আমি লো আধেয়
তুমি লো আধার তার।
প্রেমে দীক্ষাদান, প্রেমে অধিষ্ঠান,
প্রেমে জীবে উদ্ধারিতে ;
যুগ যুগ আমি, তব শক্তি ধরি',
অবতরি অবনীতে।

তব প্রেমজালে বদ্ধ এজগৎ
তব প্রেমে ফুটে যায় ;
তব শক্তি বলে এ বিশ্ব বীণায়
সাধন সঙ্গীত গায়।
তব আরাধনা, তোঁহারি সাধনা,
ধরি চরাচরে চরি ;
রাধে তব সঙ্গে, খেলি লীলা রঙ্গে,
সে গোলোক পরিহরি।
কভু নির্ব্বিকারে, নিত্য নিরাকারে,
হয়ে থাকি দোঁহে লীন ;
কভু বা বিকারে, অনিত্য সাকারে,
এক আত্মা দেহ ভিন।
তোমা বিনা রাই, কোথা' আমি নাই,
তোমাপদে আছি বাঁধা ;
অন্তরে বাহিরে, লেখা রাধাপদ,
অলকা তিলকা রাধা।
রাধা সূত্রাদিয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের মালা,
রচেছি শূন্যের পরে ;
ডাকিছে সদাই, রাধানাম গাই,
জগৎ জগদন্তরে।
রাধা আকর্ষণে, গ্রহ তারাগণে,
শূন্যে করে বিচরণ ;
রাধা প্রেমভরে, নীহারিকা স্তরে,
হয় গ্রহ বিগঠন।
তুমি মোর স্বর্গ, তুমি অপবর্গ,
তুমি ধর্ম্ম অর্থ কাম ;
গাও বৃন্দাবন, গাও জগজ্জন,
"রাধাশ্যাম" "রাধাশ্যাম।"
জগতের হিতে জগতে—বিলাতে
প্রেমধারা মনোমত ;
গোপী সাক্ষ্য করি, হে রাধে সুন্দরী
দিনু পদে—'দাসখত।'

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচি

প্রতিযোগিতায় আয়ুর্ব্বেদ।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের অপর নাম কর্ম্ম-ভূমি। পাত্রাপাত্রভেদে—বর্ণাশ্রমানুসারে- কর্ম্মবিভেদ থাকায় এবং প্রাচীন হিন্দুগণ স্ববিহিত কর্ম্ম একান্ত অনুষ্ঠেয় জানিয়া, বংশপরম্পরায় তাহার উন্নতিসাধন করিতে রত থাকিতেন বলিয়া, ভারতবর্ষ কর্ম্ম-বলে বলিষ্ঠ—পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র গরিষ্ঠ ছিল। আর তাই কোন বিষয়ে—ভারতবর্ষ পরমুখপ্রেক্ষী ছিল না;—সকল বিষয়েই স্বনির্ভরে সমর্থ ছিল।

কিন্তু এখন তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন কর্ম্ম-ভূমির কর্ম্ম-লোপ হওয়ায়, ভূমিমাত্র অবশিষ্ট আছে। কাজে কাজেই ভারত-বাসীকে এখন অশন বসনপ্রভৃতি জীবনধারণের প্রত্যেক বিষয়ের জন্যই পরমুখপ্রেক্ষী হইতে হইয়াছে। পরমুখপ্রেক্ষাই যাবতীয় দুঃখ যন্ত্রণার মূল! আর তাই আমাদিগকে অনুক্ষণই দুঃখ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের দেশের অনেক লোক মোহের আবর্ত্তে পড়িয়া, পাশ্চাত্য-প্রথার অনুকরণ বা অনুসরণ করিতে সর্ব্বদাই সমুৎসুক;—আর সেই অনুচিকির্ষা বা অনুসিসীর্ষার বশে তাহারা এমনই বিকৃত হইয়াছে যে, আর সে দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগের উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। যেমন পিত্তদোষবিকারে লোক শ্বেত পদার্থে পীতবর্ণ দেখে—শ্বেতবর্ণ বুঝিতে পারে না, অনেক সেইরূপ বিকৃত দর্শনে সুখ-দুঃখের স্বরূপোপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। কিন্তু পূর্ব্বে ঐ বিকৃতপিত্ত ব্যক্তির উক্ত পদার্থকে শ্বেতবর্ণ বলিয়া জ্ঞান থাকিলে, যেমন সেই পীত-বর্ণ-দর্শন তাহার পিত্তদোষ বিকারের জন্য, ঘটিয়াছে, তাহা স্বতই বুঝিতে পারে, সেইরূপ সেই ব্যক্তি পূর্ব্বে ভুক্তসুখ হইলে, এই বিকারজ সুখানুভব প্রকৃত সুখানুভব নহে, তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান নব্যগণ সকলেই প্রকৃতপক্ষে অভুক্তসুখ; সুতরাং জন্মাবধি বিকৃতপিত্তের ন্যায় শ্বেতের—প্রকৃত সুখের—উপলব্ধি করিতে যে, অসমর্থ, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য।

এখন অশন বসন বিলাসসাধন প্রভৃতির জন্য, যে, আমরা পর-মুখপ্রেক্ষী হইয়া, ভীষণ দুঃখ যন্ত্রণার ভোগ করিতেছি, তাহা অনেক বার অনেক প্রবন্ধেই আমরা দেখাইয়াছি। বৈদেশিক অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় পড়িয়া, দেশীও শিল্পাদি যেমন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিযোগিতায় পড়িয়া, দেশীয় শিক্ষা যেমন ব্যবহৃত হইতেছে, বিদেশী চিকিৎসার প্রতিযোগিতায় পড়িয়া, চিকৎসা সেরূপ ব্যহত বা লুপ্তপ্রায় হয় নাই। ধর্ম্ম যেমন ক্ষণভঙ্গুর কাচের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ বা লয়শীল নহে,—জগতের সহিত নিত্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, আমাদিগের দেশের সহিত আয়ুর্ব্বেদের সেইরূপ নিত্য সম্বন্ধই দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা অনুশীলন চলিতেছে। অদ্য এই চিকিৎসাবিষয়িণী বৈদেশিকী প্রতিযোগিতার কথাই আমাদিগের আলোচ্য।

দেশের ভৌতিক বিকারবশে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রসর উত্তরোত্তর বর্দ্ধমানই দেখা যাইতেছে। আবার গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় দার্জ্জিলিঙ্গের জরঘ্ন কুইনীনের প্রসূতিবৃদ্ধিও নিতান্ত কম নহে। কিন্তু ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে বা নিজমতে এই বিদেশাগত নূতন কুইনীনের ব্যবহার করিয়া, জ্বরের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে কেহই যে, সমর্থ হইতেছেন না, তাহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আশু ফলপ্রদ কুইনীন-দ্বারা জ্বরের প্রশমন হইলেও, অনেক সময় স্বাস্থ্যবোধ হয় না; পরে আবার উক্ত জ্বররোগে আক্রান্ত হইলে, লোকে তখন দেশের জল হাওয়ার দোষখ্যাপন করিয়া, বৈদেশিক চিকিৎসদিগের নির্দেশমতে স্থান বা বায়ুর পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। পরে আবার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আশ্রয়ও লইয়া থাকে। তখন ফল পাইলে—ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণরূপ মুক্ত হইলে,—পুরাতন ব্যাধিতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই সম্পূর্ণ উপযোগিনী বলিয়াই ঘোষিত হইতে শোনা যায়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে, নূতন পুরাতন সকল ব্যাধিতেই সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা আমাদিগের প্রকৃতির উপযোগিনী, তাহার অন্যথাখ্যাপন করিবার যো নাই।

আবার পাশ্চাত্য চিকিৎসার ঔষধগুলির টিঞ্চার (Tincture) এসিড (Acids) প্রভৃতির জন্য, দেশীয় ডাক্তারদিগের পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। আর এই পরমুখপ্রেক্ষার জন্য, স্থানে স্থানে ডাক্তারদিগের যেমন লাঞ্ছনা—রোগীর রোগ-প্রশমনেতেমনই বিড়ম্বনার এক শেষ হইয়া থাকে। দেশে পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রে শিক্ষানুশীলন বাড়িলেও, পাশ্চাত্য ঔষধাদির প্রণয়ন করিবার যথেষ্ট কারবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু আমাদের একান্ত অনুকূল অব্যর্থ ফল আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের প্রত্যেক উপাদান যে দেশেই পাওয়া গিয়া থাকে,—কখন সংগ্রহের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না, তাহা অভিজ্ঞমাত্রেরই বিদিত। আর দেশে অশেষফল বনৌষধির গুণাগুণ শাস্ত্রকথিত, সুতরাং শাস্ত্রদর্শীদিগের পরিচিত থাকাতে, ভিক্ষুক-বেশে পাশ্চাত্যদিগের মুখাপেক্ষা করা কেন? নিজের ঘরে অনুসন্ধান করিলে,—আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষানুশীলন করিলে,—দেশের ও তোমার যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতে পারিবে।

যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র ব্রহ্মবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বোধ হয় নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিবেন, আয়ুর্ব্বেদও ব্রহ্মবাক্য। যাঁহার অসীম শক্তিবলে এই বিশাল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহার সৃষ্টিকৌশলের বিন্দু মাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলে, শাস্ত্রপ্রবেশনিপুণ বুধগণ নিঃস্পন্দ ও অবাক্ হইয়া থাকেন, সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মা জাগতিক জীবগণের হিতবিধানার্থক আয়ুর্ব্বেদ ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী দেবদেব সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমৎসদাশিবও তন্ত্রে আয়ুষ্কর অমোঘ বহু ঔষধেরই ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। পরে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগের অলৌকিকী শক্তিদ্বারা সেই ব্রহ্ম-বাক্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া যে সকল সংহিতার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও বিদ্যমান। আর সেই সকল অপ্রামাদিক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞতালাভ করিয়া, ভিষগ্‌গণ যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতে দেশীয় ভেষজে পূর্ব্বপুরুষগণের শরীররক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাঁহা-দের বংশধর—আয়ুর্ব্বেদবিশারদ চিকিৎসকগণ আমাদিগের আরোগ্য-বিধানে সমর্থ না হইবেন কেন? যদি সমর্থ হন তবে সেই সকল [illegible]

ভিষক্ বা শাস্ত্রবিহিত ভেষজে উপেক্ষা করিয়া, কেন আমরা বৈদেশিক চিকিৎসায় অনুরাগী হইতেছি?

হিন্দুরাজগণ পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ভিষগ্‌গণের ব্যবস্থানুসারে আরোগ্য-মন্দির—হাঁসপাতাল—প্রতিষ্ঠিত রাখিতেন;—এবং ঐ সকল ভিষগ্ দ্বারা যথারীতি ঔষধাদিরও প্রণয়ন করাইতেন। অতি অল্প কাল পূর্ব্বেও দেশীয় ধনিগণ বাটীতে বৈদ্য রাখিয়া, তাঁহাদিগেরদ্বারা যথাশাস্ত্র ঔষধ ও তৈলাদি প্রস্তুত করাইয়া, স্বপরিবারবর্গের ও অন্যান্য লোকের ভীষণ কষ্টপ্রদ ব্যাধির প্রশমন করিয়া, ধর্ম্ম যশঃ ও স্বচ্ছন্দতালাভ করিতেন। সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতে কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অকৃত্রিম ঔষধাদির প্রণয়ন ও ব্যবহার চলিতেছিল,—তখন ফললাভও যথেষ্ট হইত। কিন্তু এখন যে, অকৃত্রিম ঔষধ না পাওয়া যায়, এমন নহে; অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজের নিকট এখনও যথাশাস্ত্র প্রস্তুত ঔষধ-তৈলাদি পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রায় কোন ধনী ব্যক্তিকেই এখন আর স্বদেশবাসীর হিতকল্পে—আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষানুশীলনে—কি চিকিৎসাপরিচালনে সাহায্য করিতে দেখা যায় না। অধিকন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদেশীয় ঔষধাদির বিতরণে—হাঁসপাতাল স্থাপনে—কৃতপ্রযত্ন হইতে অনেক ধনীকেই দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত অবধানতার সহিত দেখিলে, ইহাও স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, এইরূপ আরোগ্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠায় উদ্দেশ্যের সিদ্ধি না হইয়া, বরং বিপর্য্যয়ই ঘটিতেছে। কারণ, তাহাতেও পরমুখপ্রেক্ষার হাত এড়াইবার যো নাই! কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝা উচিত—সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্। সর্ব্ব প্রকার আত্মবশ কর্ম্মেই সুখ। আত্মবশ-কর্ম্মের—আত্মসাধ্য কর্ম্মেরই—সাধনে সাধারণের সচেষ্ট হওয়াই উচিত। এইজন্য স্বদেশোপযোগিনী চিকিৎসার উন্নতিকল্পে, কিছুদিন হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় আরোগ্যমন্দির ও বিদ্যালয়ের সংস্থাপনের কল্পনা হইতেছিল; উদ্যোগ আয়োজনেরও আভাস পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের [illegible] দিগের মধ্যে কেহ কাহারও [illegible] [illegible] করিবার জন্য, [illegible]; কেহ বা কর্তৃত্ব করিয়া

বাগীশত্বের পরিচয় দিতেছেন—লোক-সমাজে বাহবা পাইয়া, আপনাকে সফলজন্মা মনে করিতেছেন। এবং এই হুজুকে বক্তৃতার মোহে মুগ্ধ হইয়া অনেকে শূন্যমনাঃ হইতেছে। নিত্য নূতন হুজুক উঠিলে,—নিত্য লোক-মনোমুগ্ধকরী বক্তৃতা হইলে—নিত্যই নব নব দেশহিতকর কার্য্যের উদ্ভাবন হইলে, কয় জন কয়টা কার্য্যের অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন? কিন্তু নব নব উদ্ভাবিত কার্য্যগুলির মধ্যে কোনটীর অনুষ্ঠানে কতটুকু দেশহিত সাধিত হইবে,—তন্নিহিত হিতের তারতম্যানুসারে কোনটীর অনুষ্ঠান প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা স্থিরকরা অতীব দুরূহ। কিন্তু আমরা এস্থলে বলিতে পারি,—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গলাভের মূলই হইতেছে আরোগ্য। সুতরাং মানবগণের যাবতীয় অনুষ্ঠেয়ের মধ্যে যাহাতে আরোগ্যবিধান করা যায়, তাহাই হইতেছে, মনুষ্যগণের প্রথম ও প্রধান অনুষ্ঠেয়! সুতরাং যাবতীয় সদনুষ্ঠানের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা—দেশে আরোগ্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করা—দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

কিন্তু আবার অনেকে বলেন, দেশীয় চিকিৎসকেরা অস্ত্রচিকিৎসায় নিপুণ নহেন, আর তাই দেশীয় কবিরাজ মহাশয়দিগের দ্বারা যাবতীয় রোগের চিকিৎসা হইতে পারে না;—পাশ্চাত্যপ্রথানুসারে শিক্ষিত ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক সকল রোগেরই চিকিৎসা হইতে পারে; সুতরাং ডাক্তারখানার প্রতিষ্ঠা, আয়ুর্ব্বেদীয় আরোগ্যমন্দিরপ্রতিষ্ঠার অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদা। কিন্তু তাঁহাদের এ উক্তি সম্পূর্ণই ভ্রমময়ী। আমাদিগের দেশীয় অনেক জাতির মধ্যে পুরুষানুক্রমে অস্ত্রচিকিৎসার নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চাঁদসীর চাণ্ডালপরিবার বহুকাল হইতে দেশীয় গ্রন্থের মতানুসারে অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের অস্ত্রচিকিৎসা ও ক্ষতচিকিৎসা আজও লোকপ্রসিদ্ধ। অনেক সময় অনেক ক্ষতচিকিৎসায় খ্যাতনামা সিবিলসার্জ্জনদিগকেও অফলকর্ম্মা হইতে দেখা যায়; আবার ঐ চাণ্ডালদিগের চিকিৎসায় সেইরূপ কোন রোগী সম্পূর্ণ

নীরোগ—অক্ষতদেহ হইয়াছে, বড় বড় অস্থি কাটিয়া তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষত সারিয়া দিতেও দেখা গিয়াছে। আবার রাজসাহী বোওয়ালিয়ার কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুরশিদাবাদে পূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ৺ গঙ্গাধর রায় কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চরক সুশ্রুতাদির অধ্যয়ন করিয়া, সুশ্রুত সম্মত অস্ত্রচিকিৎসার ক্রমানুশীলনে রত আছেন। এখন অনেকের ছানী কাটিয়াও, চক্ষুরোগীর সুচিকিৎসা করিতেছেন। শোনা যায়, মোলেন প্রভৃতি বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ চিকিৎসকগণও তাঁহার অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। সুশ্রুতসম্মত অস্ত্রচিকিৎসা করিতে আরও দুই একটী লোককে দেখিতে পাওয়া যায় তবে এখনও চেষ্টা করিলে, আয়ুর্ব্বেদের পুনরালোচনায় দেশেরও দশের উপকার সাধিত হইতে পারে; আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় যাবতীয় রোগেরই প্রশমন হইতে পারে, ইহা স্থির। কোন বৈদ্যকগ্রন্থে কথিত হইয়াছে ;—

"আয়ুষ্কাময়মাণেন ধর্ম্মার্থসুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥"

ধর্ম্ম অর্থ সুখপ্রভৃতির সাধন করিতে হইলে, আয়ুঃ প্রয়োজনীয়। আর আয়ুষ্কামনাকারী লোকের আয়ুর্ব্বেদীয় উপদেশে পরমাদর করা বিধেয়। আয়ুর্ব্বেদে যাবতীয় রোগ চিকিৎসাদিরই কথা কথিত হইয়াছে। যাহাতে সেই বৈদ্যকগ্রহন্থের শিক্ষানুশীলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও প্রস্থতি পাইতে থাকে,—যাহাতে দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ভূয়ঃপ্রচার হইয়া, দেশীয় বনৌষধিবর্গে দেশীয় ঔষধ প্রস্তুত হইয়া, লোকের শরীররক্ষা হয় যাহাতে চিকিৎসাবিষয়ে দেশ স্বনির্ভরে সমর্থ হয়, তাহার চেষ্টা করা স্বদেশহিতৈষী লোকমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য ও একান্ত অনুষ্ঠেয়। আর তাহার সাধনে সমর্থ হইলেই, দেশ স্বনির্ভরে সমর্থ হইবে—সুতরাং দেশের দশেও প্রকৃতিসুখের—আরোগ্যের—উপভোগে সক্ষম হইবে। এখন এই মহদুদ্দেশ্য সাধিতে সকলেরই—বিশেষতঃ স্বদেশহিতৈষী ধনকুবেরদিগের—সচেষ্ট হওয়া যে, উচিত, তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার্য্য।

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।

মৎস্য-নর-নারী।

"নির্ব্বোধেরা যাহা শুনে তাহাই বিশ্বাস করে,—সম্ভব অসম্ভবের প্রতি কিছু মাত্র বিবেচনা করে না",—অনেক বিবেচক ব্যক্তি সময়ে সময়ে এইরূপ কহিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বলি,—মনুষ্যের দোষ নাই;—এই জগতই মনুষ্যকে নির্ব্বোধ করিয়া রাখিয়াছে; মনুষ্য কি করিবে? চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ এড়াইতে পারে না। যাহা দেখে, যাহা শুনে, তাহা অসম্ভব হইলেও অলীক বলিতে পারে না। এইরূপে দেখিতে শুনিতে যখন অবিশ্বাসের গ্রন্থি সকল একে একে খুলিয়া যায়, তখন তাহার নিকট আর কিছুই অসম্ভব বোধ হয় না। তখন সে অকপটে স্বীকার করে, "হে জগদীশ্বর! তোমার আশ্চর্য্য-রচনার শক্তি অসীম; মনুষ্যের ক্ষুদ্র চিত্তের বিশ্বাস, যখন সে সকল আশ্চর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না, তখন মনুষ্যের বুদ্ধি তাহাতে কিরূপে প্রবিষ্ট হইবে?" আমরা নিম্নে যে আশ্চর্য্য জীবের বিবরণ প্রকটিত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া অনেক বুদ্ধিমান্ পাঠকের হৃদয়ে ঐ ভাব জাগরূক হইতে পারে;—"হে জগদীশ্বর! তোমার আশ্চর্য্য রচনার শক্তি অসীম"।

ওলন্দাজদিগের দেশের ভূমি অতি নিম্ন; তন্নিমিত্ত জলপ্লাবন নিবারণার্থে তথাকার সাগর কূলে অতি দৃঢ় মৃত্তিকার প্রাচীর-শ্রেণী বিনির্ম্মিত আছে। ইংরাজি ১৪৩০ অব্দে ঐ দেশে একটি প্রবল ঝটিকা হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীরমালার কিয়দংশ স্খলিত হওয়ায় নিকটবর্ত্তী ভূমিভাগ সমুদ্রজলে আপ্লাবিত হইয়াছিল। এক দিবস কতিপয় স্ত্রীলোক নৌকারোহণে ঐ প্লাবিত স্থান পার হইবার সময়ে সহসা জলোপরিভাগে একটি মনুষ্যের মস্তক দেখিতে পাইল। তাহারা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিকটে যাইয়া দেখিল, একটি সুন্দরী নারী ঐ অনতি গভীর নীরে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। নাভির উপরিভাগ হইতে ঐ নারীর সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানবীর ন্যায়, কিন্তু নাভির অধোভাগে চরণের পরিবর্ত্তে মৎস্যের আকার মাত্র। বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া স্থল-নারীরা ঐ জল-

নারীকে হার্‌লাম নগরে আনায়ন করিল। নগরের শাসনকর্ত্তা তাহার বাসের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট এবং পরিচর্য্যার নিমিত্ত একটী স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সযত্নপালনের বশবর্ত্তিনী হইয়া, নীর-নারী ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের অনেক আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল;—মনুষ্য-ভোগ্য দুগ্ধ ও রুটি আহার করিত, স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ পরিধান করিত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সূতা প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। খৃষ্টিয়ানগণের অনুকরণে মৎস্যনারী, ক্রুশ দেখিলে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিত এবং তাহার ভাব ভক্তি দেখিয়া লোকে অনুমান করিত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে তাহার কোনরূপ সংস্কার থাকিতে পারে। কিন্তু জল-ললনা মনুষ্যের ভাষা শিক্ষা করিতে সক্ষম হইল না, সুতরাং তাহার মনের ভাব মনুষ্যলোকে কিরূপে প্রচার হইবে?

হার্‌লাম নগরে ঐ নারী ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। তাহার মৃত্যু হইলে পর মৃত খৃষ্টিয়ান মনুষ্যকে যেরূপে গোর দেয়, তাহাকেও সেই প্রণালীতে হার্‌লামবাসীরা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়াছিল।

১৬১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন রিচার্ড হুইট্‌বোর্‌ণ্ সাহেব সেণ্ট-জন-হার্‌বর নামক সমুদ্র-শাখায় একটী মৎস্যনারী দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি কহেন—দূর হইতে ঐ নারীর মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ রেখাকার দৃষ্ট হইয়াছিল;—বোধ হয় ঐ কৃষ্ণবর্ণ রেখা আর্দ্র কেশজাল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন নাই, যেহেতু জলনায়িকা নিকটবর্ত্তিনী হইবামাত্র কাপ্তেন ভয়ে পালায়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে সমুদ্রসুন্দরী আর এক নৌকার নিকটে যাইয়া তুষারধবল একখানি হাত তুলিয়া ঐ নৌকার পার্শ্বদেশে ধারণ করিয়াছিল, তদ্দর্শনে নৌকার লোকেরা ভয় পাইয়া দণ্ডদ্বারা তাহার করে আঘাত করায় সে তথা হইতে পলায়ন করে। তদনন্তর ঐরূপে অন্যান্য নৌকার সমীপস্থ হইয়াছিল। এই ঘটনায় তথাকার সমুদয় নৌকার লোকেরা ভয় পাইয়া তীরে অবতীর্ণ হয়, সুতরাং সেই নীরাঙ্গনার আর কোন সন্ধান হয় নাই।

ইংরাজী গ্রন্থে নীরনারীর এই সকল বিবরণ পাঠ করিবার পূর্ব্বে দেশীয় কোন ব্যক্তির মুখে আমরা শুনিয়াছিলাম যে, জলমধ্যে পরম রূপসী রমণীগণ বাস করে, স্থল-পুরুষের প্রতি তাহাদিগের অতিশয় আসক্তি। সন্ধ্যাসমাগমে শীতল মলয়হিল্লোলে জলের উপরিভাগে প্রফুল্ল কমলতুল্য মুখ তুলিয়া তাহারা শীস্ দিয়া এরূপ সুমধুর স্বরে গান করে যে, তাহা শুনিলে স্থলপুরুষেরা উন্মত্ত হইয়া তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হয়, পরে কি ঘটনা হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। মৎস্যনারী নামে একখানি গ্রন্থ ইংরাজী ভাষা হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে,—বারি-বিলাসিনীরা কোন স্থল-পুরুষের প্রণয়পাত্রী হইতে পারিলে অমরত্ব লাভ করিতে পারে। অমরত্বের লোভে একটি নবীনা নীরকামিনী একজন স্থলপুরুষের প্রেমাবিনী হইয়াছিল। এই কল্পিত আখ্যায়িকা উক্ত গ্রন্থে অতি বিচিত্র-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপতঃ নীরমধ্যে নারীর বাস, এ বিষয়ে আমাদিগের বিশ্বাসই ছিল না; মনে করিতাম, এ কেবল কবির কুহক মাত্র। এক্ষণে তাদৃশ জীবের অস্তিত্বে আর আমাদিগের অপ্রত্যয় নাই। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত কাপ্তেন হুইট্‌বোর্‌ন্ সাহেব যে জলনারী দৃষ্ট করিয়া, এক নৌকায় প্রহার খাইয়াও তাহার অন্য নৌকায় যাওয়ার সমাচার এবং পূর্ব্বোক্ত প্রবাদশ্রুত স্থলপুরুষের প্রতি জল-নারীর স্বতঃসিদ্ধ আসক্তি থাকার বিবরণ ও মৎস্যনারী-গ্রন্থেও সেইরূপ মর্ম্মের বর্ণনা, এই তিন বিষয়েই পরস্পর পরস্পরের প্রতিপোষক। স্বরূপতঃ স্থলনায়কের প্রতি জলনায়িকার স্বতঃসিদ্ধ প্রেমভাব আছে, অথবা তাহার মাংসভোজনার্থে তাহাকে তদ্রূপে আকৃষ্ট করে, এ বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতপ্রবাদের পোষাকতায় এস্থলে ইহা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য যে, হোমর নামে প্রাচীন গ্রীক কবি "অডেসি" অভিধেয় যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে পাঠ করা যায় যে, সিসিলি নামক দ্বীপের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে তিনটি সিন্ধু-নায়িকা বাস করিত। তাহারা কোন তরণী দেখিতে পাইলে এরূপ মধুর স্বরে গান করিত যে, যাত্রীরা তরীর গতি স্থগিত করিয়া গীত শুনিতে

শুনিতে আহার ইত্যাদি অতি আবশ্যক কার্য্যও বিস্মৃত হইয়া থাকিত; তন্নিবন্ধন অবশেষে উপবাসে তাহাদিগের জীবনান্ত হইত। হোমর কবির নায়ক "ইউলিসিস্" নামক রাজা অতি বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি ঐ স্থান পার হইবার সময়ে নাবিকগণের কর্ণকুহর এরূপ নিবিড়রূপে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা ঐ গীত শুনিতে না পায়; পরে আপনার শরীর জাহাজের মাস্তুলের সহিত অতি দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখেন। ঐ সঙ্কটাপন্ন স্থলে তরণী উপস্থিত হইলে, সিন্ধু-সুন্দরীগণের কলকণ্ঠের গীত শুনিয়া ইউলিসিস্ অতি মাত্র ব্যাকুল হইয়া নাবিকগণকে তরণীর গতি স্থগিত করিতে বারম্বার আদেশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বধির-ভাবাপন্ন নাবিকেরা ঐ গীত, বা তাঁহার আদেশ, কিছুই শুনিতে পাইল না; সুতরাং নৌকা ক্রমে ক্রমে ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিল। ইউলিসিসের শ্রবণ বিবর বদ্ধ ছিল না, তিনি বুদ্ধির বলে গীতও শুনিলেন, প্রাণেও বাঁচিলেন। কথিত আছে, ইউলিসিস্‌কে বিমোহিত করিতে না পারিয়া ঐ তিন রমণী ক্ষোভে সাগরনীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। শীস্ দিয়া মৎস্যনারীর পুরুষ আকর্ষণের প্রবাদ এবং হোমর কবির সিন্ধুনায়িকার এই বর্ণনা, এক মূল হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, অথবা উভয়েই অমূলক; তাহার মীমাংসার ভার পাঠকগণের নিজ নিজ বুদ্ধির প্রতি সমর্পিত রহিল।

মৎস্য-নারীর সম্বন্ধে আমাদিগের আর কিছু বলিবার নাই। মৎস্য-পুরুষসম্বন্ধে শ্রুত হওয়া যায় যে, ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সসেক্স প্রদেশের সমুদ্রে একটি মৎস্য-পুরুষ ধৃত হইয়াছিল। ঐ পুরুষ অনেক বিষয়ে স্থলপুরুষের ন্যায় আচরণ করিত, কেবল কথা কহিতে পারিত না। মৎস্য-পুরুষ ধৃত হইয়া ছয় মাস কাল মাত্র জীবিত ছিল।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে এই জাতির দুইটি শাবক দৃষ্ট হওয়ার বিবরণ ইংলণ্ডের একখানি সংবাদপত্রে এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়;—ইংলণ্ডের সন্নিকটে আইল অব্ ম্যান নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তথাকার তিনজন বণিক জলবিহঙ্গ শিকার করিবার মানসে সমুদ্রের খাড়িতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে বিড়ালশাবকের ধ্বনির ন্যায় কোন জীবের শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা চতুর্দ্দিকে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে

লাগিলেন। স্থলের অনতিদূরে একটি শৈলের গহ্বরমধ্যে দেখিলেন, অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধ মীনাকার দুইটী ক্ষুদ্র জীব রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি গতজীবন অবস্থায় ধরাপরে নিপতিত রহিয়াছে, অপরটি বিড়াল-শিশুর ধ্বনিতে রোদন করিতেছে। মৃতটির শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বরাত্রে তথায় প্রবল ঝড় হইয়াছিল, বোধ হয় তাহাতেই তরঙ্গের আঘাতে ক্ষতাঙ্গ হইয়া তাহার জীবনান্ত হইয়াছিল। জীবিত শিশুটিকে তাঁহারা আপনাদিগের নিবাসস্থান ডগ্‌লাস নামক নগরে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহার শরীরের পরিমাণ মস্তক হইতে পুচ্ছ-প্রান্ত পর্য্যন্ত কিঞ্চিন্ন্যূন ৩ফুট; স্কন্ধদেশের বিস্তার ৫ ইঞ্চি. ত্বক তরল পাটল বর্ণের এবং পুচ্ছভাগের শল্ক সমুদয় ঈষৎ রক্ত বর্ণ। চুলগুলি-নীলবর্ণের, প্রায় ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ, এবং মস্তক হইতে মুখমণ্ডলে আলুলায়িত হইয়া রহিয়াছে। স্পর্শ করিলে চুলগুলিতে আঠার ন্যায় অনুভব হয়;—সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী শৈলোপরি যে একপ্রকার শৈবাল জন্মে, চুলগুলি দেখিতে প্রায় সেইরূপ। মুখের ছিদ্র ক্ষুদ্র, তন্মধ্যে দন্ত নাই। শাবকটিকে জলের টবে রাখা হইয়াছিল, তন্মধ্যে সে পরমানন্দে সন্তরণ করিত। চিংড়ি মৎস্য পাইলে পুলক প্রকাশে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিত, এবং পেনকলমের মধ্যে পূরিয়া দুগ্ধ ও জল মুখের নিকটে ধরিলে তাহাও পান করিত। যে সময়ে সংবাদপত্রে এই বিবরণ লিখিত হয়, তখনও শাবকটি জীবিত ছিল, পরে কোন্ সময়ে মরিয়া যায়, তাহার কোন সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

স্মরণ করা উচিত, উপরে শরীরের যে বর্ণনা করা হইল. তাহা শাবক শরীরের বর্ণনা। পূর্ণাবস্থায় শরীরের পরিমাণ কিরূপ হয়. পূর্ব্বোক্ত বর্ণনায় তাহার নিশ্চিত নিরূপণ হয় না। অধিকন্তু মৎস্যজাতীয় নরনারীরা কিরূপে অপত্য উৎপাদন ও প্রসব করে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তাহাদিগের মল মূত্র ত্যাগের যন্ত্র, শরীরের কোন্ স্থানে কি আকারে আছে, সংগৃহীত বিবরণে তাহার কোন উল্লেখ না থাকার কারণ বোধ হয়, কি? সভ্য সংগ্রহকারকেরা অশ্লীল বোধে তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

এই বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকের মৎস্যাবতারের কথা স্মরণ হইতে পারে, কিন্তু পুরাণ প্রমাণে মৎস্যাবতারে ভগবান অবিকল মীনশরীর ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদিগের বর্ণিত অর্দ্ধ নর, অর্দ্ধ মীনাকায় জীব, তাঁহার বংশমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না! মৎস্যাবতারের বিপুল মীন-কলেবরের ললাটদেশে বিশাল বিষাণ ছিল;—তদ্ভিন্ন সাধারণ মৎস্যের সহিত তাঁহার অবয়বগত আর কোন প্রভেদ ছিল না। "প্রলয়পয়োধিজলে" পৃথিবীপিণ্ড পিণ্ডালুর ন্যায় নিমগ্ন হইলে, হিমাচলের উপরিভাগে ভাসমান সত্যব্রত মনুর তরণী, বাসুকিরজ্জুর যোগে ঐ শৃঙ্গমূলে নিবদ্ধ হইয়াছিল। এই মহান্ বিষয়ের সবিস্তার বিবরণ যাঁহারা জ্ঞাত হইতে চাহেন, তাঁহারা মৎস্য পুরাণ পাঠ করিয়া দেখিবেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

প্রণয়।

জাগরূক স্বপ্ন এক অবনী মাঝারে
বাজায় হৃদয়তন্ত্রী বীণা ল'য়ে করে;
শুনে সে মধুর তান দুইটী জীবন
অজ্ঞাত স্মৃতির ডোরে বাঁধেরে তখন।

সঙ্গীত কবিত্বময় কোন এক দেশে
পরাণ উড়িয়া যায় যেন কা'র আশে;
দিবানিশি মনে পড়ে কা'র মুখখানি
দুঃখময় জগতের আনন্দের খণি।

কৌমুদীর কমনীয় স্নিগ্ধ মধুরতা,
তারকার মালা আর বায়ুর বারতা,
আবেগ লহরী ভরা প্রথম মিলন,
ধীরে জাগাইয়া তুলে অতীত স্বপন।

স্বর্গীয় মোহন মন্ত্র চিরদিন তরে,
পার্থিব বাসনা যত সব নেয় হ'রে।
এক আশা ঊর্দ্ধশ্বাসে চলে অবিরাম
মরণের পরপারে করিতে বিশ্রাম॥

যবে তারা ঝড়ে পড়ে সরমের ভারে,
জীবনের মহাব্রত উদযাপন ক'রে,
দেব দেবীগণ সহ একত্রেতে মিলি,
বিরাজে অনন্ত পাশে স্বরগ উজলি।

শ্রীমনোমোহন গুহ।

বহুদিন পরে।

আমি ভাবি ভাবি এই হৃদয়ে
শত বিরহ মাখান বয়ানে—
র'ব দুয়ারে তোমার দাঁড়া'য়ে
তুমি চিনিবে কি ? তা'ত জানিনে।
আমি হৃদয় সাগর রোধিয়া,
রব মুখপানে তোমা চাহিযা,
যদি হৃদয়ের কোন কোণেতে
আজও প'ড়ে থাকি—খুঁজে দেখিও ;
যদি ভাল লাগে যদি মনে পড়ে
চোখে পুরাণ করুণা ফুটা'য়ো
নহে অবাক অচেনা চেয়োনা
আমি দাঁড়া'ব না সেথা জানিও।
যদি হৃদয়ের বেলা উথলি ;
দু'টী আঁখি জল পড়ে উছলি
তাহে আপনার মুখ দেখিও
যদি ব্যথা পাও তবে মুছা'য়ো।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

অনুশীলন—"পুরোহিতের" অস্তিত্ব লোপের পর গত আশ্বিন মাস হইতে "চোরবাগান ইউনিয়ন লাইব্রারী" হইতে উক্ত নামে আর একখানি মাসিকপত্র পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইতেছে। মাঘের সংখ্যা পর্যন্ত আমরা পাইয়াছি। এই কয় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি মন্দ হয় নাই। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত "বঙ্গভূমির ইতি বৃত্তি" বেশ সুখ পাঠ্য হইয়াছে।

তাঁহার লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত দুইটীও বেশ। আমার সর্ব্বান্তঃকরণে 'নব-সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ধরণী— মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। ইহাতে দুই একজন বঙ্গ সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত মহোদয়ের লেখনী প্রসূত প্রবন্ধ দৃষ্ট হইল। "সাঁওতাল পরগণার অভাব ইত্যাদির কথা"—ধরণীর বিশেষত্ব রক্ষা করিতেছে। আমরা ধরণীর ক্রমোন্নতি কামনা করিতেছি।

জ্যোৎস্না—এখানি একখানি নব-প্রকাশিত মাসিকপত্রিকা। গত আশ্বিন হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ফাল্গুনের সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। জ্যোৎস্নার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি মন্দ হইতেছে না। "রামকৃষ্ণ অবতার কি না ?" শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত কৃত পুস্তিকা হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে কেন, বুঝিতে পারিলাম না। কারণ উহা সকলেই অবগত আছেন। যতটা স্থান উক্ত কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে তাহা অন্য কোন নব বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে অনেকটা উপকার দেখিত বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক জ্যোৎস্নার আরও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা

মরকতে "দোকড়ি দত্ত"—কবি-কুল-কোকিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতী" নামক মাসিকপত্রিকায় ইহা পূর্ব্বে প্রকাশ করেন। পরে "মরকতের" কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতেছেন, নট-চূড়ামণি মুস্তফি সাহেবের দোকড়ির অভিনয়ে সকলেই পুলকিত ও বিমোহিত হইয়াছিল। আমরা সাধারণকে একবার "দুকড়ি দত্তের" অভিনয় দর্শনে অনুরোধ করি।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

২য় খণ্ড। } চৈত্র, ১৩০১ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

সিংহাসনে সন্ন্যাসী।

দরিদ্রের সংসার বাসনায় বীতানুরাগত্ব সর্ব্বদা ততদূর গৌরব ও প্রতিপত্তির বিষয় নহে। বিলাসের দ্রব্যাদির অভাব, সময় সময় দরিদ্রতার ছায়ায় জন-বিশেষের হৃদয়ে বৈরাগ্য-কুসুম বিকসিত করে বটে, কিন্তু সচরাচর স্বভাবে উহা পরিলক্ষিত হয় না। প্রলোভন সংসার-পথের কণ্টক-স্বরূপ; সুচতুর পথিক নিষ্কণ্টকে পদচারণ করিবার জন্য সর্ব্বদা সাবধানে সংসারপথে পরিভ্রমণ করতঃ নির্ব্বিবাদে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। প্রকৃতির প্রতি বিহারে নয়ন নিক্ষেপ কর, দেখিবে, কণ্টকের পথ নিরোধ। গগনমণ্ডলে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি কিরণ বিতরণ করিতে করিতে সময় সময় ঘনমেঘাবৃত হইয়া, আলোক প্রদানে বিরত থাকে; মারুত-প্রবাহ সমুদ্রের সরল ও দ্রুতগতির প্রতিরোধ জন্মায়; অম্লজান অনলের পরম-বন্ধু হইলেও, বায়ুর প্রবাহে মিশ্রিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলে; সরোবরে পরম রমণীয় প্রফুল্ল কমল-দল দর্শনে, প্রাণ মন ভুলিয়া যায়; কিন্তু উহাকে মৃণাল হইতে বিচ্যুত করিতে যাও, দেখিবে কণ্টকের প্রতিরোধ। এইরূপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থলে অবিরত কণ্টকের বিরোধ; যেখানে বিরোধ সেই-খানেই পরীক্ষা; পরীক্ষার মন্দিরে সমস্যা এবং কৃতকার্য্যতাই জয় ও

বীরত্বের পরিচায়ক। অতএব প্রলোভন মানবজীবনের ধর্ম্মপরীক্ষা; বিলাসের বস্তুতেই বিহারাভিলাষ এবং উহার নিবৃত্তিই প্রকৃত আত্ম-সংযমের সাক্ষ্যদাত্রী ও মহত্ত্ববিজ্ঞাপিকা।

"To whom is glory justly due ?
Who, 'mid the joys that lure the sense
Lead lives of holy abstinence."

প্রকৃত গৌরব পায় কোন্ জন ভবে ?
থাকিয়ে বিলাস বাসে, কাটে দিন উপবাসে,
বিহার না করে, কভু বিলাস বিভবে।
সেই জন শোভে হায়! অতুল গৌরবে।

পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজিয়া দেখ, এরূপ মহাপুরুষ দুর্লভ। নয়ন-পথের বহির্ভূত বস্তুমাত্রেও যখন সচরাচর আমাদের চিত্ত প্রলোভিত ও ধাবিত, তখন নেত্রোপরি সাক্ষাৎ প্রতিভাত দ্রব্যের লালসা ও উপভোগ ত্যাগ—সহজ ও সম্ভবপর নহে। তজ্জন্যই, ভারতের ইতি-হাসে মহারাজাধিরাজ রাজর্ষি জনকের এত গৌরব, এত প্রতিপত্তি। ধর্ম্ম-জগতের শীর্ষস্থানীয় মিথিলাধীশ্বরের একটিমাত্র উপদেশ বৃত্তান্ত তাঁহার অপার চিত্ত-নিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সংযমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিয়াছে।——

কথিত আছে,—একদা শুকদেব তাঁহার নিকট যোগাভ্যাস করিবার সময়, তাঁহার অপার ঐশ্বর্য্য দর্শনে—"এরূপ সংসারী ব্যক্তি কিরূপে যোগী হইতে পারে?" মনে মনে এই প্রশ্ন করিতেছিলেন। যোগীরাজ স্বীয় যোগবলে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে পাঠবিরত করতঃ পরীক্ষাচ্ছলে, তৈলপরিপূর্ণ একটি পাত্র হস্তে করিয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের চতুর্দ্দিক এরূপভাবে পরিভ্রমণ করিতে আদেশ করিলেন, যেন এক ফোঁটা তৈলও মৃত্তিকায় পতিত না হয়। শুক-দেব তদীয় আদেশ প্রতিপালনার্থ তৈলপূর্ণ পাত্রহস্তে নগর পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে, মহারাজ তাঁহাকে রাজ্যদর্শন-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন,—"আপনার নিয়োজিত

কর্ম্ম সর্ব্বথা কর্ত্তব্য মনে করিয়া, পাত্রস্থ তৈলবিন্দু ভূপতিত না হয় এই বিষয়ে অনন্যমনা থাকায় নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরম রমণীয় দ্রব্য সমূহ দেখিয়াও দেখিতে পারি নাই। চক্ষু দেখিয়াছে বটে, কিন্তু মন গ্রহণ করিতে পারে নাই!" উত্তরে যথোচিত সন্তুষ্ট হইয়া রাজর্ষি বলিতে লাগিলেন ;—

"আমার চতুষ্পার্শ্বে এই যে বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি ও বিলাসোপহার বিরাজমান দেখিতেছ, এ সমস্তই আমার সম্পত্তি ও এতদুপভোগ আমার ইচ্ছাধীন। বাসনা মনের আয়ত্ব এবং বাহ্যজগতের দ্রব্য-সমূহের সহিত সুসংবদ্ধ। অন্তর্জগত ও বহির্জগতের যে সম্বন্ধ, দেহে ও আত্মাতে যে সম্বন্ধ, মন ও ইন্দ্রিয়াদিতেও ঠিক সেই সম্বন্ধ নিহিত আছে। দৃষ্টি নয়নের সামর্থ্য, বস্তু তাহার সম্পত্তি, কিন্তু তজ্জনিত প্রলোভন বাসনা-সম্ভূত। যতক্ষণ আমার দেহ, আমার মন, আমার দ্রব্যাদি বলিয়া ভ্রমের অঙ্কে ডুবিয়া থাকিবে, ততক্ষণই প্রলোভনের প্রভুত্ব। কিন্তু যদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ, আমার কিছুই নয় ; মন, প্রাণ, আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের সম্পত্তি একমাত্র ভগবানের ভাণ্ডারের ধন ; মন তাঁহার, বাসনা আমার কিরূপে হইবে? এই-রূপ ধারণা করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা যায়, তবেই মঙ্গল। এই পৃথিবীতে "আমার" বলিয়া যাহা তুমি জান ও দেখিতে পাও, সকলই একদিন ভগবানের চরণ-কমলে সমর্পণ করতঃ তাঁহারই দাস হইয়া, তাঁহার ভাণ্ডাররূপ বিশাল সাম্রাজ্যের প্রহরীভাবে জীবনের দিন যাপন করিতেছি। তৈলপাত্রে মন একান্ত অনুরক্ত থাকায় যেমন তুমি নগরস্থ দ্রব্যাদি দেখিয়াও দেখিতে পাও নাই, তদ্রূপ আমার হৃদয়ও অনন্যমনস্ক হইয়া সেই পরমপিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ও তাঁহার অপার মহিমায় বিমুগ্ধ থাকায় পার্থিব বিষয়ে ক্ষণমাত্রও আসক্ত হইতে পারে না। আমি দেখিতে রাজা ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী। বাস্তবিক আমি সন্ন্যাসী—দ্বারের ভিখারী। আমার সিংহাসন সামান্য আসন ব্যতীত আর কিছুই নহে। এস্থলে তুমি, আমি এবং পথের ফকির সকলেই সমান। আমি সিংহাসনে সন্ন্যাসী।"

"অনন্তং বতমেবিত্তং যস্য মে নাস্তিকিঞ্চন
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং নমে দহ্যতি কিঞ্চন
পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ামানুপসেবমানো
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দ পদারবিন্দং
সঙ্গীত বাদ্য কতিতানবশং গতাপি
মৌলিস্থ কুম্ভ পরিরক্ষণধীর্নটীব ॥"

শ্রীমধুসূদন সেন।

সাধ।

পৃথিবীর এক পারে,
অলস নদীর ধারে,
নিঝুম বনের মাঝে
বাঁধিব কুটীর ;

শ্যামল তৃণের 'পরে,
সখি ! তোর গলা ধ'রে,
নিভা'ব লুকান জ্বালা,
ফেলি' আঁখি নীর।

আমাদের পদমূলে,
নির্ঝর লহর তুলে,
লুকা'তে হৃদয়খানি
ফেলিবে প্রকাশি'—

মোর সরমে পালান শুনি'
করে ধরি' পা দুখানি
বলানা কাহারে সখি !
"বড় ভালবাসি !"

দু'জনায় রব বসি'
বকুল পড়িবে খসি'
ভাঙিব লতায় লাজ
উঠা'ব বকুলে ;

সাঁঝের পাখীর রবে,
ফুল যাই চোখ চা'বে,
বাঁধিব আচল তার
চাঁদের দুকূলে !

প্রকৃতিরে জাগাইব,
ভালবাসা শিখাইব,
ঢালিব প্রেমের কথা
বিজনের কাণে

উদিলে তারকা রাণী,
শিখা'ব সোহাগ বাণী,
বিরহ ভরিয়া দিব
ভ্রমর গুঞ্জনে !

ব'সে রব পাশা পাশি,
প্রাণে প্রাণে মিশা মিশি,
ভাষাহীন ভাবগুলি,
করিবে গো চলা-চলি,
নীরবেতে দু'জনার প্রাণে,

"বৌ কথা" তুলি' তান,
ভাঙ্গিবে প্রিয়ার মান,
মলয় চমকি' যা'বে
প্রেমের স্বপনে!

শান্ত নীল পারাবারে
ছায়া-পথ ধারে ধারে
জ্বেলে দিবে ভালবাসা
শত বাতীঘর,

দৃঢ়তর আকর্ষণে,
ঘুরিবে গো গ্রহগণে,
তারা ভগ্নী সম্মিলনে,
উঠিবে লহর।

মুখে মুখে র'বে পাখী,
গায়ে গায়ে র'বে শাখী
নয়নে নয়নে গাঁথা,
নিচল কানন-লতা,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যবে
ধরা পানে বিনা রবে
চেয়ে রবে প্রেমের নয়নে,

তা'রি মাঝে মোরা দু'টী প্রাণী
গেয়ে শুধু প্রেমের কাহিনী,
যুগ্ম ওষধির মত
ভালবাসা বিভাসিত
ঘুমাইব প্রেমের স্বপনে।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

দৈব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

---o---

হারাধন চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপে উমেশ বসু প্রায় প্রত্যহই যায় আসে, বসে দাঁড়ায়, গালগল্প করে, তামাক পোড়ায়, হয়ত হারাধন বাড়ী নাই জানিয়াও অন্দরের মধ্যে যায়, হাউ হাউ করিয়া বকে, হারাধনের স্ত্রীর সহিত কথা কয়, হাসে, ব'ট্‌কেরা করে—শুনিয়া পাঠক হয়ত [redacted] করিতে পারেন, 'কায়েতের ছেলে শুধু শুধু বামনের বাড়ীতে যায় [illegible] তলে তলে কিছু মতলব আছে, যাহা হয়ত হারাধন জানে

না।" কিন্তু বাস্তবিক উমেশের সে সব কিছু ছিল না। তবে যে সে যাইত, আসিত, সেটা সখ্যতার খাতিরে, এক গ্রামে বাস বলিয়া।" আর শুধু তাহাও নহে, উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক ও সমাবস্থাপন্ন। ইহা শুনিয়াও যদি সন্দিগ্ধমনা পাঠক সন্দিহান হন, মাথা নাড়েন ত নাড়ুন, আমাদের আপত্য নাই, আমরা ঘটনার অবতারণা করি। আর বলিয়া রাখি, হারাধন ও উমেশ আপনাদের মত এ কালের শিক্ষিত নহেন। একটু সেকাল ঘেঁসা, একটু খাঁটি বামন ও খাঁটি কায়েতের গন্ধওয়ালা।

যে সময়ে সূর্য্যদেব রক্তবস্ত্র উন্মোচন করিয়া স্বর্ণাবরণ পরিতেছিলেন, যে সময়ে সুপ্ত বৃক্ষলতা শিশির ভারাবনত দেহযষ্টি নাড়াইয়া জাগিয়া উঠিতেছিল, আর যে সময়ে সাবগুণ্ঠনা ও অনবগুণ্ঠনাবতী প্রভৃতি গৃহলক্ষ্মীদিগের অলঙ্কারধ্বনিও মধুর কণ্ঠে মিশাইয়া পুকুর ঘাটে একটি তানলয়যুক্ত সঙ্গীত লহরী তুলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সেই চির একঘেয়ে রাঙা পাকড়ী ও নীল রঙে ছোবান কুর্ত্তী আঁটা, চামড়ার ব্যাগ গলায় ঝুলাইয়া ডাক পেয়াদা ইনীদপুর গ্রামে প্রবেশ করিল। যথায় হারাধন ও উমেশ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তাম্রকূট সেবনে নিরত ছিল, তথায় সেই পেয়াদা আসিয়া এক প্রণাম করিয়া বলিল,—"দাদাঠাকুর! চিঠি আছে।" বলিয়া একখানা পত্র হারাধনের হাতে দিল। হারাধন পত্র উন্মোচন করিয়া পাঠ করিল;—

"বাবা! আজ চার পাঁচ দিবস হইল আপনকার জামতা জ্বর রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছে। আমার যেমন সামর্থ্য সেই মত ডাক্তার দেখাইতেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু সুরাহা হইতেছে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। আমার আপনিই একমাত্র ভরসা। পত্র পাঠমাত্র এ বাটীতে আসিবেন।

স্নেহের—

সৌদামিনী।"

সৌদামিনী হারাধনের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম। উহার বিবাহ হইয়াছে কালীঘাটে। হারাধন পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। উমেশকে পত্র শুনাইল।

উমেশ বলিল,—"তুমি এখনি রওনা হও।"

হা। যাইব নিশ্চিতই, কিন্তু পথটিত বড় সোজা নয়, তাই ভাবিতেছি, একা——

উ। বিপদের সময় পথ সোজা আর বাঁকা। যদি বিশেষ ভয় পাও ত বল, আমিও তোমার সঙ্গ লই।

হা। তা হলে ত আর কোন গোল থাকে না। কিন্তু আমার জন্য তুমি আবার কষ্ট পাবে?

উ। তবে তুমি তৈয়ার হও, আমিও চট্ করে বাড়ী থেকে আসি।

বলিয়া উমেশ চলিয়া গেল। হারাধন যথায় ব্রাহ্মণী ঠাকুরুণ সংসারে কার্য্য-কলাপ দেখিতেছিল, সেইখানে গিয়া এই দুঃসংবাদ প্রদান করিল। গৃহে একটা মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কিছু পরে, হারাধন ও উমেশ কলিকাতাভিমুখে রওনা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——o——

পথ চলিতে চলিতে হারাধন বলিল,—"বেলা প্রায় ১২ টা বাজে দেখিতেছি, এ পর্য্যন্ত উদরের ব্যবস্থা কিছুই করা হয় নাই। সেখানে পৌছিতে সন্ধ্যাই বা হয়।"

উ। পথে কি কোন দোকান মিলিবে না? পূর্ব্বে বলিলে না কেন, যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য সঙ্গে লইতাম।

হা। লইবে আর কি?

উ। চিড়া গুড় এমনি যা হয় কিছু লইলে এ বেলাটা এক রকম চলিয়া যাইত।

হা। যদি শুধু চিড়া গুড় হইলেই তোমার চলিয়া যায় ত আমি যৎকিঞ্চিৎ লইয়াছি।

উ। বাঃ! এ কথা পূর্ব্বে বলিতে হয়। যাহোক ঐ একটা দোকান ঘরের মত দেখা যাইতেছে; চল, ঐখান থেকে একটু জল চেয়ে নিয়ে মধ্যাহ্নটা শেষ করা যাক।

বলিয়া উভয়ে সেই দোকানাভিমুখে চলিল। কিন্তু দুঃর্ভাগ্য বশতঃ তখন দোকান বন্ধ ছিল। কি করে, দুই জনে বিশেষ দুঃখিত অন্তঃকরণে সেই ক্ষুদ্র আগোড় আঁটা কুটীরখানিকে বামে রাখিয়া পথ অতিবাহন করিয়া যায়, এমন সময়ে উমেশের শ্রবণেন্দ্রিয়ে গুড়্ গুড়্ ভুড়্ ভুড়্ রূপ এক অতি শ্রুতিমধুর শব্দ আসিয়া পৌঁছিল। উমেশ হারাধনকে বলিল, "শুনিতেছ, দোকানের ভিতর কিসের শব্দ হইতেছে।" হারাধন কাণ পাতিয়া ভাল করিয়া শুনিল, শুনিয়াই বুঝিল। ভক্ত, দেবীর অর্চ্চনায় কোন কালে বিরত থাকে? উভয়ে ফিরিয়া সেই দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল। ভিতরে তখনও হুক্কা দেবীর গুড়্ গুড়্ ভুড়্ ভুড়্ রূপ ক্রমনাদিনী শব্দ চলিতেছিল।

উমেশ ডাকিল,—"ওহে দোকানদার! একবার আগোড়টা খোল না হে!"

ভিতর হইতে উত্তর হইল,—"কেও! দুপুর বেলা ডাক পাড়া পাড়ী করে?"

উ। আমরা খরিদ্দার।

তখন চড়্ চড়্ খড়্ খড়্ করিয়া আগোড় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘোর কৃষ্ণকায় পুরুষ রক্তবর্ণ চোখ মুছিতে মুছিতে দেখা দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আপনারা?"

ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিতেছে, আতপ তাপে মাথা আগুন হইয়াছে। উমেশ কিছু চটিয়া উঠিল, বলিল, "সে খোঁজে কাজ কি বাপু! পয়সা নেবে জিনিষ দেবে, তাতে তোমরা আপনারা, কর সংসার, এ সব জ্যাটামী কেন?"

দোকানদারও কিঞ্চিৎ গরম হইল। ছোটগলায় বলিল,—"মনে করেছিলাম ভদ্রলোক।"

কথাটা উমেশের কাণে গেল। একে সে দোকানীর দুষমন্ চেহারা দেখিয়াই চটিয়াছিল, তাহার উপর এই অপমান সূচক কথা সহ হইল না। মহা আস্ফালনের সহিত মুখে যা আসিল তা শুনাইয়া দিল। দোকানীও কোমর বাঁধে দেখিয়া হারাধন উমেশকে টানিয়া

লইয়া চলিল। উমেশ যেন "ছাড়া পাইলে দোকানীর দফা শেষ করে" কেবল পারিতেছে না হারাধনের জন্য। আর দোকানী ও যেন "গায়ে হাত দিলে হয়, তা হ'লে দেখাইয়া দিই" গোছের। মোটের উপর কিছুই হইল না। এক হাত দুই হাত করিয়া উমেশ ও হারাধন দুই তিন রশি পথ চলিয়া গেল। যাইবারকালীন বচসায় মত্ত হইয়া উমেশের ব্যাগটী দোকানে ভুলিয়া ফেলিয়া গেল। দোকানী চটিয়াছিল, জানিয়াও বলিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—o—

কিছু দূর গিয়া হারাধন, উমেশকে বলিল, "এস, এই গাছের ছায়ায় একটু বসা যাক।

উ। তুমি ব'স। ব্যাটার সঙ্গে বকাবকি করে আমার গলাটা শুকিয়ে উঠেছে। তুমি একটু বিশ্রাম কর, আমি দেখি কাছে কোন ভাল পুষ্করিণী আছে কিনা।

হা। তবে এই চিড়া কটাও একবার জলে চুবাইয়া লইও।

বলিয়া হারাধন উমেশকে একটা ছোট কাপড়ে বাঁধা কতকগুলা চিড়া দিল। উমেশ পুষ্করিণীর উদ্দেশে চলিল।

হারাধন একটা তাল বৃক্ষের তলায় যেখানে একটা আমগাছের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল সেইখানে বসিল। কিছুক্ষণ বসিয়া কাপড়ের পুঁটলিটা মাথায় দিয়া সেইখানে একটু শয়ন করিল।

উমেশ কতদূর মাঠ অতিবাহন করিয়া চলিল, কোথাও একটা পুষ্করিণী মিলিল না। আরও কতদূর গিয়া দেখিল, অদূরে এক গ্রাম এবং সম্মুখে এক স্বচ্ছতোয়া পুষ্করিণী।

উমেশ জলে নামিয়া প্রথমে দুই আঁচলা জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল, পরে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া, চিড়া কয়টা জলে ফেলিয়া ভিজাইয়া লইল।

উমেশ প্রত্যাবৃত্ত হইল। পুনরায় সেই তালবৃক্ষের তলায় আসিয়া হঠাৎ যাহা দেখিল, তাহাতে ভয়, বিস্ময়, ক্রোধ, শোক যুগপৎ তাহার হৃদয় অধিকার করিল। কারণ উমেশ যাহা দেখিয়াছিল তাহা অতি ভয়ানক! লোমহর্ষক!!

উমেশ ভাবিল, "কে এমন পাষণ্ড! এত নির্দ্দয়! যে দিবা দ্বিপ্রহরে অনাহারী নিরীহ ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে এমন নির্দ্দয়রূপে এই ভীষণ বৃহৎ তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে! বোধ হয়, পাপী এই ভয়াবহ হত্যা করতঃ উষ্ণ ব্রহ্মশোনিতে হস্ত রঞ্জিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিদ্ধছুরিকা তুলিয়া লইতে সেই পাপ হস্তে বোধ হয়, তাদৃশ বল ছিল না।

ছুরিকা হারাধনের বুকের উপর এখনও বিদ্ধ রহিয়াছে। উমেশ আসিবার অনেক পূর্ব্বে হারাধনের প্রাণবায়ু বাহির হইয়াছে। কে বলিবে, কে, কেন ইহাকে হত্যা করিল। সৌদামিনী ইহার জন্য পথ পানে চাহিয়া আছে। মনে করিতেছে, "বাবা আসিতেছেন, অবশ্য একটা কিনারা হইবে, স্বামী বেঘোরে প্রাণ হারাইবে না।" কিন্তু হায়! দুঃখিনী কন্যা জানে না যে, তাহার স্নেহময় পিতা তাহাকে না জানাইয়া চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে। তা'র এক ভরসা তাহাকে পথে বসাইবে বলিয়া শয্যা লইয়াছে। সৌদামিনী জানে না ভবিষ্যতে সে কোথায় দাঁড়াইবে।

এই ভয়াবহ দৃশ্যে উমেশের বাহ্যসংজ্ঞা কিছুক্ষণের জন্য লোপ পাইয়াছিল। এখন সে বুঝিল, আর তাহার এখানে একা দাঁড়ান উচিত নহে। সে তথনই ঊর্দ্ধশ্বাসে যে পথে পূর্ব্বে গ্রাম দেখিয়াছিল, সেই পথে সেই গ্রামের উদ্দেশে ছুটিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—o—

ক্ষুধিত ব্যাঘ্র পথভ্রষ্ট পথিককে নির্জ্জনে পাইলে যেমন আনন্দিত হয়, নায়ক অভিসারিকা নায়িকাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতে দেখিলে

যেমন হর্ষ বিকশিত হয়, পরশ্রীকাতর ভাগ্যবন্তকে হঠাৎ বিত্তহীন হইতে দেখিলে যেমন পুলকিত হয়, সেইরূপ দারোগা এই খুনের সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রে আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। তখনি সদলবলে যেখানে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটন হইয়াছে, তথায় দেখা দিল।

দারোগা আসিতেছে দেখিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া দেখিতে আসিল। দারোগা প্রথমে মৃতের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিল। পরে উমেশের উপর পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। উমেশ আদ্যোপান্ত সত্য বিবৃত করিলেও তাহার উপর দারোগার সন্দেহ গেল না। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। যথা,—

১। হারাধনের সহিত তোমার বন্ধুতা কেন?

২। কেনই বা তুমি কালীঘাটে উহার সহিত যাইতেছিলে?

৩। যাইতেছিলে ত আবার উহাকে গাছতলায় রাখিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশে গেলে কেন?

একে বন্ধু বিয়োগ, তাহার উপর অনাহার, আবার এই অযথা আরোপ ও অর্থবিহীন প্রশ্ন, উমেশ মহা বিপদে পড়িল। বলিল, "আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইতেই পারে না। দ্বিতীয়ের উত্তর হারাধন একাকী কালীঘাটে যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, তাই আমি উহার সহিত আসিতেছিলাম। তৃতীয়ের উত্তর পথে একটা দোকানীর সহিত আমাদের বচসা হয়, তাহাতে এবং রৌদ্রের তাপে আমার অত্যন্ত তৃষ্ণা পায়, তাই পুষ্করিণীর উদ্দেশে গিয়াছিলাম। বোধ হয়, হারাধনের তৃষ্ণা পায় নাই, তাই ও ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিল।

শুনিয়া দারোগার মনে নূতন সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখনই লোক জন সমভিব্যাহারে সেই দোকানীর উদ্দেশে চলিল। দোকান পূর্ব্বের ন্যায় এবারও বন্ধ ছিল। হাঁক ডাক করিয়া দোকানীকে বিস্তর ডাকা হইল, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। তখনই সন্দেহটা বেশ পাকা গোছের দাঁড়াইল। সকলে ঠাওরাইল, এই ব্যক্তিরই কাজ, হয়ত বা সে পলাতক। দারোগা উপায়ান্তর দেখিয়া দোকান ঘরের আগোড় ভাঙ্গিতে আদেশ দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—o—

দোকানী বাহিরে এই আকস্মিক হাঙ্গামা দেখিয়া এবং পুলিসের জোর তলব বুঝিয়া ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একটা মাচার নিচে লুকাইয়াছিল। চৌকিদারেরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটু এদিক ওদিক অনুসন্ধানের পর মহা আস্ফালনের সহিত মাচার নিচে হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করিল। তখন দারোগা সাহেব মহা খুসী হইয়া আহ্লাদে তাহার পিঠে গোটাকতক টিপ্ টাপ্ করিয়া কিল চাপড় মারিয়া তাহার সহিত প্রথম আলাপ করিল। পুলিসের সহিত উমেশকে দেখিয়া দোকানী ভাবিল, "এ কখনই ব্যাগ ভুলিয়া যায় নাই, ইচ্ছা করিয়া আমাকে এই নাকালে ফেলিবে বলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। আবার খানিক এদিক ওদিক করিয়া চৌকি-দারেরা উমেশের ব্যাগ বাহির করিল। উমেশ দেখিয়া তাহার নিজের ব্যাগ বলিয়া সনক্ত করিল।

তখনই দোকানীর হাতে পায়ে বাঁধন পড়িল। দুটা কেরাসিনের বাক্স পাশাপাশি রাখিয়া দারোগা সাহেব এজলাসে বসিল।

প্রথম তলব হইল উমেশকে।

দারোগা জিজ্ঞাসিল,—"উমেশ! তুমি ইহাকে চেন?"

উ। হাঁ, বেলা ১২ টার পর ইহারই দোকানে আমরা আসি এবং কথায় কথায় ইহারই সহিত আমার বচসা হয়।

দা। বচসা করিলে কেন?

উ। মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছিল।

এইরূপ কিছু প্রশ্নোত্তরের পর দোকানীর ডাক পড়িল। একটা চৌকিদার তাহার হাতে পায়ে খুব শক্ত একগাছা দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে এক কোণে ফেলিয়া সকলে মিলিয়া থানা তল্লাসী করিতে-ছিল। কোথাও একটা মরা চাপা এক হাঁড়ি বাতাসা দেখিয়া সাত আট জন চৌকিদার মিলিয়া থানা তল্লাসী করিবার অভিপ্রায়ে সুকলে

বার দুই করিয়া সেই হাঁড়ির ভিতর হাত পুরিয়া মুখে দিবামাত্রই নিমেষে হাঁড়ির খানা-তল্লাসী শেষ করিল। কোথাও মুড়িতে মুড়কি মিশাইয়া খানা-তল্লাসীর যোগাড় হইতেছিল। কোথাও বা তামাকের তালটা—এখানে খানা-তল্লাসী হইতে পারে না, সুতরাং চৌকিদারেরা গৃহে গিয়া ভাল করিয়া খানা-তল্লাসী করিবে বলিয়া ভাগ করিতেছিল। দোকানী এই সকল দেখিয়া কেবল হাপুস্ নয়নে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিল। এমন সময়ে তাহার পিঠে সুকোমল একটা নাগরা চর্ম্মপাদুকা কিঞ্চিৎ জোরের সহিত স্পর্শ করিল। অবিলম্বে ধরাধরি করিয়া তাহাকে তুলিয়া দারোগার সম্মুখে আনা হইল।

দারোগা ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দোকানীর পেটে জুতা সমেত সজোরে এক লাথি মারিয়া বলিল,—"তুই ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, শুয়োর ব্যাটার সন্তান কেন এ কাজ করিলি?" দোকানী বেচারী, মহা বিপদগ্রস্ত! যে পায়, কেবল তাহাকেই প্রহার করে; কি করে. উপায় না দেখিয়া যোড়করে বলিল, "হুজুর! উনি ভুলিয়া ও ব্যাগ আমার দোকানে ফেলিয়া গিয়াছিলেন, আমি চুরি করি নাই।"

দা। যদি উনি ব্যাগটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন ত তুই ডাকিয়া ফিরাইয়া দিলি না কেন?

দো। উঁহারা চলিয়া গেলে তবে আমি ব্যাগ দেখিতে পাই। মনে ক'রেছিলাম উঁহারা আবার ফিরিয়া আসিবেন।

দা। ও ছুরি তুই কোথায় পেলি?

দো। কোন ছুরি?

দা। যা দিয়ে বামনের দফা রফা ক'রেচিস্।

এবার দোকানী বিশেষ ভীত হইল। ভয়ে তাহার বাক্‌শক্তি ক্ষণকালের জন্য রহিত হইল। পরে উমেশের পা দুটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দোহাই তোমার, গরিবকে মেরো না, আমার অপরাধ হয়েছে।"

দোকানীর মনে তখন স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, উমেশই এ ষড়-যন্ত্রের মূল; কোন উপায়ে তাহাকে ফাঁসাইতে আসিয়াছে। সে ইচ্ছা,

করিয়াই ব্যাগ ফেলিয়া গিয়াছিল। আরও ভাবিয়াছিল, এ দরোগা উমেশের কোন সম্পর্কীয় হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—o—

কেস সাজান হইল। দারোগা রিপোর্ট করিল,—"দুই জন পথিকের ভিতর একজনকে মল্লিকপুরের নীলে সদ্গোপ দোকানদার উহাদের যথা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার অভিপ্রায়ে, দুপুর বেলায় নির্জ্জন মাঠে এক জনের অনুপস্থিতিতে অপরের বুকে একখানা বাঁট সমেত এক হাত লম্বা এবং ইঞ্চ দুই আন্দাজ চওড়া মুখ সরু ছুরির দ্বারায় হত্যা করিয়া, উহাদের যা কিছু ছিল, সকলই অপহরণ করিয়াছে। একটা ব্যাগ মায় কাপড় সমেত তাহার দোকানের ভিতর হইতে পাওয়া গিয়াছে। অন্য মাল সকলের তদন্ত করিতেছি, যেমন যেমন হইবে, হুজুরে জানাইব।"

নীলে দোকানদার দোষী সাব্যস্ত হইল। তাহার স্ত্রী পুত্র আসিয়া কত কাঁদিল, কত অনুনয় বিনয় করিল, এবং নীলু যে এ হত্যায় কোনরূপে লিপ্ত নাই, তাহা বুঝাইবার জন্য কত মত চেষ্টা করিল; কিন্তু দারোগা আমাদের বড় কড়া হাকিম। তিনি নীলের পরিবারের নিকট হইতে রোক দশ টাকা পাইয়াও নীলেকে ছাড়িল না। তাহার হাজত অবশ্যম্ভাবী। কেবল ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অপেক্ষা।

লাস আলিপুরে চালান হইল। ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট যাঁহার নিকট এই মোকদ্দমা উঠিবে, তিনি রিপোর্ট পাইয়া লাস দেখিতে আসিলেন। তখন হারাধনের মৃত দেহ আসিয়া পৌঁছিল। ছুরিকা সেইরূপ হারাধনের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ। ডেপুটিবাবুটী কিছু পুরাতন, বহুদর্শী ও বিচক্ষণ। আঘাতস্থান পরীক্ষা করিয়া তাঁহার কেমন সন্দেহ জন্মিল। উত্তমরূপে সকল আবশ্যকীয় পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, ছুরীর বাঁট এবং অবশিষ্ট ফলা যাহা হারাধনের শরীরের ভিতর যায় নাই, তাহাতে রক্তের এবং গুঁড়া গুঁড়া মাংসের দাগ রহিয়াছে। দেখিয়া

তাঁহার সন্দেহ বিশেষ ঘনীভূত হইল। ভাবিলেন, হয় ত হত্যাকারী এই হত্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে আর এক হত্যা করিয়া থাকিবে, তা' না হইলে ছুরীময় মাংসের ও রক্তের দাগ থাকিবে কেন? অথবা, হয়ত ইহার ভিতর অন্য কোন রহস্য থাকিতে পারে।

অবশেষে যিনি এই শবচ্ছেদ করিয়া ইহার মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করিবেন, ডেপুটিবাবু তাঁহাকে একদিনের জন্য লাস জ্বালান বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "তথাস্তু।"

ডেপুটিবাবু তখনই অশ্বারোহণে মল্লিকপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার কালীন সেই ছুরিকা মৃতের বক্ষঃস্থল হইতে উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।

ডেপুটিবাবু ঘটনাস্থলে পৌঁছিলে নিকটবর্ত্তী লোক জন যাহারা খবর পাইল, ছুটিয়া আসিল; দারোগা আসিল এবং নীলেকে বদ্ধাবস্থায় আনা হইল।

ডেপুটিকে দেখিয়া নীলে যোড়করে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দোহাই কোম্পানি সাহেব! অবিচার ক'রো না, গরীবকে মেরো না।"

ডেপুটিবাবু জিজ্ঞাসায় জানিলেন, এই ব্যক্তিই আসামী।

তিনি প্রথমে উমেশকে ডাকিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের সহিত নীলের কি হইয়াছিল?"

উমেশ যথাযথ বলিল। ইহাও বলিল, বচসা তাহারই সহিত হইয়াছিল, হারাধনের সহিত হয় নাই।

ডে। যে সময়ে তোমাদের ঝগড়া হয়, সে সময়ে হারাধন উহাকে কিছু গাল মন্দ কহিয়াছিল?

উ। হারাধন কিছুই বলে নাই, বরং আমাদের উভয়কে থামাইয়াছিল।

উমেশকে ছাড়িয়া এইবার নীলেকে ডেপুটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ ব্যাগ কোথায় পাইলে?"

জী। হুজুর! উমেশ বাবু আমার দোকানে এসে সামান্য কথায় আমায় গাল মন্দ ক'রে যাবার সময় রাগে আনমনা হয়ে, এ ব্যাগ

আমার দোকানে ফেলে যান। উঁহারা চলে গেলে তবে আমি এই ব্যাগ দেখিতে পাই। মনে করেছিলাম, রাগে ভুলে গেছেন, রাগ পড়্‌লে ফিরে আসবেন, ব্যাগও নিয়ে যাবেন। তা না ক'রে হুজুর! আমায় খুনী আসামী করেছেন। ভগবান আছেন, তিনি দেখ্‌বেন।"

ডেপুটিবাবু দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছুরি উহার কাছে পূর্ব্বে ছিল সন্ধান লইয়াছ?"

দা। চোরাই মাল পর্য্যন্ত যখন উহার নিকট হইতে বাহির হইয়াছে, তখন আর বাকি কি?

ডে। বাকি বিস্তর। হইতে পারে, উমেশ সত্য সত্য ব্যাগ ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। বলিয়া উমেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ ব্যাগ উহার দোকানে ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছিলে, না আরও কিছু?"

উ। যখন আমি দোকান হইতে চলিয়া আসি, তখন ব্যাগ আমি সঙ্গে লই নাই। হারাধন আমাকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং সেও যে ব্যাগ উঠাইয়া লইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। আমার বিশ্বাস দোকানী যাহা বলিতেছে তাহা সত্য।

ডেপুটিবাবু জিজ্ঞাসায় জানিলেন, এ প্রশ্ন দারোগা উমেশকে পূর্ব্বে করে নাই। দারোগা এখন লাঞ্ছিত, লজ্জিত, চিন্তিত, ও ব্যস্ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।



ডেপুটিবাবু একবার নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইতে চাহিলেন, তখনই দারোগা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। গ্রামে পৌঁছিয়া ডেপুটিবাবু প্রত্যেক গ্রামবাসীকে পৃথক পৃথক ডাকাইয়া, সেই ছুরিখান দেখাইতে লাগিলেন, ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার এ ছুরি কি না?"

কত লোক আসিল, কত চলিয়া গেল, কেহই কিন্তু ছুরির কথা বলিতে পারিল না। শেষে এক মুসলমান আসিল, তাহাকে

ছুরি দেখান হইল। সে সে'খানাকে উত্তমরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। শেষে ছুটা ঢোক্ গিলিয়া বলিল,—"আজ্ঞে এ ছুরি আমার নহে।"

ডেপুটি তাহার রকম দেখিয়া প্রথমেই সন্দেহ করিয়াছিলেন। বলিলেন,—"মিঞা! বুঝিয়া সুঝিয়া বলিও। আমি কি না জানিয়াই তোমাকে ডাকাইয়াছি?"

মুসলমান মহা বিপদে পড়িল। বোধ হয় ভাবিল, হাকিম যখন জানিয়াছে, তখন বলাই ভাল। কিম্বা এইরূপ কিছু ভাবিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে অবশেষে বলিল, "হুজুর! এ আমারই ছুরি।"

উপস্থিত লোক সকলেই শুনিয়া চমকিত হইল।

ডে। তোমার ছুরি আমার নিকট আসিল কিরূপে?

মু। আজ্ঞে তা কি ক'রে ব'লব। তবে এই ব'লতে পারি, এখানা আমার খোয়া গিয়াছিল।

ডে। কয় দিন হইল খোয়া গিয়াছে?

মু। এই দু' রোজ হইল।

ডে। কিরূপ অবস্থায়, তোমার ঘরের ভিতর থেকে, না অন্য কোথাও হইতে?

মু। আজ্ঞে, ঘরের বার থেকে। পরশু দুপুরে খানিকটা মাস লয়ে, বাড়ী থেকে রশি দুই আন্দাজ তফাতে একটা মোটা কাঠ পেতে এই ছুরি দিয়ে সেই মাংসগুলা কাটিতেছিলাম। এমন সময়ে বাটীর মধ্যে হ'তে ছাবালগুলো কেঁদে উঠলো। আমি কি করি, সেইখানে এই ছুরিখানা সেই মাংসের ভিতর গুঁজে বাড়ীতে ছুটে আস্‌লাম। দেখ্‌লাম, একটা সাপ মোর কানাচ দিয়ে উঠে মোর শোবার ঘরের মুখে যেতে লেগেছে। তখনই একটা মোটা বাঁশ লয়ে সাপের প্যোরে সেইখানে একটা ঘায়ে সাবাড় ক'রলাম। সাপটা মেরে মুনে হ'ল মাংসটা অমনি ফেলে এসেছি। তাড়াতাড়ি এসে দেখি, মহাশয়! বলে না প্রত্যয় যাবেন, সে মাসও নেই, আর সে ছুরিও নেই। খালি সেই কাঠের পিড়িটা হা করে পড়ে আছে।"

শুনিয়া ডেপুটিবাবু যেন বিশেষ প্রফুল্ল হইলেন। পুনরায় সেই তালগাছের তলায় ফিরিয়া আসিলেন। একটা লোককে সেই তাল-গাছের উপর উঠিতে বলিলেন। লোকটা গাছের অর্দ্ধেক পথ উঠিতে না উঠিতে দুটা বড় গোদা চিল ডাকিতে ডাকিতে গাছ ছাড়িয়া উপরে উড়িতে লাগিল। আরও কিছুদূর উপরে উঠিয়া সে বলিল,—"মহাশয়! এক চিলের বাসা আছে।"

ডে। বাচ্ছা আছে?

লোকটা তখন উপরে উঠিয়া বসিয়াছে। বলিল, "আজ্ঞা হুঁ' মহাশয়! এক যোড়া"—বলিয়া লোকটা উপর হইতে নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিল।

ডে। কেন থুতু ফেল্‌লে কেন?

লো। খানিকটা পচা মাস চিলের বাসায়।

ডেপুটিবাবু মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। বলিলেন, "মাংসটা ফেলিয়া দাও।"

দেখিয়া শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল। ডেপুটিবাবু সকলের উদ্দেশে বলিলেন, "প্রথমে আমার যাহা সন্দেহ হইয়াছিল, এখন দেখিতেছি ঘটনাটি তাহাই। এ ছুরিকা কোন মনুষ্য-হস্ত হারাধনের হত্যা অভিপ্রায়ে ধরে নাই, ইহা ভগবানের মার।"

তখনই নীলে দোকানদারকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সে দুই হস্তে ডেপুটি বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিল, ও বলিল, "হুজুর! প্রাণ যদি বাঁচাইলেন, যাহাতে স্ত্রী পুত্র লইয়া দুই মুটা খাইতে পাই, এমন করিতে আজ্ঞা হয়। চৌকিদারেরা আমার দোকানের তৈজস পত্র অরধি লুটিয়া লইয়াছে, মাচার বাঁশ পর্য্যন্ত জ্বালানি কাঠ করিয়াছে, বেচিব কি? খাইব কি?"

শুনিয়া ডেপুটিবাবু ক্রোধ-গম্ভীরস্বরে দারোগাকে বলিলেন,—"তোমরা শান্তি রক্ষক, অত্যাচার দমন করাই তোমাদের কাজ। তা না করিয়া তোমরাই চোর-ডাকাতের অধম হইয়াছ? লোকের বাড়ীতে চুরি হইলে তোমাদের কাছে তাহারা অভিযোগ করিবে, তোমরা

লোকের সর্ব্বনাশ করিলে তাহাদের উপায়! এই নীলুর ন্যায় কত নিরীহ লোক যে তোমাদের হাতে দিন দিন নিপীড়িত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।”

দারোগা, ডেপুটিবাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। নীলে দোকানদার তাহার দোকানের আসবাব পত্র ফিরাইয়া পাইল, ডেপুটিবাবুও আলিপুরে ফিরিয়া গেলেন।

পাঠক! বুঝিলেন, হারাধনের মৃত্যুর কারণ কি? ওই যে তালগাছের উপর এক যোড়া চিলের বাসা দেখিলেন, ওই দুইটা চিলের ভিতর একটা ঐ মুসলমানের মাংস চুরি করিয়া উহার বাসায় আনিয়াছিল। ঐ গাছের উপর বসিয়া বসিয়া কতক মাংস নিজেরা খাইয়াছে ও কতক শাবকদিগকে খাওয়াইয়াছে। মাংস খাইতে খাইতে যখন ছুরি মাংসের ভিতর হইতে খুলিয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ে হারাধন নিচে গাছের তলায় অর্দ্ধশয়নাবস্থায় বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছিল। যদি ছুরি খানার বাঁটের দিকটা ভারি হইত, ত চাই কি হারাধন বাঁচিলেও বাঁচিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ছুরির বাঁটের দিক অপেক্ষা ছুরির দিকটা বেশী ভারি ছিল। তাই সেখানা, ঠিক সরু মুখটা নিচু করিয়া, হারাধনের বুকের উপর পড়িয়াছিল। একে অত উপর, তায় রীতিমত ভারি ও বিশেষ সানান, কাজেই সহজে হারাধনের পঞ্জর ভেদ করিয়া ফুস্‌ফুসের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। বোধ হয়, এই আঘাতে মুহূর্ত্ত পরে হারাধনের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া থাকিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—o—

ডাক্তার সাহেবের শবচ্ছেদ মন্তব্য ডেপুটিবাবুর সহিত একমত হইল। ডেপুটিবাবু এজলাসে বসিয়া শেষ বিচার করিলেন। রায়ে দৈব ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক তাহাই লিখিত হইল। উমেশ লাস চাহিল। চারিজন ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া উমেশ ক্যাওড়াতলায়

শবদাহ ঘাটে হারাধনের মৃতদেহ লইয়া আসিল। ঘাটে পৌঁছিয়া যাহা দেখিল, তাহা আরও শোচনীয়। হারাধনের কন্যা সৌদামিনী স্বামীর মৃতদেহ দাহ করিতে আসিয়াছে!!

উমেশকে দেখিয়া সৌদামিনী বিস্মিতা হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা! এখানে কেন?"

উমেশ কি বলিবে, প্রজ্বলিত চিতা ও তাহার পার্শ্বে সৌদামিনীকে দেখিয়া উমেশ বুঝিয়াছিল, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আবার হারাধনের এই অবস্থা জানিলে না জানি সে কি করিবে! কিন্তু উপায় নাই জানাতেই হইবে।

উমেশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মা! বলিব কি. তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

বলিয়া হারাধনের শবদেহ দেখাইয়া দিল। সৌদামিনী ছুটিয়া যাইয়া মৃতের মুখাবরণ খুলিল। খুলিয়া দেখিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলনা। মাথা ঘুরিয়া সেই খট্টাঙ্গপার্শ্বে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। পরে হারাধনের মুখের উপর মুখ রাখিয়া দুই হস্তে সেই মৃতের মস্তক ধরিয়া, চক্ষের জলে হারাধনের শীতল গণ্ডদেশ ধৌত করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা গো! চলিয়া গেলে, দেখিয়া গেলে না আমার কি দশা হইল! যাহার হাতে আমার রক্ষণ-ভার অর্পণ করয়াছিলে, দেখ, ওই সে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। তুমিও গেলে, সেও গেল! কার কাছে গিয়া দাঁড়াব? বাবা গো! আমি যাব, তোমাদের সঙ্গে যাব—"

উমেশ সৌদামিনীর করুণা শুনিয়া অস্থির হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মা সৌদামিনী! আর কাঁদিলে কি হইবে? এখন কন্যার যাহা কর্ত্তব্য তাই কর।"

কতক্ষণ পরে হারাধনের দেহ চিতার উপর রাখা হইল। সৌদামিনী চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া হারাধনের মুখে অগ্নি প্রদান করিল, চিতা জ্বলিল।

কার্য্য শেষ হইলে সৌদামিনী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উমেশকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকা! কোথায় যাইব?"

ট্ট। মা! তোর সাবেক ঘরে চল। এক মুঠা আমি যদি খাইতে পাই ত তুইও তার আধ মুঠা পাইবি।”

সৌদামিনী শোক-বিহ্বলা। আজ কি কু-ক্ষণেই তাহার রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল।

শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী।

সন্ধ্যা।

যে গান গাহিয়া গেল পাখী,
সে গান কি তব আবাহন?
অথবা সে বিরাম সঙ্গীত,
দিবসের মর্ম্মোচ্ছ্বাস গাথা;
তোমারি কি মুখ চেয়ে চেয়ে,
ফুল ওই ত্যজিল জীবন,
অথবা সে নারিল সহিতে,
ভ্রমরের বিরহের ব্যথা।

অলির পাখার ছায়ে বসি’,
সমীর গাহিতেছিল গান,
তোমারে পাইয়া বুঝি এবে,
নাচিয়া বেড়ায় চারিপাশ;
অথবা সে নেহারি’ নিকুঞ্জে,
কুসুমের দেহ অবসান,
ছিন্নদল বুকেতে লইয়া,
ফেলিতেছে আকুল নিশ্বাস।

মুরছিয়া পড়িল নলিনী,
কেঁপে ওই উঠিল সরসী,
তোমারে হেরিয়া বুঝি রবি,
চলে গেল রক্তিম নয়নে,
এলায়ে পড়েছে তব কেশ,
উড়ায়ে চলেছ তমোরাশি,
তপনে পিছনে রাখি’ বুঝি,
যাবে চলে ত্বরিত গমনে!
তুমি কি গো পূরব তোরণে,
রাখি’ [illegible] কনক-কলসী,
অরুণ কুমারে কোলে লয়ে,
ঊষা হয়ে ছড়াবে কিরণে?

হীন-প্রবৃত্তি চতুষ্টয়।

আমরা হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া এই চারি হীনপ্রবৃত্তির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা, এবং তৎসহ এই চারিটী আমাদিগের মধ্যে কিরূপ সুখ দুঃখের উৎপাদন করে, তাহার পরিচয় দিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

হিংসা—(হননার্থক, হিন্স+ভাবে—অ+আপ) অর্থে ঘাত, বধ বা হনন। তাহার আচরণ অনুষ্ঠানই হিংসা নামে অভিহিত।

দ্বেষ—(বৈরার্থক, দ্বিষ+ভাবে+অল্) শত্রুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা যায়, তাহাই দ্বেষ।

ঈর্ষা—(অক্ষান্তি—অর্থক, ঈর্ষ্য+ভাবে—অ+আপ্) পরোৎকর্ষ-সহিষ্ণুতা পরশ্রীকাতরতা। পরের উন্নতি যাহার চক্ষুঃশূল হয়, তাহার ব্যবহারই ঈর্ষা।

অসূয়া—(অসু (চিত্ত)+ক্য=অসূয়+ভাবে—অ+আপ্—পরগুণেষু দোষারোপণমসূয়া। পরচিত্তের অযথাখ্যাপনে গুণে দোষারোপ করার নাম অসূয়া।

এই হীন-প্রবৃত্তি-প্রণোদিত আচরণ ও তাহার ফল :—

কশ্যপ প্রজাপতির পুত্রগণের মধ্যে অদিতি নন্দনগণ অতুল যশস্বী ও কৃতকর্ম্মা হইতেছেন দেখিয়া, দিতি নন্দনগণের দৃষ্টিশূল হইল; সুতরাং তাঁহাদিগের হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হইতে লাগিল। ঈর্ষার চির সহচর হইতেছে, [illegible]। আর তাহার ফলেই দ্বেষ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাই আদিত্য দেবগণের সহিত দৈত্য অসুরগণের সমর হইয়া থাকে। আর ইহার চরম পরিণতিই হিংসা। এই কারণে রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র সমরও সংঘটিত হইয়াছিল।

আবার যখন তুয়ার বংশের অপুত্রক রাজা অনঙ্গপাল পরলোক-গত হন, তখন তাঁহার দুইটী কন্যা থাকেন। তাঁহাদিগের পুত্র যথাক্রমে—কনৌজপতি জয়চন্দ্র ও আজমীর পতি পৃথ্বীরাজ। কিন্তু

পৃথ্বীরাজা মাতৃষ্বস্রেয় জয়চন্দ্র অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও, বিবিধ সদ্‌গুণে সাধারণের ও মাতামহ দিল্লীশ্বর অনঙ্গ পালের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কনোজেশ্বর জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের এরূপ দিগন্ত-প্রসারী যশোবাদের পরিচয় পাইয়া, ও মাতামহের ত্যক্ত সিংহাসনে প্রাপ্তাধিকার হইতে দেখিয়া, ঈর্ষাযুক্ত হৃদয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অবমাননার জন্য তাঁহার গুণে দোষারোপ করিয়া, স্বপ্রাধান্য রক্ষার জন্য প্রযাস পাইতে লাগিলেন। অসূয়া প্রণোদনেই এইরূপ অনুষ্ঠান হয়। আবার পৃথ্বীরাজের প্রাধান্যলোপের জন্য, দ্বেষ বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছিল; তাহার দুই একটী সামান্য সামান্য ফলও যে, না ফলিয়াছিল এমন নহে। পরে তাহার চরম পরিণতি যেমন হিংসায় পর্য্যবসিতা হয়, এখানেও সেইরূপ হইল; তিনি মহম্মদ ঘোরিকে আপনার সাহায্যার্থক আহ্বান করিলেন; ও সমর সংঘটন করিয়া শত্রু পৃথ্বীরাজের নিপাত-সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এই হীনবৃত্তি চতুষ্টয়ের বশে পরিচালিত হওয়াতেই ভারতের সুখসূর্য্য অস্তমিত হইল। ইহার ফল শুদ্ধ ভারতেই নহে, অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত বীর নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যখন সমগ্র ইউরোপীয় রাজগণ উত্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে নেপোলিয়ন সম্রাট্ হইতে না পান, তাহার চেষ্টা করা। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে, এখনও ঐরূপ বৃত্তি চতুষ্টয়ের ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা ত গেল, রাজকীয় বিভ্রাটের কথা। দুইজন রাজকর্ম্মচারী-দিগের ভিতর একের সাতিশয় উন্নতি হইলে, অপরের হৃদয়ে হীন-প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিতা হইতে থাকে। ভারতের রিজিয়া বেগম কর্ত্তৃক যখন একজন কৃতদাসকে আমীর-উল-উমরার পদে উন্নীত করা হইয়াছিল, তখন তাঁহার অন্যান্য আমীরগণ এতাদৃশ বিদ্বেষপর হইয়াছিলেন, যে, রিজিয়া বেগমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেও তিনি ভীত হন নাই। আবার স্কটলণ্ডের তৃতীয় জেম্‌সকেও এইরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছিল।

আবার কোন একটী দ্রব্য পাইবার জন্য যদি দুইজন লালায়িত হয়, আর যদি তাহা একজন স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্যের আধিক্য-বশতঃ তাহার লাভে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, অপরের ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রভৃতি উত্তেজিত হইতে থাকে, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার মান বা পদগৌরবের রক্ষার জন্য, এইরূপ হীনপ্রকৃতির লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিংহ মুসলমান বাদশাহ আকবরের সংস্রবে পড়িয়া জাতি-মর্য্যাদা হারাইয়াছিলেন; কিন্তু চিতোরপতি প্রতাপসিংহ জাতি-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরে মানসিংহ পূর্ব্ব গৌরব প্রাপ্তি কামনায়—রাজা প্রতাপসিংহের প্রসাদার্জ্জন বাসনায়—যখন প্রতাপের শরণাপন্ন হন, তখন প্রতাপসিংহের নিকট ঘৃণ্য ও অমর্য্যাদ হইয়া তাঁহার প্রতি দ্বেষ হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে হল্দীঘাটার যুদ্ধে প্রতাপসিংহ পরাজিত হইলে, তাঁহার কন্যাহরণ করিয়া সেলিমের হস্তে অর্পণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

এই হীনবৃত্তি চতুষ্টয়ই মানবের ক্রমোন্নতির অন্তরায়। যদি কেহ তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহেন, তাহা হইলে, কি প্রকারে সর্ব্বভূতে আত্মবদ্দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন,—কি প্রকারে সাধারণের প্রীতি ভালবাসার আকর্ষণ করিতে পারিবেন, তাহার চেষ্টা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। কারণ প্রেম বা ভালবাসা হইতেছে, এই হীনপ্রবৃত্তিগুলির প্রতিষেধক।

শ্রীঅঘোর নাথ ঘোষ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আভা—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জমিদার সম্পাদিত। আমরা ১ম হইতে ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। পত্রিকা খানিতে পদ্যেরই বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২।১টী ব্যতীত প্রায় অধিকাংশই অসার। যাহা হউক আভার আভা দিন দিন বৃদ্ধি পাউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

২য় খণ্ড। } বৈশাখ, ১৩০২ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সেন-নৃপতিগণের অন্যতম রাজধানী।

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ঢাকা বিভাগান্তর্গত বিস্তৃত ভূখণ্ড অধুনা বিক্রমপুর উপ-বিভাগ (পরগণা) নামে অভিহিত হইয়া থাকে; এ ভূভাগের পশ্চিমে ক্ষুদ্র সলিলা ইচ্ছামতী, উত্তরে স্রোতস্বিনী ধলেশ্বরী, পূর্ব্বে বিশাল কায়াবিশিষ্ট ভীম-পরাক্রমশালী মেগ্না এবং দক্ষিণে জাহ্নবীর পুণ্যস্রোত প্রবাহিত। কিন্তু পূর্ব্বকালে যখন গঙ্গার প্রধান জলস্রোতঃ ধলেশ্বরী খাতে প্রবাহিত হইত, তৎকালে বিক্রমপুর, কল্লোলিনী জাহ্নবীর দক্ষিণ দিকে সন্নিবিষ্ট ছিল। এই সুবিশাল প্রখর স্রোত-শালিনীর ভীষণ জল-প্রবাহ অধুনা পদ্মা অথবা "কীর্ত্তিনাশা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গঙ্গার স্রোত পরিবর্ত্তন কালে, সম্ভবতঃ কোন নগর অথবা প্রদেশাংশ বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই হেতু পদ্মার "কীর্ত্তিনাশা" নাম হইয়া থাকিবে। জাহ্নবীর স্রোতের পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিক্রমপুর সুবিস্তৃত "বাগড়ি" বিভাগের অংশমাত্র ছিল। পরে ঢাকা এবং সুবর্ণগ্রাম সহকারে ইহা বঙ্গ-বিভাগের অন্তর্নিহিত হয়।

একদা যে নগরী হইতে এই বিস্তৃত পরগণা বিক্রমপুরের নামকরণ হইয়াছিল, সেই স্থানটী অধুনা একটী নগণ্য পল্লীগ্রাম মাত্রে পরিণত। প্রাচীন বিক্রমপুর নগর যে কাহার দ্বারা স্থাপিত হয়, তৎসম্বন্ধে

ইতিহাস কিছু বলে না। ডাক্তার টেলার সাহেব বলেন যে,—এই নগর রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়; এবং ইহা প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী ছিল।* এই বিক্রমাদিত্য যে কে ছিলেন, তৎসম্বন্ধে টেলার সাহেব কোন বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ, এই বিবরণ টেলার সাহেব স্থানীয় পরম্পরাশ্রুত গল্প হইতে অবগত হইয়া থাকিবেন।

যাহাই হউক, ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই স্থানে সেন বংশীয় রাজগণের আদি পুরুষদিগের রাজধানী ছিল। এই স্থানটী ২৩° ৩৩′ ৩০″ পূর্ব্ব অক্ষাংশে অবস্থিত।† যৎকালে সেন-বংশীয় রাজগণ বিক্রমপুরে প্রথম রাজধানী সংস্থাপিত করেন, তৎকালে ইহারা বঙ্গদেশে সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। উত্তর কালে রাঢ় এবং বরেন্দ্রভূমে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইবার পর, সমগ্র বাঙ্গালায় সেন-নৃপতিগণের খ্যাতি বিস্তৃত হয়, এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ভূপাল বলিয়া তাঁহারা পরিগণিত হইতে থাকেন। বিক্রমপুরে অদ্যাপিও "রামপালদীঘি" নামে যে সুবিস্তৃত দীর্ঘিকা, বহু শতাব্দী হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে, কথিত আছে, উহার পার্শ্বে সৌধমালা সমন্বিত প্রাচীন সেন-নৃপাল-রাজধানী বিন্যস্ত ছিল। দীর্ঘিকার উত্তর দিকে এক পোয়া ভূমি ব্যবধানে "বল্লালবাড়ী" অথবা সেন-ভূপাল বল্লালের মহামান্বিত রাজপ্রাসাদ বিরাজিত ছিল। ফলে যে স্থলে উক্ত বংশীয় রাজগণ বাস করিতেন এবং এক্ষণে যথায় রাজ অট্টালিকা প্রভৃতির চিহ্নাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, উক্ত স্থান রামপাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রামপাল ফিরিঙ্গীবাজারের অনতিদূরে অবস্থিত।‡

* Vide Topography statistics of Dacca, pp. 101, by Dr. James Taylor.

† Vide Hunter's Imperial Gazetteer Vol 11, pp. 444.

‡ Vide Statistical Account of Bengal Vol. V pp. 70 by W. W. Hunter.

মুসলমানগণ বাঙ্গালা আক্রমণ করিল, সুতরাং সেন রাজগণের অগ্রণী নগরদ্বয়—গৌড় এবং নবদ্বীপ—উক্ত জাতির কর-কবলিত হইল। এই সময়ে সেন-বংশীয় বঙ্গের শেষ নৃপতি বিক্রমপুরের রাজপ্রাসাদে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত প্রদেশীয় অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস যে, বল্লালসেনের সহিত প্রথম আক্রমণ-কারী মুসলমানের সংগ্রাম হয়। তারানাথের মতে এই বংশীয় শেষ হিন্দু ভূপালের নাম লবসেন।* কিন্তু মুসলমান ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশ্বস্ত বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা, এই নৃপতিকে 'লাক্ষণেয়' বলিয়া অভিহিত করেন। কানিংহ্যাম সাহেব বলেন যে, সম্ভবতঃ এই শেষ নৃপতি এবং তদীয় পিতামহ উভয়ের নাম লক্ষণ সেন। ঐ সাহেব আরও বলেন যে, এই নামটী সচরাচর "লক্ষণসেন" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সেই হেতু তাঁহার বিশ্বাস, লবসেন এবং লক্ষণসেন এই উভয়ই প্রকৃতপক্ষে এক নাম।† আমাদের বিশ্বাস যে, মুসলমান ইতিহাসবেত্তাগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত এবং ক্যানিংহ্যাম সাহেবের অনুমান ভ্রমাত্মক। বল্লালসেন কর্ত্তৃক সেন বংশের মহত্ব, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি পরিবর্দ্ধিত, সংস্থাপিত ও পরিপুষ্ট হয়। তাঁহার পুত্র লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে সেনবংশের বিস্তৃতির চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে, মহানগরী গৌড় এবং অন্যান্য নগর নিচয় বল্লালসেন কর্ত্তৃক স্থাপিত। বল্লালসেনের অপরাপর কীর্ত্তি সমূহের উল্লেখ পরিত্যাগ করিলেও কেবল বিক্রমপুরস্থিত "বল্লালবাড়ী" নামক রাজ-প্রাসাদ তাঁহার নাম সংরক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট; এবং লক্ষণ সেনের নাম উক্ত প্রদেশে এক প্রকার বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার নিমিত্ত সেনরাজগণের ইতিহাসান্তর্গত স্মরণীয় ঘটনা নিচয় স্বভাবতঃ উক্ত বংশীয় রাজ্য-সংস্থাপয়িতা কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

* তারানাথ বাঙ্গালী; তিনি তিব্বতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক।

† Vide Cunningham Archœological Report Vol XV p 132.

পূর্ব্বোল্লিখিত বহুদূর ব্যাপিনী দীর্ঘিকা,--"রামপাল দীঘি" "অগ্নিকুণ্ড" "বল্লালবাড়ী" এবং কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, উত্তর দিকে, বাবা আদম নামক উক্ত প্রদেশের জনৈক প্রাচীন মুসলমান আক্রমণকারীর সমাধিমঞ্চ ও তৎকৃত মস্‌জিদ ব্যতীত সেন নৃপালগণের প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরের আর কিছু চিহ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

আনুমানিক পাঁচশত হস্ত সমচতুষ্কোণ একটী মৃত্তিকা বিনির্ম্মিত দুর্গ। উহার চতুর্দ্দিকে পরিখা বেষ্টিত। গড়খাইয়ের প্রশস্ততা প্রায় ১৩২ হস্ত হইবে। চতুর্দ্দিকেরই বিস্তৃতি সমান। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পূর্ব্বাভিমুখে। ঐ দিকে দুর্গের বহির্ভাগে দুই শত হস্ত পরিমাণ টানা একতল গৃহ শ্রেণীর মধ্য ভেদ করিয়া ঐ দুর্গ-প্রবেশ পথ চলিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ, এই গৃহগুলি পরিচারকবর্গের অবস্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই গৃহশ্রেণীর সহ গড়খাইয়ের বেড় ঠিক অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে। বর্ণিত আছে, এই সমগ্র স্থান লইয়া প্রাচীন সেনরাজ-প্রাসাদ "বল্লালবাড়ীর" ভগ্নাবশেষ। একদা যে সেন-রাজ-প্রাসাদ-দুর্গ মধ্যে সুরম্য অট্টালিকা ও মুরচা বৃন্দ জনগনের নয়নানন্দ-দায়ী ছিল, অধুনা সেই সকলের চিহ্নাবশেষ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত প্রায়;—দুর্গ-প্রাসাদের একখানি ইষ্টকখণ্ডও প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। কিন্তু ডাক্তার টেলার সাহেব বলেন যে, ঐ রাজ-বাটীর নিকটবর্ত্তী চতুঃ-পার্শ্বস্থ স্থান সমূহে এবং উক্ত বিভাগের চতুর্দ্দিকে বহুদূর-ব্যাপিত স্থানের মধ্যে ইষ্টক স্তূপ এবং প্রাচীর ভিত্তিমূল সমূহের অস্তিত্ব রহিয়াছে। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই স্থানে এক সময়ে সমৃদ্ধ নগরী বিরাজিত ছিল, এবং চারি পার্শ্বে বহুদূর বিস্তৃত জনপদ সমূহ বিন্যস্ত ছিল।*

"বল্লালবাড়ীর" পশ্চিমে অর্দ্ধ মাইল অন্তরে একটী ক্ষুদ্র সমচতুর্ভুজ সরোবর আছে, উহা "পুষ্করিণী" অথবা "অগ্নিকুণ্ড" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সরসীর সান্নিধ্যে একটী অনতি দীর্ঘাকৃতি মুসল-

* অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে "বল্লালবাড়ীর" সান্নিধ্যে কোন ক্ষেত্রকর্ষণ-কালীন জনৈক কৃষক এক খণ্ড হীরক প্রাপ্ত হয়। উহার মূল্য সপ্ততি

মানদিগের ভজনাগার বা মস্‌জিদ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বহুকালাবধি পদ-দলিত নির্জ্জীব হিন্দু সন্তানদিগের নিরীহতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া প্রবেশকালে মাড়াইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে মস্‌জিদ-দ্বার সম্মুখে মুসলমানগণ একটী পাষাণ গঠিত ভৈরব মূর্ত্তি পাতিত করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রস্তর-বিনির্ম্মিত দেবতা-মূর্ত্তিটীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ছেদিত। সম্ভবতঃ, এই অঙ্গচ্ছেদ ক্রিয়া মুসলমানদিগের দ্বারা সম্পাদিত। উক্ত স্থানীয় হিন্দুগণ অগ্নিকুণ্ডকে অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে দেখিয়া থাকেন, এবং ঐ সরসীকে অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করেন। যে হেতু কথিত আছে যে, অস্তগমনোন্মুখ হিন্দুকুল-গৌরব-রবি,—অন্তিম সেন-রাজ স্বীয় পরিজনবর্গ সহকারে ঐ স্থানে—সেই শেষ—বাঙ্গালী জাতির সেই অন্তিম দিনে—চিতারোহণে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই শোকাবহ ঘটনাটি বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার টেলার সাহেব উহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—

কথিত আছে যে, শেষ সেন নৃপতি তাঁহার রাজ্য আক্রমণকারী মুসলমানদিগের সেনাদলের প্রবেশে বাধা প্রদান করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হয়েন। নৃপতি দৌত্য কার্য্যে শিক্ষিত একটী কপোত সমভিব্যহারে লইয়া যান। রাজ পরিবারবর্গ দুর্গ প্রাসাদে প্রস্তুত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড একটী চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়। যুদ্ধে পরাজয়-জ্ঞাপক ঐ পারাবতের প্রত্যাগমন তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছিলেন,—পক্ষীর সমাগমেই ঐ প্রজ্জ্বলিত হুতাশন মধ্যে সকলে ঝম্প প্রদান করিয়া রাজ ও হিন্দুকুল-রমণীর সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিবেন। ভূপতি যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত দিবসের শ্রম বশতঃ তিনি জলপান করিবার জন্য নদী স্রোতাভিমুখে যেমন দেহ যষ্টি অবনত করিবেন, অমনি তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তরাধৃত বার্ত্তাবহ কপোত মুক্তিলাভে উড়িয়া রাজভবনে উপস্থিত হইল। ভূপাল অশ্বারোহণে

সহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারিত হয়। এই হীরক লইয়া উক্ত বিভাগীয় আপিল বিচারালয়ে (আদালতে) একটি অভিযোগ চলিয়াছিল।

অতি দ্রুত গতিতে প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে সমর্থ? উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রাজ-সীমন্তিনীগণ চিতানলে প্রবেশ করিয়াছেন,—দেখিলেন, সর্ব্বভুক বৈশ্বানর সকলকেই গ্রাস করিয়াছেন। তিনিও কাল বিলম্ব না করিয়া তদীয় প্রিয়জন বৃন্দের ভস্মীভূত দেহযষ্টি সমন্বিত অথচ বিধূমিত ও অর্দ্ধ প্রশমিত শিখা-যুক্ত চিতা মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক জীবন লীলা সম্বরণ করিলেন। এইরূপে বাঙ্গালার অন্তিম হিন্দুরাজবংশ বিলুপ্ত—বঙ্গরঙ্গভূমে বাঙ্গালীর রাজ্যাভিনয়ের রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে যবনিকা পতিত—গৌড়ভূমে হিন্দুকুলসূর্য্য অস্তাচলশায়ী হইল।*

বল্লালবাড়ীর সীমাভ্যন্তরে "মিঠাপোখর" নামে একটী ক্ষুদ্র সরোবর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ পুষ্করিণীর জল অতীব সুস্বাদু বলিয়াই উহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু অধুনা ঐ সরসী-বারি কেহ আর ব্যবহার করে না। কারণ, লোকের মনে এইরূপ ধারণা যে, নৃপতি এবং রাজ পরিবারবর্গের বিধ্বংসিত শরীরের ভস্মাবশেষ এই সরোবর-নীরে নিক্ষিপ্ত হয়।

বল্লালবাড়ীর দক্ষিণে, এক পোয়া ব্যবধানে "রামপালদীঘি" নামে বহুদূর ব্যাপ্ত একটী সুদৃশ্য, প্রশান্ত ও সুগভীর জলরাশির কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহার দৈর্ঘ (১৮০০ ফুট) এক সহস্র দুই শত হস্ত, এবং প্রস্থ প্রায় (৮০০ শত ফুট) ২৬৭ হস্ত পরিমিত হইবে। এই দীর্ঘিকার জল সুগভীর ও স্বচ্ছ। তীর ভূমে চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ প্রাচীন তরুরাজি শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কথিত আছে, ঐ দীর্ঘিকার উত্তর দিকে রাজকীয় হস্তী সমস্ত সংরক্ষিত হইত। ইহার দক্ষিণ দিকের ভূমি সমূহের অধিকারিগণ আপনাদিগকে সেনরাজবংশের বংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহারা জাতিতে বৈদ্য। কিন্তু বাঙ্গালার সেন-রাজগণ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ

* Vide Taylor's Topography and statistics of Dacca pp. 102

আছে। ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যে স্থলে রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, উক্ত স্থান রামপাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ অনুমিত হয় যে, উক্ত দীর্ঘিকার নাম এই স্থান হইতে সমুদ্ভূত। পূর্ব্ব এবং উত্তর-পূর্ব্ব বাঙ্গলার অনেক স্থলে (দিনাজপুর প্রভৃতি বিভাগে) বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রমাণও পাওয়া যায় যে, ঐ সকল পালবংশীয়দিগের—বাঙ্গালার বৌদ্ধ রাজগণকর্ত্তৃক খাত। সেই হেতু এইরূপ বিবেচনা করা যায় যে, সেন-নৃপতিগণের রাজ্য সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এই রামপাল নামক স্থানটী একটী বৃহৎ নগর ছিল। পালবংশীয় কোন নৃপতি কর্ত্তৃক উক্ত রামপাল নগর সংস্থাপিত এবং "রামপালদীঘি" খ্যাত হইয়া থাকিবে। অনন্তর পালরাজকে পরাভূত করিয়া সেনবংশীয় নৃপতি ঐ সকল অধিকার করেন এবং উহার পার্শ্বে আপনাদিগের নূতন নগর সংস্থাপিত করিয়া উহা নব নামে অভিহিত করিতে থাকেন।

বল্লালবাড়ীর প্রায় এক পোয়া উত্তরে বাবা আদমের সমাধিস্থল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিঞ্চিদুন সপ্তদশ হস্ত পরিমিত একটী সমচতুর্ভুজ মঞ্চের উপরে সামান্য রূপে চূর্ণ প্রলেপ করা ইষ্টক নির্ম্মিত শবাধারটী বাবা আদমের প্রকৃত সমাধি। এই স্থানটী মুসলমানগণ অতীব পবিত্র বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন।

কথিত "বল্লালবাড়ী" হইতে এক ক্রোশের মধ্যে "কাজিকস্‌বা" বলিয়া একটী স্থান আছে, উক্ত স্থানে বাবা আদম কৃত একটী মস্‌জিদ্ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বাবা আদম সাধারণতঃ "আদিম সাহিদ" বলিয়া পরিচিত।* বাবা আদম সম্বন্ধে উক্ত প্রদেশে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে:—

* "সাহিদ্" শব্দার্থ—ধর্ম্মের জন্য যে প্রাণ দান করে তাহাকে বুঝায়। (martyr)

বাবা আদম একজন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী দর্‌বেশ (মুসলমান ফকীর বা সন্ন্যাসী) ছিলেন। বল্লালসেনের রাজত্বকালে এই ব্যক্তি এক দল মুসলমান সৈন্য সমভিব্যাহারে ঐ অঞ্চলে আগমন করেন। রাজবাটী হইতে সার্দ্ধৈক ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে আবদুল্লাপুর নামক একটী পল্লীগ্রামে আসিয়া তিনি সৈন্য শিবির সংস্থাপিত করেন। ইনি কোন সুযোগে এক খণ্ড গোমাংস প্রাসাদ-দুর্গ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করেন। এই ঘটনাতে নৃপতি বল্লালসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েন; এবং কাহা কর্ত্তৃক রাজ্য মধ্যে গো-হত্যা সম্পাদিত হইয়াছে, অবগত হইবার জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করেন। জনৈক বার্ত্তাবহ শীঘ্রগতি আসিয়া সংবাদ দিল যে, একদল বৈদেশিক সৈন্য রাজভবনের অনতি-দূরে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছে। এবং উহাদের সেনা-নায়ক ঈশ্বর আরাধনায় (নেমাজ পড়িতে) নিযুক্ত রহিয়াছেন। বল্লালসেন তৎক্ষণাৎ একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন,— দেখিলেন, তখনও ঐ ব্যক্তি উপাসনায় নিযুক্ত। তিনি অণুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়াই তরবারির এক আঘাতে ঐ অধিনায়কের শিরশ্ছেদ করেন।†

যে সকল কারণে উক্ত প্রদেশীয় জনসাধারণে সর্ব্বাপেক্ষা বল্লালসেনের নাম বিশেষরূপে জ্ঞাত, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। ফলে ইতিহাস অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে, উপরোক্ত ঘটনাটী বল্লাল-সেনের সময়ে সংঘটিত বলিয়া গল্পে উল্লেখ করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। যাহাই হউক, বল্লালসেনের সময়ে যে, এতদ্দেশে মুসলমান সমাগম হয় নাই, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উক্ত বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় সীমার বহির্ভূত বলিয়া এস্থলে উহার উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম।

উক্ত মুসলমান ফকির সাধারণতঃ "বাবারদম্‌" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, "বাবারদম্‌" শব্দটী বাবা আদমের

† Vide Bengal Asiatic Society's Journal Vol XLII, pp. 285.

অপভ্রংশ মাত্র। উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের বর্ণন শুনা যায়। প্রত্যেকটীই অতি সামান্য প্রকার পরিবর্ত্তিত আকারে কথিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, বাবা আদম এককই আসিয়াছিলেন। কাহারও মতে তিনি একদল সৈন্য সহকারে সমাগত হয়েন। এ সম্বন্ধে আর একটী গল্প এইরূপ প্রচলিত আছে, যথা :—

'মুসলমানগণ আগত প্রায়,'—এই বার্ত্তা জ্ঞাপিত করিয়া নৃপতিকে সতর্ক করিবার জন্য জনৈক মুনি রাজভবনে উপনীত হয়েন। ভূপাল নিদ্রিত থাকায়, কেহ তাঁহাকে জাগরিত করিতে সাহস করেন নাই; সুতরাং, মুনি ফিরিয়া চলিয়া যান। তিনি দ্বিতীয়বার—তৃতীয়বার সমাগত হইলেন, কিন্তু নৃপতিকে কোনরূপে বিনিদ্রিত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন না। ফলে তৃতীয়বারেও ভূপালসহ সাক্ষাৎকার সংঘটিত না হওয়াতে তিনি একটী নীরস পল্লব আহরণ পূর্ব্বক ভূমিতে রোপিত করিলেন। গমনকালে ধীর গম্ভীর স্বরে—অতীব তাপিত অন্তরে—দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক,—সর্ব্বকালে, সকল জনগণবিদিত সেই অশুভ-সূচক বাক্য,—"ললাট লিখন কে খণ্ডাতে পারে?"—উচ্চারণ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার পর কেহ আর তাঁহার দর্শন লাভ করেন নাই,—কোথায় যে গমন করিলেন, তাহাও আর কেহ বলিতে পারিল না। পর দিবস প্রভাত সমাগমে ঐ প্রোথিত শুষ্ক পল্লবটী শ্যামলশাখা-পল্লব-পত্র-বিশিষ্ট একটী পূর্ণায়তন পাদপে পরিণত হইল। তদনন্তর বাবা আদম সমুপস্থিত হইয়া রাজ-প্রাসাদ সম্মুখে, ভূমে জানুদ্বয় সংযোগে উপবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরোপাসনা (নেমাজ) করিতে লাগিলেন। প্রার্থনা সমাপনান্তে যে স্থলে পূর্ব্ব কথিত মস্‌জিদ এবং সমাধিস্থল সন্নিবিষ্ট, তথায় গমন করিলেন। মুনি পুঙ্গবের আগমনবার্ত্তা এবং তৎকৃত প্রক্রিয়ার বিষয় নৃপতি সমীপে বিজ্ঞাপিত হইল—তিনি উহা ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, জনৈক বিজাতীয় সন্ন্যাসী রাজভবনের সম্মুখে বিজাতীয় প্রথায় ঈশ্বরোপাসনা সমাপ্ত করিয়া প্রাসাদের অনতিদূরে যাইয়া অবস্থিতি করিতেছে; তখন তিনি ক্রোধে অধীর

হইয়া ঐ ফকীরকে নিহত করিবার জন্য কয়েকজন শস্ত্রধারী পুরুষ প্রেরণ করিলেন। শস্ত্রীগণ যথা স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ঐ বিজাতীয় বৈদেশিক ফকীর ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত। উহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া—যথায় মস্‌জিদ দণ্ডায়মান, তাহার সম্মুখে—যে স্থানে সমাধিমঞ্চ নির্ম্মিত ঠিক সেই স্থলে—তরবারির একাঘাতে ঐ যবনফকীরের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। এই ঘটনা সম্পাতের অব্যবহিত পরেই একদল যবন সৈন্য সমাগত হইল,—ছলে ও কৌশলে অন্তিম সেননৃপতিকে পরাভূত করিল,—বঙ্গের হিন্দুকুলস্বাধীনতারবি অস্তমিত হইল।

টেলার সাহেব বলেন যে, বাবা আদম বা আদম সাহিদ্‌ একজন কাজী ছিলেন। বাঙ্গালায় মুসলমান আধিপত্যের প্রারম্ভ কালে তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালা শাসন করিতেন।

বাবা আদমের মস্‌জিদটী ইষ্টক নির্ম্মিত। উহা সুষমস্থপতি-বিদ্যা-বিহিত কারুকার্য্যে সমালঙ্কৃত। ইষ্টকালয়ের শীর্ষদেশ ছয়টী কলশ (গম্বুজ) দ্বারায় সমাচ্ছাদিত। মস্‌জিদটীর কায়া অধিক বৃহৎ নহে,—দীর্ঘ প্রায় ঊনত্রিংশ হস্ত পরিমিত এবং পরিসরে চতুর্ব্বিংশ হস্ত মাত্র হইবে। ইহার প্রাচীর গুলির স্থূলতা সার্দ্ধ চারি হস্তের কিঞ্চিদধিক হইবে। সম্মুখস্থ ও পশ্চাদ্বর্ত্তী উভয় প্রাচীর গাত্রে বহিঃস্থ শত্রুর প্রতি গোলা নিক্ষেপ অথবা বাণ বর্ষণ করিবার জন্য বক্রভাবের কতকগুলি ছিদ্র আছে। মস্‌জিদের সম্মুখ দিকে তিনটী খিলানযুক্ত দ্বার, দ্বারের সম্মুখে ছাদ-শীর্ষক অষ্টকোণ বিশিষ্ট স্তম্ভ শ্রেণীর মধ্য দিয়া দুইটী পথ চলিয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভগুলির ব্যাস এক ফুট আট ইঞ্চি হইবে, এবং উহার চতুর্দ্দিকে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট সমভাবের স্তম্ভ স্থাপিত। মস্‌জিদাভ্যন্তরে পশ্চাৎ দিকের প্রাচীর গাত্রে অতীব সুন্দর কারুকার্য্য সম্পন্ন অর্দ্ধ মণ্ডলাকৃতি তিনটী এবং প্রত্যেক পার্শ্বস্থ প্রাচীর অঙ্গে দুইটি করিয়া সমচতুষ্কোণ কুলাঙ্গী খোদিত।

ক্যানিংহাম সাহেব মস্‌জিদ সম্বন্ধে আরও এইরূপ বলেন ;—আমি মস্‌জিদের বহির্ভাগে একখানি কারুকার্য্যযুক্ত ইষ্টক দেখিতে পাই,

উহা উল্টাভাবে প্রাচীর গাত্রে সংলগ্ন। গ্রন্থনকালে অনাবধানতা বশতঃ হঠাৎ ঐরূপ হইয়া থাকিবে। যেখানে ঐ ইষ্টক খানি সন্নিবেশিত উক্ত স্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয়, যেন গ্রন্থনকালে পুরাতন উপকরণাদি ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই অনুমানটী অনেকটা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। যে হেতু প্রথম মুসলমান আক্রমণকালে এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয় নাই। মধ্যস্থিত দ্বারের উপর যে প্রস্তরে খোদিত লিপি রহিয়াছে, উহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, জলাল উদ্দীন ফতেহ সাহর শাসন কালে ইহা নির্ম্মিত হয়।" *

লিপিগুলি আরব্য ভাষার সুদৃশ্য অক্ষররাজিতে বিন্যস্ত। ব্লকম্যান সাহেব ঐ প্রস্তরলিপি এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ;—

'সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেন ;—এই মস্‌জিদ ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত।' 'ঈশ্বরের নামের সহিত কাহারও নাম সম্মিলিত করিও না।' ধর্ম্মোপদেষ্টা, †—ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন!—বলেন ;—'যে ব্যক্তি একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, ঈশ্বর কর্ত্তৃক তাঁহার জন্য স্বর্গে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।'

"৮৮৮ আল-হিজিরার রজবমাহার মধ্যবর্ত্তি সময়ে (১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে) নৃপতি মহাম্মদসাহার পুত্র, ভূপাল জলাল-উদ্‌-দুনিয়া-ওয়া উদ্‌-দিন ফতেহ সাহর পুত্রের রাজত্বকালে, মহান মলিক্‌ কাফুর কর্ত্তৃক এই জমিমস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হয়। ‡

শ্রীঘোরনাথ দত্ত।

---

* Vide Cunningham's Archeological survey of India Report Vol. XL11. p 284.

† মহম্মদ।

‡ Vide Asiatic Society's Journal Vol. Vol XL11, p 284

ফুলহার।

কে যে সে অভাগী বালা
গেঁথেছিল ফুলহার,
সাজাতে কাহার গলা,
ফেলেছিল অশ্রুধার ?

এখানে পড়িয়া মালা
ধূলায় ধূসর কেন ?
শুকায়ে গিয়েছে হায়,
কা'র অনাদরে যেন ;—

আশার সূতোয় বেঁধে,
অশ্রুর শিশির দিয়ে,
কেরে দিয়াছিল গেঁথে,
পরাণে যাতনা নিয়ে ?

ফেলে গেছে ফুলহার,
ফুরায়ে গিয়েছে আশা,
নাহিক পরাণে তার,
ভালবাসা মহাতৃষা ;

পড়েছে কুসুমগুলি,
ধূলার উপরে হায়,
না জানি সে জন হৃদে,
কতই যাতনা পায় !

প্রাণেতে পিপাসা লয়ে,
ভ্রমেছিল আশা করে,
হেরিতে প্রেমিকে তার
পরাণ-নয়ন ভ'রে ;

প্রেমিকের হৃদি-তল,
হায়রে কি সুকঠিন,
তাহার বচনে হায়,
হইলেক উদাসীন !

চলিয়া গিয়াছে সেই
দুঃখে অপমানে জ্বলে,
আর না আসিবে হেথা,
কখন জীবনে ভুলে ;

পৃথিবীর প্রণয়ের,
এই কিরে হ'ল শেষ ;
রহিল না কা'র হৃদে,
সেই প্রণয়ের লেশ ;

না, না, তা হবে না কভু,
প্রণয় যে পারাবার ;
নাহি তার আদি অন্ত
অসীম সলিলাধার ;

হের বালা কেবা অই
আসিতেছে ধীরি ধীরি,
লতার নিকুঞ্জ পানে,
চাহিতেছে ফিরি ফিরি ;

আধ খানা প্রাণ তার
রহিয়াছে দেহ বাসে ;
অপর আধেক যেন,
গিয়াছে কাহার পাশে ;

ওই দেখ ফুলগুলি,
একে একে নিলে তুলি ;
দেখিল কতেক বার
নীরবে নয়ন খুলি ;

চমকি' উঠিছে কভু
"ওই সে আসিল" বলে,
থমকে দাঁড়ায়ে বালা,
আবার খানিক চলে ;

নয়ন তাহার দুটি,
রহিয়াছে শূন্যপানে ;
কি যেন বাজিছে গীত
বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণে ;

এক দুই তিন করি,
গণিলেক ফুল কটি,
নীরবে নয়ন হ'তে,
পড়িলেক ফোঁটা দুটি ;

শুকায়ে গিয়াছে ফুল,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে ডোর ;
তথাপি কি নবভাবে
বালিকা হয়েছে ভোর ;

কতবার চুমে ফুল,
কতবার রাখে মাথে ;
কতবার দেখে চাহি'
রাখিয়া কোমল হাতে ;

চলে যায় আন মনে,
চাহেনা কাহার পানে ;
শুনিয়া মোহিত যেন,
বিশ্বের অনন্ত গানে ;

ক্ষুদ্র তার হৃদিখানি
সঙ্গীতে উঠিল ভরি' ;
মধুর সুস্বর তুলি',
গাইল সুতান ধরি' ;—

'প্রণয় কি সুধাময়
জগত মাঝারেরে !
পরাণ কি সুশীতল
তাহার পরশেরে !

পেলাম না প্রতিদান,
কিবা কাজ প্রতিদানে,
তাঁহার মূরতি স্মৃতি
পূজিব সদাই প্রাণে ;

শুকায়েছে ফুলহার,
যাক্ ফুল শুকাইয়া ;
শুকাবে না কভু এই
প্রণয়-পূরিত হিয়া ;

ফেলে দিলে পুষ্পহার,
ঘৃণায় প্রাণেশ মোর ;
কিন্তু এ পরাণ মোর
সেই ভাবে রবে ভোর ;

তিনি ত পরাণ গান,
তাঁরেই নয়নে হেরি;
তিনি ত আমার প্রাণ
আমি ত সে দাসী তাঁরি;

তাঁহারি চরণ-তলে,
দি'ছি প্রাণ বিসর্জ্জন;
এই বিশ্ব চরাচর
তাঁহারি স্বপন মন;

গাইতে গাইতে বালা,
কাননে চলিয়া গেল;
আর সে কুসুম বনে
নাহিক ফিরিয়া এল;

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

হিন্দুর যোগবল পরীক্ষা।

যে কয়েক জন স্বনাম খ্যাত মহাপুরুষ স্বীয় অসাধারণ কার্য্য-কলাপে নিম্নতর শ্রেণী হইতে উন্নত হইয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কীর্ত্তিতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, অশিক্ষিত হইয়াও রাজনৈতিক গগনে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, মহারাজ রণজীৎসিংহ তাঁহাদের মধ্যে একজন। যখন মোগলের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তপ্রায়, যখন মহারাষ্ট্রার মহাপতন অদূরবর্ত্তী, যখন বীরভূমি রাজ-পুতানার আশা উচ্ছিন্ন, যখন প্রায় সমস্ত ভারত বৃটিস্ সিংহের পদানত, সেই সময়ে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে, পঞ্চনদের গুজরওয়ালা নামক স্থানে এই শীখ-বীরকেশরী জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে স্বীয় বুদ্ধিবলে ও বীরত্বে তিনি তদানীন্তন প্রবল পরাক্রান্ত শিখ সর্দ্দারগণকে পরাজিত করিয়া সমুদয় পঞ্জাবে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতঃ এককালে লাহোরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব করেন। তিনি স্বীয় অদ্ভুত প্রতিভাবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজ এককালে সমস্ত ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করিবেন। তিনি বাল্যকালে মান-চিত্র দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "সব্ লাল হো যাগা" অর্থাৎ সমস্ত ভারতের মানচিত্র একদিন ইংরেজাধিকারের চিহ্নস্বরূপ লাল

বর্ণে রঞ্জিত হইবে। তিনি কখনও ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, যাবজ্জীবন ইংরেজবন্ধু হইয়া—শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া মিত্রভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন; ইংরেজও তাঁহাকে চিরসুহৃদজ্ঞানে মহারাজ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

এই বীরকেশরীর হিন্দুর যোগবলের প্রতি অত্যন্ত আস্থা ছিল, যোগী ও মহাপুরুষ দেখিলেই তিনি তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি প্রদর্শন ও নানা প্রকারে তাঁহাদের হিতসাধন করিতেন। এই সময়ে হরিদাস নামক একজন মহাপুরুষ যোগী আবির্ভূত হন। মহাতীর্থ পুষ্করে তাঁহার আশ্রম, তিনি সশিষ্য কখনও কখনও পঞ্চনদ প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতেন ও স্থানে স্থানে রাজন্যবর্গের অনুরোধে তাঁহার বহুকালোপার্জ্জিত আশ্চর্য্য যোগবলের অদ্ভুত শক্তি দেখাইয়া সমবেত জনগণকে মোহিত ও স্তম্ভিত করিতেন। ইঁহার মহীয়সী শক্তিতে তদানিন্তন উচ্চ ইংরেজ কর্ম্মচারীরা ও গবর্ণর জেনারল পর্য্যন্তও তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইয়া তাঁহার অদ্ভুত যোগ শক্তির পরীক্ষা দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু যোগী আসিতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি তিন চারি মাস অনশনে সমাধিস্থ হইয়া মৃতবৎ ভূগর্ভে নিহিত থাকিতে পারিতেন, জলের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন এবং মৃত্তিকা হইতে উঠিয়া শূন্যে বিরাজ করিতে পারিতেন। পঞ্জাব অঞ্চলে অনেক স্থানে তিনি সমাধিস্থ হইয়া ও যোগবলের অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখাইয়া গিয়াছেন মহারাজ রণজীৎ সিংহের সভায় তাঁহার সমাধির যে পরীক্ষায় কি হিন্দু, কি যবন, কি ইংরেজ সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন তাহারই কথঞ্চিৎ এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসন কালে মহারাজ রণজীতের রাজসভায় হরিদাস যোগী তাঁহার অদ্ভূত যোগবল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার অমানুষিকী শক্তিতে তদানীন্তন পলিটিক্যাল এজেণ্ট ওয়েড্ সাহেব, রেসিডেণ্ট সার্জন্ ম্যাকগ্রেগার, ডাক্তার মরে, জেনারাল্ ভেঞ্চুরা ও ম্যাকনাটন প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ মোহিত ও স্তম্ভিত

হইয়া হিন্দুর যোগবলের মহীয়সী শক্তিকে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। যাহা কর্ণে শুনিলে অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়, যাহা চক্ষে দেখিলে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য বিষয় আর কি হইতে পারে? হিন্দু হইয়াও অনেকে এই হিন্দুর যোগবলে পরিহাস করিয়া থাকেন। আমরা যে অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত আছি, ঈদৃশ মহীয়সী শক্তি যে আমরা মনেও আনিতে অক্ষম, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। এই যোগবল প্রভাবে আর্য্য মহাপুরুষেরা যে কত অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আজিও দেবভাবে পূজিত হইতেছেন, শাস্ত্রই তাহার এক মাত্র প্রমাণ। হিন্দু হইয়া হিন্দুশাস্ত্রে অবিশ্বাস! কিরূপ হিন্দুত্ব তাহা জানি না।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে কুমার নবনিহাল সিংহ বাহাদুরের শুভ পরিণয়োপলক্ষে বহুসংখ্যক দেশীয় নরপতিবর্গ লাহোরে শুভাগমন করেন। ঘটনাক্রমে মহাপুরুষ হরিদাস যোগীও এই সময়ে সশিষ্য পঞ্জাব পরিভ্রমণ করিতে করিতে লাহোরে আসিয়া উপনীত হন। মহারাজ পুণ্যাত্মা সিদ্ধপুরুষের গুণগ্রাম পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারে রাজধানীতে সমাগত জানিয়া দুত দ্বারা সভায় আনয়ন করান। যোগীর অশেষ প্রকারে সম্মাননা করিয়া পরিশেষে তাহার যোগবলের মহীয়সী শক্তি প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করেন। যোগীবর অদ্য হইতে অষ্টম দিনে সমাধিস্থ হইয়া চল্লিশ দিন ভূগর্ভে সমাহিত থাকিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়া সমাধির পূর্ব্ব অনুষ্ঠান করিবার জন্য আশ্রমে চলিয়া আসেন। তিনি প্রথম দিবস মৃদু বিরেচক সেবনে দেহস্থ ক্লেদ পরিষ্কার করিয়া অর্দ্ধ সের খাঁটী দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই আহার করিলেন না। ষষ্ঠ দিবস পর্য্যন্ত ক্রমশ অধিকতর জলমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়াই অতিবাহিত করিলেন, এবং সপ্তম দিবসে নিরম্বু উপবাসী রহিলেন। তিনি নিত্য প্রাতঃস্নান করিতেন; স্নানের সময় শরীরের নবদ্বারের যে কোন দ্বার দিয়া জল আকর্ষণ করিয়া উদরস্থ অন্ত্রাদি পরিধৌত করিয়া, দ্বারান্তর দিয়া জল বাহির করিয়া দিতেন, এবং অনতিপরিসর এক খণ্ড

সুদীর্ঘ বস্ত্রের একাগ্র বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্ঠাংশ উদরস্থ করিতেন, ও তদ্বারা পাকস্থলী পরিষ্কৃত করতঃ পুনরায় টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতেন। ইহাই তাঁহার সমাধির পূর্ব্বানুষ্ঠান।

অষ্টম দিবসে মহাপুরুষ মহারাজ-দরবারে সমুপস্থিত। যোগের অদ্ভুতশক্তি দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে আজ কি হিন্দু, কি ইংরেজ, কি মুসলমান সকলেই লাহোরের দিকে চলিয়াছেন। লাহোর নগরী লোকারণ্য। যোগী স্বয়ং মহারাজ, অন্যান্য শীখ সর্দ্দারগণ ও প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারীর সমক্ষে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া, হৃদ্‌পদ্মে হস্তদ্বয় রক্ষা করিয়া, জিহ্বা উল্টাইয়া তালুতে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে শরীর স্পন্দহীন, শীতল ও শক্ত হইয়া গেল ; হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া ও নাড়ীগতি বন্ধ হইল, ডাক্তার সাহেবেরা শরীর পরীক্ষা করিয়া মৃতের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান দেখিলেন। শিষ্যেরা তাঁহার সর্ব্বশরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া লৌহসিন্দুকে আবদ্ধ করিল। মহারাজ স্বহস্তে চাবি দিয়া চাবি নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন এবং কুলুপে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত শীলমোহর অঙ্কিত করিয়া দিলেন। উদ্যান মধ্যস্থ এক গৃহে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে লৌহসিন্দুক প্রোথিত করিয়া প্রস্তর ও পরে মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পরিপূর্ণ হইল। গৃহের দ্বার ও জানালা গাথাইয়া বাহিরে শত প্রহরীকে শসস্ত্রে পাহারায় নিযুক্ত করা হইল।

পূর্ব্বনির্দ্ধারিত চত্বারিংশৎ দিবসের প্রাতঃকালে পুনরায় উদ্যান লোকারণ্য। সমবেত দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে মহারাজের আজ্ঞায় দ্বারের গাঁথনী ভঙ্গ হইল। তাঁহার স্বনামাঙ্কি ঠিক সেই কুলুপ দেওয়া সিন্দুক উত্তোলিত হইল। সিন্দুক খুলিয়া সকলে দেখিলেন, যোগী সেইরূপ যোগাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার উদরচর্ম্ম মেরুদণ্ডে সংলগ্ন হইয়াছে। শিষ্যেরা ঘৃত দ্বারা জিহ্বা কোমল করিয়া আস্তে আস্তে তালু হইতে সরাইয়া দিল এবং মস্তকে পর্য্যায়ক্রমে শীতল ও ঈষদুষ্ণ জল অল্প অল্প দিতে দিতে এবং কর্ণ ও নাসিকায় সজোরে ফুৎকার প্রদান করিতে করিতে, অল্পে অল্পে হৃদয়ের কার্য্য পুনরাব্ধ হইল, যেন মৃতদেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইল, আবার চক্ষু উন্মীলিত

হইল। কিঞ্চিৎ লঘুপাক দ্রব্য আস্তে আস্তে আহার করিয়া যোগী দুই একটী কথায় মহারাজের সহিত আলাপ করিয়া শিষ্য ক্রোড়ে আশ্রমে নীত হইলেন। তিনি দুই তিন দিবস পরে আবার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেন।

কেবল এই একবার নহে, এই মহাপুরুষের মহিয়শী শক্তির পরীক্ষা আরও অনেকস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ তারিখে তিনি জশল্মীরের রাজা মহারাওন বাহাদুরের অনুরোধে একবার সমাধিস্থ হইয়া একমাসকাল ভূগর্ভে নিহিত ছিলেন। ইহার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে অমৃতসরে একবার সমাধিস্থ হইয়া একমাস কাল ভূগর্ভে ছিলেন। জয়স্রোতে একবার তিনমাসকাল মৃত্তিকামধ্যে থাকিয়াও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। সমাধি হইতে উঠিলে তিনি কয়েক দিবস সূর্য্যালোক সহ্য করিতে পারিতেন না, এজন্য কিছুদিন তাঁহাকে অন্ধকার গৃহে থাকিতে হইত। ক্রমে স্বাভাবিক মলমূত্র নির্গত হইলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার অন্ত্রের কোনস্থান পচিয়া যায় নাই।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই মহাপুরুষকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান লইতেন। সমাধি হইতে উত্থিত হইলে মহারাজ তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকে মণিময় কুণ্ডল, স্বর্ণহার স্ফটিকমালা এবং বহুমূল্য উৎকৃষ্ট শাল পুরস্কার দিয়াছিলেন।

এই যোগীবর ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে একবার আজমীরে জনৈক ইংরেজের নিকট তাঁহার যোগবলের পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু এবার সমাধি পরীক্ষার বিষয় নয়। এবারে একজন তাঁহার দুই চক্ষু বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া দিলেও তিনি অনায়াসে সম্মুখস্থ পুস্তকের ছত্রে ছত্রে অঙ্গুলী দিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, তাঁহার একটি অক্ষরও ভ্রম হয় নাই। যোগবলের ঈদৃশী শক্তিতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং অনেকে তাঁহার আকৃতির ফটোগ্রাফ্ তুলিয়া লইয়া ছিলেন।

এই সকল বিষয় সামান্য দৃষ্টিতে অদ্ভুত ও অলৌকিক বোধ হইলেও যোগবলের নিকট ইহা কিছুই নহে। যোগ ও যোগাভ্যাসের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের যোগশাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। সেই

সকল যুক্তি ও অভ্যাসের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে যোগ সাধন বা সমাধি কিছুই আর অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় না। শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার সংযম, দেহ শুদ্ধি ও মনঃস্থিরকরণ অভ্যাসই যোগ-শাস্ত্রের মূলভিত্তি। এই যোগশাস্ত্র আমাদের অমূল্যরত্ন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সেই হবিষ্যান্ন ভোজী আর্য্যঋষিগণের মস্তিষ্কপ্রসূত অক্ষয় ভাণ্ডার। আজ কালবশে হতবীর্য্য কুলাঙ্গার আর্য্যসন্তান আমরা স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অক্ষয় কীর্ত্তিভাণ্ডারের অমূল্যরত্নে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। আমাদের বস্তুতে আমরা আদর করিতে জানিনা, আমাদের মহামূল্য রত্নের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আজ আমরা শিক্ষায়, দীক্ষায়, উপদেশে, আজ আমরা পরমুখাপেক্ষী। আর্য্যসন্তান আজ সুদূরদ্বীপ নিবাসী ম্লেচ্ছের নিকট শিক্ষার ভিখারী! এদৃশ্য দেখা অপেক্ষা সাগরবক্ষে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াই ভাল। যে যোগশাস্ত্রের কথঞ্চিৎ অলো-চনায় অল্‌কট প্রমুখ ইউরোপীয় সম্প্রদায় মোহিত, যে যোগশাস্ত্রের মাহাত্ম্যে আজ আমেরিকা স্তম্ভিত, সেই পৈতৃক ধনে আজ আর্য্য-সন্তান বঞ্চিত, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

পুরাকালে এই ভারতবর্ষই আধ্যাত্মিক যোগীগণের প্রিয়ভূমি ছিল। তাঁহাদের কীর্ত্তিতে, তাঁহাদের যোগবলে, তাঁহাদের অমানুষীকি শক্তিতে জগৎ মুগ্ধ হইত। আজ আর সেকাল নাই,—সে গৌরব-সূর্য্য এখন অস্তমিত হইয়াছে, আমরা পবিত্র আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্য-সন্তান, আমরা আজ অন্তঃসারশূন্য—অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন। ভারতের এ অমানিশি প্রভাত হইবে কিনা, কে বলিতে পারে? ইহা মানব জ্ঞানের অতীত। সেই যোগীবর, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবর এখন অন্তর্হিত, এখন আর পাপীর মধ্যে তাঁহাদের শুভাগমন অসম্ভব! তাই বলি, ভবিষ্যৎ আর কে বলিয়া দিবে? জগদীশ! তোমার অপার কৃপাবলে তোমার আকাশবাণীতে একবার এই অধঃপতিত পাপী সন্তাগণকে বলিয়া দাও, কবে এই অমানিশি প্রভাত হইবে? কবে আবার ভারতে সুখ সূর্য্য উদিত হইবে? সকলই কালের খেলা!

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

সেকন্দ্রা।

মূর্ত্তিমান অতীতের মহাসাক্ষী, বিধাতার লীলাদর্পণ, মনুষ্য জীবনের উন্নতি ও পতন লীলার সুবিশাল ক্ষেত্র, যাহার প্রতি অক্ষরে মানবের জীবন-যুদ্ধের জয় পরাজয় সুগভীর ভাবে অঙ্কিত, যাহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মানব জীবনের জটিল ঘটনাবলী, মানব জীবনের নশ্বরতা বিশ্লিষ্ট ও প্রতিপাদিত, যাহা পাঠে এই চঞ্চল নশ্বর জগতের কি ছিল, কি হইল! কি হয়, কি হ'বে, কি রবে—এই ঐন্দ্রজালিক মায়ামণ্ডিত বিষয় সকল অবগত হইতে পারা যায়, যাহার অন্তরে জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগের পূর্ণ বিকাশ,—সেই ইতিহাসকে আমার সহস্র সহস্র প্রণাম। শৈশবের অফুটন্ত মনে, অতীতের অস্ফুট চিন্তা যখন প্রথম দেখা দিল, তখন মন এক নবভাব ধারণ করিয়া পৃথিবীতে পরিভ্রমণে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া, সেই নবউন্মোচিত অন্ধকার—পরে অতীতের মহান্ দৃশ্যাবলী চক্ষু হৃদয় মন আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল—বর্ত্তমানের প্রখর কর অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। অতীতের অভেদ্য গাঢ় অন্ধকার বড়ই মানোরম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারে অবস্থিতিকালে "সেকন্দ্রা" আকবর সাহেবের সমাধি মন্দির একদা নয়ন পথের পথিক হইয়াছিল। আজ সেই সেকন্দ্রার সম্মুখে আমি সমুপস্থিত। আমার মন এখন কোথায় তাহা কে জানে?

আগ্রা হইতে সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরে ভারতের প্রসিদ্ধ সম্রাট আকবর শাহের এই সমাধি মন্দির অবস্থিত। সমাধি মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ উদ্যানের সহিত ধরিলে ইহার পরিমাণ ৪৪ বর্গ-বিঘা, মধ্যস্থিত কবর স্থানের উচ্চতা ১০০ ফুট। মন্দিরের গঠন, কতকটা হিন্দু, কতকটা মুসলমান, কতকটা বা বৌদ্ধ ধরণের। ইহা দেখিয়া শাহ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, সকল প্রজাকেই সমভাব দেখিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যখন উক্ত সমাধি মন্দির দর্শনার্থ সেকন্দ্রাবাদে উপস্থিত হই, তখন মধ্যাহ্ন। দূর হইতে সেকন্দ্রা আমাদের এদেশের বৃহৎ মস্‌জিদ্‌ সদৃশ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

নিকটস্থ হইলে দেখা গেল, তাহার চারিকোণে চারিটি মিনার বা উচ্চ স্তম্ভ। মধ্যস্থলে সুন্দর ত্রিতল সমাধি মন্দির।

প্রথম, অর্থাৎ ভূমিসংলগ্নতলে আক্‌বর সাহেবের দেহ প্রোথিত আছে, তাহার উপরে কোনও আবরণ বা বেদি নাই। বেদি দ্বিতীয় তলে আছে। উহা সুন্দর শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরে গঠিত ও তাহার উপর বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে পারস্য ভাষায় বোধ হয়, আকবরের সাহের জীবনের ঘটনাবলির সার-সংগ্রহ লিখিত আছে। উক্ত সমাধি মন্দিরের অনেক স্থলে বহুমূল্য প্রস্তরাদির দ্বারা সুসজ্জিত ছিল, কিন্তু বিশেষ বৈদেশিক উৎপাতের মধ্যে পড়িয়া সে সকল অপহৃত হইয়াছে। অপর রঙ্গিলা কাচ এখন তাহাদের স্থান অধিকার করতঃ বিরাজ করিতেছে। আকবর সাহের মস্তক যে দিকে, সেই দিকে শুনা যায় একখানি বহুমূল্য বৃহৎ হীরক সংলগ্ন ছিল। এখন একটী সুগভীর গর্ত্ত রহিয়াছে। আমাদের দেশের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরাল লর্ড নর্থব্রুক্ বাহাদুর স্বীয় উদারতাগুণে গবর্ণমেণ্টের কোষ হইতে ব্যয় করিয়া উক্ত মহাজনের সমাধি বেদির উপর একখানি ১০০০০৲ টাকা মূল্যের কিংথাপের আবরণ প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ আর একটী সেই সমাধি মন্দিরের তৃতীয় তলেও বর্ত্তমান আছে।

যে ভারত সম্রাট ১৫৪২ খ্রীঃ হইতে ১৬০৫ অব্দ পর্য্যন্ত ৬৩ বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাকে প্রজা মাত্রেই "জগদীশ্বর" বলিয়া মান্য ও ভক্তি করিত, যাঁহার প্রভাবে প্রায় ভারতীয় সমুদয় ব্যক্তিই অবনত মস্তক হইতেন, কালবশে আজ তাঁহার সে প্রভাব অতীতের ঘোর আঁধারে মিশিয়া গিয়াছে। তিনি যে কি মহান উদার নরপতি ছিলেন, সেকন্দ্রা তাহার কতটুকু পরিচয় দিতে পারিতেছেন? যদি অতীত সাক্ষী ইতিহাস না থাকিত, তবে আমাদের সে কথা শুনাইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে কে শিখাইয়া দিত?

নশ্বর জগতে কিছুই চিরকাল থাকে না—থাকিবেও না, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সেই মহাশয়েরই অনন্ত শক্তি বলে আজ আকবর সাহ

নাই, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতাপও বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার এক মাত্র স্মৃতি চিহ্ন "সেকন্দ্রা"। তাহাও যদি কখনও কালবশে চলিয়া যায়, তবে কি আকবর সাহের সমস্ত গুণগরিমার সৌরভ জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে? তাহা কখনই নহে। যত দিন ইতিহাস থাকিবে, তত দিন লোক তাঁহাকে জানিতে পারিবে ও তাঁহার মহিমায় মোহিত হইয়া পড়িবে।

"চলচ্চিতং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং।
চলাচলেতি কালসর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি॥"

র'বে একা স্থির।

ধীরে ধীরে যায় ব'য়ে জীবন প্রবাহ
জানি না কোথায়?
কি উদ্দেশ্য সাধিবারে, কি সাধিনু তার
বুঝিনু না হায়!
যে আশা বাসনা সাধ ধরিনু এ বুকে,
পূর্ণ যত খানি,
কি সন্তোষ, কি উদ্দেশ্য সাধিল জীবনে
নাহি বুঝি—জানি!
অতৃপ্ত রহিল যারা জীবনের মাঝে
সজল নয়নে,
তাতেই বা কি অশুভ—কিবা বেশী দুঃখ
হ'ল এ জীবনে?
যে খেলা খেলিতে হ'বে, রয়েছে চিত্রিত
ভব-রঙ্গ-পটে!
যাহার যেরূপ খেলা, সেইরূপ তার
আয়োজন বটে!

সুখ-দুঃখ, আশা-তৃষা, মায়া-মোহ সবি
সেই পরিমাণ!
পলকে উল্টাতে চাহ সেই দৃশ্যপট
কি মূঢ়—অজ্ঞান!
যে সৌভাগ্য যে উন্নতি যে সুখের লাগি'
ভূমে পাড়ি' চাঁদে
চাহ শক্তি দেখাইতে—নিকৃতির তৌলে
তুলিত আগেতে!
জীবন-প্রবাহ বহি' যায় যেই দিকে
চল অনুক্ষণ।
কোথা' যা'বে—কি হইবে—সে তত্ত্বে তোমার
নাহি প্রয়োজন!
মরতের হাসি কান্না, ধূলা-খেলা এই
ইহাই লইয়া,
জীবন-সীমায় বসি' হইবে খেলিতে
বাঁচিয়া—মরিয়া!
ভেঙ্গে যাক বুক তায় শত বজ্রপাতে,
করুক দংশন
বিষাক্ত সহস্র ফণি, অথবা বৃশ্চিক,
তবু আজীবন,
অটল অচল মত—সর্ব্ব অবস্থায়
রবে একা স্থির।
নতুবা ভ্রুকুটি করি ঠেলিবে ঘৃণায়
সবে পৃথিবীর!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

দারোগার দপ্তর—এই বৈশাখ মাস হইতে "দারোগার দপ্তর" চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ দারোগা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণেতা ও সুযোগ্য শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী প্রকাশক এই মহাশয়দ্বয়ের যত্নে "দারোগার দপ্তর" ক্রমশঃ বিশিষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। হস্তগত "মুণ্ডচুরি" বেশ হইয়াছে। অসার নাটক নভেল প্লাবিত বঙ্গদেশে এ প্রকার গ্রন্থ, পাঠকগণের রুচির পরিবর্ত্তন করিতেছে দেখিয়া আমরা অধিক সন্তুষ্ট।

জ্যোৎস্না-হার—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। চুঁচুড়া "জ্যোৎস্না-হার" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। যে দেশে সংবাদ ও সাময়িক পত্রের যত বাহুল্য, শুনিয়াছি সেই দেশের উন্নতির আশা তত অধিক। বাঙ্গালা দেশে এ কথাটা কতদূর খাটে বলিতে পারি না। আমরা দেখিতে পাই—বঙ্গ দেশের প্রায় কোন সাংবাদ বা সাময়িক পত্রের অবস্থা ততটা আশাপ্রদ নহে। এক চুঁচুড়া হইতে প্রায় চার পাঁচ খানি সংবাদ ও সাময়িক পত্রের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সকল গুলির অবস্থা কেমন জানিনা। কার্য্যটা চুঁচুড়ার উন্নতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য দিকে দেখিতে গেলে ঘোর অবনতির নিদর্শন। ভিন্ন ভিন্ন পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব দেখিয়া বোধ হয়, চুঁচুড়ার অস্থয়ার হিড়িকে একতার সূত্র ছিড়িয়াছে, তাই প্রত্যেকেই এক এক জন স্বনামধন্য হইতে ব্যস্ত। বোধ হয় চুঁচুড়ার অবস্থা বাস্তবিকই এইরূপ, সুতরাং উন্নতির প্রকৃষ্ট লক্ষণ!! যাহাহউক হস্তগত "জ্যোৎস্না হার" পরিচালন কার্য্য মন্দ হইতেছে না। মুদ্রাকর প্রমাদে "জ্যোৎস্না-হারের" হার হইয়াছে! আশা করি পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষেরা এ বিষয়ে সাবধান হইয়া পত্রিকার গৌরবশ্রীবর্দ্ধনে সচেষ্ট হইবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে "জ্যোৎস্না-হারের" উন্নতি প্রার্থনা করিতেছি।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

২য় খণ্ড। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

তুমি।

আঁধার বরষা-রাতে,
ছিলে বিজুলির হাসি ;
উত্তপ্ত মরুতে—স্নিগ্ধ
শীতল সলিল রাশি।

পথ-ভ্রান্ত-আশাহীন
সন্দেহে আকুল প্রাণী—
ভীত পথিকের চিতে
বিশ্বাস—আশ্বাস-বাণী।

কুহক-দুরিত-পূর্ণ
অভাগ্য জীবনে মোর,
দেবতার আশীর্ব্বাদ
শান্তির সৌরভে ভোর।

বিমুক্ত বায়ুতে ভেসে
কি এক সৌরভরাশি
নিশ্বাসে—জাগয়ে মৃত,
ম্লান-মুখে ফুটে হাসি।

অদৃশ্য বিহগী কোন ;
যেখানে সেখানে রই,
শুধু বাজে শ্রবণেতে
সু-স্বর লহরী অই।

তোমা ভিন্ন এ জীবন
দেখ, কি হয়েছে আজ !
পিশাচের রঙ্গ-ভূমি
পৈশাচিক রঙ্গ নাচ !

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাসি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"দেশ দেশ পর, সো শ্যাম সুন্দর, ফিরে তুয়া লাগিরে"—বঙ্কিম।

সন্ধ্যা বেলা একটী বালিকা বলিল,—"দাদা! বাগানে যাবি?" তখন আকাশে বেলা ঝিকিমিকি করিতেছিল। বালক বলিল,—"যাব।"

বালিকাটী রাধানাথ দত্তের কন্যা, বয়স ৭ বৎসর, নাম হাসি, দেখিতে পরমাসুন্দরী। শুনিয়াছি, তাহার আসল নাম হাসি নয়, প্রভা। সর্ব্বদাই হাসিত বলিয়া সকলে তাহাকে হাসি বলিয়া ডাকিত। রাধানাথ দত্ত দরিদ্র। পূর্ব্বে ধনী ছিলেন, ভাগ্যদোষে সকল ধন সম্পত্তি হারাইয়াছেন। এখন কালিকাপুরের এক নিভৃত স্থানে স্ত্রী, কন্যা লইয়া বাস করিতেছেন। স্ত্রীর নাম প্রসন্নময়ী। স্ত্রী গুণবতী, অল্পেই সন্তুষ্টা। বালিকাটী প্রভাত-বিকসিত কুসুমের ন্যায় সদাই প্রফুল্ল; দরিদ্রের ইহাই সুখ।

বালকের নাম প্রমোদ, বয়স ১০ বৎসর, দেখিতে সুন্দর। পিতা রামপ্রসাদ বসু গ্রামের জমিদার, বিখ্যাত ধনী। তাঁহার এখন দ্বিতীয় সংসার। স্ত্রীর নাম সারদা। প্রমোদ প্রথম পক্ষের সন্তান। প্রমোদের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী আছে, কাটোয়ায় তাহার শ্বশুরালয়—পিতার দারান্তর পরিগ্রহের পর আর কখনও আসে নাই। সারদার সন্তানাদি নাই, তবে শক্রর মুখে ছাই দিয়া ভাই, ভাইপো, বোন্‌পো, বোন্‌ঝি নয়টী; তা'ছাড়া মাসী পিসীর সংখ্যাও অল্প নহে। তাহারা রামপ্রসাদকে বড় ভালবাসে, এমন কি রামপ্রসাদকে না দেখিয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারে না, কাজেই সহস্র কাজ ফেলিয়াও তাহাদিগকে কালিকাপুর-ভবনে স-শরীরে বর্ত্তমান থাকিতে হয়। রামপ্রসাদ কি তাহাদের পর গা?

বাড়ীর অল্প দূরেই রাধানাথের কুটীর। প্রমোদ হাসিকে দেখিত, হাসি প্রমোদকে দেখিত, দু'জনে ভাব হইল ; রোজ সন্ধ্যাবেলা দু'জনে খেলা করিত। আজও প্রমোদ হাসির কাছে গেল—হাসি বলিল, "দাদা! বাগানে যাবি?" প্রমোদ বলিল,—"যা'ব।"

দু'জনে বাগানে গেল। রামবাবুর খিড়কীর বাগান, ধনীর বাগান—দুই ধারে সেফালিকা, ভায়ওলেট, জুঁই, গোলাপ, মল্লিকা প্রভৃতি নানাজাতি দেশী, বিলাতী ফুলগাছের কেঁয়ারী, মধ্যে লাল পথ, পুষ্করিণীর পাড় পর্য্যন্ত। পুষ্করিণীর চারিধারে তালগাছের সারি, সম্মুখে সানের ঘাট। হাসি আসিয়া চাতালে বসিল, বালক রাণায় বসিয়া পা দোলাইয়া জলে মাছের সাঁতার দেখিতে লাগিল। আলো উপরে উঠিতে লাগিল, ছায়া নীচে নামিতে লাগিল। ঘাটের উপর বকুল গাছ। সন্ধ্যার শীতল বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বকুলফুলগুলি পুষ্করিণীর কাল জলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, বালিকা বলিল,—"দাদা! ধর্ ধর্ ধর্।"

বালক বলিল,—"তুই আগে আমাকে ঐ—ঐ গোলাপ ফুল্‌টা ছিঁড়ে এনে দে, আমিও তোকে জল থেকে ফুল তুলে দেব।"

হাসি বলিল,—"আচ্ছা, তা'হলে দিবি?"

প্রমোদ। দেব। আচ্ছা ভাই! বৈষ্ণবী দিদি কি গান্‌টা গায় জানিস্? আমার মনে পড়্‌ছে না।

হা। সেই যে—রাই-কমল—না—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে—শ্যাম রবি বিনে আমার রাই-কমল শুকা'ল জলে—

প্র। হ্যাঁ হ্যাঁ—গা না ভাই!

হা। না ভাই! আমার লজ্জা করে।

প্র। আমি যে ভাই তোর খেলুড়ী, আমার কাছে লজ্জা? আচ্ছা থাক্—আমি ফুল দেব না।

সরলা বালিকা প্রমোদের হাত টানিয়া বলিল,—"রাগ করিস্‌নে ভাই! গাচ্ছি, তুইও গা না।"

তখন উভয়ে আধ আধ কথায়, হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া, অস্ফুট স্বরে বৈষ্ণবী দিদির "রাই-কমল" ধরিল—

"শ্যাম-রবি বিনে আমার রাই-কমল শুকাল জলে,
অকালে ঝরিল কলি সই!
আমার রাই-কমল যে বেঁচে নাই—
সে যে———"

এমন সময়ে কে ডাকিল—"প্রমোদ! পিসে মশাই ডাক্‌ছেন।" প্রমোদ ফিরিয়া দেখিল—তারাপদ। তারাপদ সারদার ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রমোদ উঠিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—"ভাই হাসি! আজ থাক্, ফুলটা রহিল, কাল তুল্‌ব।"

হাসি একটু হাসিল, বড়-বড় ভাসা-ভাসা চোখ হু'টী তুলিয়া প্রমোদের দীপোজ্জল, বিশাল অট্টালিকার দিকে একবার চাহিল, ধীরে ধীরে চোখ হু'টী নামাইয়া আপনার অন্ধকার ক্ষুদ্র কুটীরের দিকে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহার পর সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। এখন হাসি বালিকা নয়—কিশোরী, প্রমোদও বালক নহে—কিশোর। রাধানাথের মৃত্যু হইয়াছে। প্রসন্নময়ীকে চিরদুঃখিনী করিয়া রাধানাথ কোন্ অদৃষ্ট, অজানিত দেশে চলিয়া গিয়াছেন। প্রসন্নময়ী বিধবা, প্রসন্নময়ী দুঃখিনী। দুঃখিনীর কিছু নাই; আছে শুধু একটী ফুটন্ত কুসুম—নিদাঘ-বিদগ্ধ কাননের এক প্রান্তে আপনি ফুটিয়াছে, আপনি শুকাইতেছে! জগৎ নিষ্ঠুর—জগৎ কাননের গোলাপ চাহে না, জগৎ চাহে—উদ্যানের সৌরভ-হীন শ্বেত টগর।

হাসি আর প্রভাতের হাসি-মাখা, আধ-ফোটা সেফালিকা নয়, এখন সে প্রদোষের মলিনমুখী কমলিনী। কি সুখে হাসি হাসিবে? হাসির পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, ভগ্নী নাই, ধন নাই, গৃহ নাই—কিছুই নাই, কি সুখে সে হাসিবে? দরিদ্র-কন্যা, কেহই তাহাকে বিবাহ করিবে না। প্রমোদ? তুমি কি বিবাহ করিবে? না না, সে ধনী,

তাহার কি হাসিকে মনে আছে? সে এখন কলিকাতায় এফ্-এ পড়িতেছে। তাহার বৃহৎ অট্টালিকা, অসংখ্য দাস-দাসী, কত ধনী তাহাকে জামাতা করিতে উৎসুক। তাহার কি দরিদ্র-কন্যা হাসিকে মনে আছে? অসম্ভব! হাসির বাঁচিয়া ফল কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূজার ছুটিতে প্রমোদ বাড়ী আসিল। বাড়ীতে পূজার ভারি ধূম। কাটামোতে মাটি পড়িল, রং চড়িল, নির্জীব কাটামো হাসিয়া উঠিল। ঢাকে কাটি পড়িল, বালকের মন নাচিয়া উঠিল। নূতন কাপড়, নূতন জামা, নূতন মন। সকলই নূতন—প্রকৃতির শোভাও নূতন। বর্ষা-ম্লান প্রকৃতির মুখে শরতের রজত-হাসি ফুটিয়াছে। গাছে ফুল, বিলে জল, আকাশে পাখী, হাটে মাঠে ধান। বাঙ্গালীর নির্জীব হৃদয়ে বহুদিনের পর সজীবতার লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধনীর অট্টালিকা হইতে দরিদ্র কৃষকের পর্ণ কুটীর পর্য্যন্ত একই আনন্দস্রোত প্রবাহিত। কৃষক-বালিকা একখানি রঙ্গিল কাপড় পরিয়া ঠাকুর দেখিতে যাইতেছে, মাতা হাসি-ভরা মুখে স্বামীকে বলিতেছে,—"চল, ঠাকুর দেখ্‌বে না?" স্বর্গ আর কোথায়?

প্রমোদ বাড়ী আসিল। পিতার বারম্বার অনুরোধে কন্যাও আসিল—কন্যার নাম কিরণবালা। কিরণ আসিয়া দেখিল, মায়ের ঘরে সৎমা। কাঁদিয়া ঠাকুরমার কাছে গেল। ঠাকুর-মা কাঁদিয়া বলিলেন,—"কাঁদিস্‌নে বোন্, তোদের দেখেই আমি বেঁচে আছি, না বুঝে ঘরে রাক্ষসী এনেছি।"

তাহার পর দুইজনে বসিয়া সারাদিন কি পরামর্শ করিল। বৈকাল-বেলা কিরণবালা পিতাকে বলিল,—"বাবা! ঠাকুর-মা ডাক্‌ছেন।"

রাম। কেন?

কি। জানি না।

রামপ্রসাদ মাতার নিকট আসিলেন, বলিলেন,—"মা! ডাক্‌ছ?"

মা। হাঁ বাবা।

রা। কেন?

মা। বাবা! আমি কবে আছি, কবে নেই, আমার একটী কথা রাখ্‌তে হবে। প্রমোদের বিয়ে দাও।

রা। প্রমোদের বিয়ে? এত শীঘ্র! এখনও পড়ুক —এ— এর মধ্যেই?

মাতা তখন ব্রহ্মাস্ত্র ঝাড়িলেন, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিলেন,—"বাবা, আমার কি বল? তোমার ছেলে। এই তো সে দিন ছোট বৌমার বোন্‌পোর ঘটা ক'রে বে দিলে, আমি কি তখন দু'ঠোঁট এক করেছিনু? তোমার ছেলে, তুমি বোঝ; তবে কি না আমি আর ক'দিন? আজ আছি, কাল নেই; একবার নাত বৌয়ের মুখ দেখে মর্‌তে পাল্লে ভাল হ'ত। তা বাবা! আমি আর কোন কথা কব না।" পরে আর একটু কাঁদিয়া, গলার সুর আর একটু টানিয়া বলিলেন,—"আ—হা—বাছার মা নেই তাই, মা থাক্‌লে এতদিন কবে হ'য়ে যেত।"

রামপ্রসাদ অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন,—"না মা, আমি তা বল্‌ছি না, বল্‌ছিলাম কি না, ছেলে মানুষ। তা'হউক, তোমার যখন সাধ হয়েছে, আমি তাই কর্‌ব। আজই চারিদিকে ঘটক পাঠা'ব। এই অগ্রহায়ণ মাসেই তুমি নাতবৌ দেখ্‌বে।"

বুড়ি আহ্লাদে আটখানা হইলেন; মেড়ে বাহির করিয়া বলিলেন, "বেঁচে থাক বাবা! আমার মাথার যত চুল, তত তোমার পেরমাই হোক্।" দুঃখের বিষয় বুড়ির মাথায় তখন টাক পড়িয়াছিল।

রামপ্রসাদ বাহির বাটীতে গেলেন। কিরণ প্রমোদের সন্ধানে চলিল। বারান্দায় গদার মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। গদার মা বাড়ীর ঝি। কিরণের মুখ হাসি হাসি; বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে গা দি'ঠাকরুণ?"

কিরণ হাসিয়া বলিল,—"প্রমোদ কোথা জানিস্?" ঝি কিছু আশ্চর্য্য হইল, বলিল,—"কেন—কেন?"

"মস্ত বুড়ি, জানিস্ কি না বল্ না,—কেন? কেন—শুন্‌বি? এই তোর সঙ্গে তার বিয়ে দেব।"

বৃদ্ধা একগাল হাসিয়া বলিল,—"তা বোন্ আমার কি আর সে কাল আছে? এখন ভাবনা চিন্তায় চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, দাদা বাবুর মনে ধর্‌বে কেন? তা থাক্, বলি কথার উপর কথা, একদিন গদার বাপ—আহা! মিন্‌সে বেশ লোক ছিল গো—একদিন—"

কিরণ দেখিল, সর্ব্বনাশ! বুড়ি একবার গল্প ফাঁদিলে আর নিস্তার নাই। বাধা দিয়া বলিল,—"ও কথা থাক্ দিদি, শুন্‌লে মনে কষ্ট হয়। এখন যা জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম, তার কি হ'ল?"

"ওই আমার কেমন রোগ দিদি! তা যাক্, কথাটাই ভাল শুনি না। তোমার ভাই বুঝি বাগানে আছে, এখন কথাটা কি বল ত।" কিরণ সকল কথা বলিল। শেষ বলিল,—"এখন এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করিস্‌নি।"

বুড়ী জিব কাটিয়া বলিল,—"রা—মঃ, গঙ্গা, রাতপেরাতের বাক্যে দিনের আশীর্ব্বাদে গদা আমার বেঁচে থাক্; আমাকে কি তেম্‌নি গদার মা পেয়েছ?"

কিরণ বলিল,—"তা'হলেই হ'ল।" এই বলিয়া কিরণ চলিয়া গেল।

কিরণ চলিয়া গেলে কথাগুলা বুড়ীর পেটে একটা কাণ্ড করিয়া তুলিল। তাহারা বলে, "ওঠ"—বুড়ীর মন বলে "চুপ্।" তাহারা বলে, "আমাদের দোর খুলেদে"—মন বলে, "বিপদ হ'বে।"

"থাকে ফাঁড়া যাবে উত্‌রে।"

"হুঁ—উহুঁ—"

তাহারা তখন ক্রোধে ফুলিয়া উঠিল। এই ফুলিল, এই ফুলিল, আরও ফুলিল, বুড়ীর পেট ফুলিয়া চড়কের ঢাক হইল! উহুঁ, আর পারিব না! বুড়ি ছুটিল—এক নিশ্বাসে পুকুর পাড়ে। ঝিয়েরা বাসন মাজিতেছিল, এবং বাসনের তালে তালে "ক্ষুদি বাম্‌নির উপপতি কানাইয়ে বাগ্‌দী"—"নিধিরাম ভট্টচার্য্য মাতাল"—"ও পাড়ার হলধর ঘোষের বেটা যেন সুঁদির ফুল, রোগ বালাই কাকে বলে জানে না"

প্রভৃতি অপূর্ব্ব, অশ্রুত, অজানিত রাগ-রাগিণী নিচয়ের মধুর আলাপে ব্যস্ত ছিল। এমন সময়ে গদার মা আসিয়া বলিল,—"আর শুনেছিস্?" আলাপ বন্ধ হইল—সকলের মুখ বৃদ্ধার দিকে ফিরিল। আর কি থাকা যায় গা? বৃদ্ধা বলিল,—"আর শুনেছিস্? দাদাবাবুর বিয়ে।"

বামা বলিল,—"বলিস্ কি? হুঁকো শাস্তর যে?" সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বলিস্ কি? বলিস্ কি?"

"থাম্ বোন্, আর মজাস্‌নে। এখনি কেউ শুন্‌তে পাবে? একথা প্রকাশ করিস্ নি—দিদি ঠাক্‌রুণও বলেছিল, দেখিস্ গদার মা! যেন প্রকাশ না হয়, তা আমি কি তেম্‌নি মেয়ে?"

সকলে বলিল,—"রাধেকৃষ্ণ, তাও কি হয়?" তখন রামী, শ্যামী, ক্ষুদি, গদার মা, প্রহ্লাদের মা প্রভৃতি অদ্ভুত জীবেরা এক মনষ্টর মিটিং কন্‌ভিন্ করিয়া রিজলিউশন্ পাস করিল যে,—"কেহই গরদের যোড়, বালা, অন্ততঃ একছড়া হারের নীচে নামিবে না।"

প্রসন্নময়ী জলে গা ধুইতেছিলেন, তিনি সকল কথা শুনিলেন, ভাবিলেন, হাসি শুনিলে কতই হাসিবে—তাহার খেলুড়ীর বিবাহ।

হায় প্রসন্নময়ী! তুমি জানিয়াও জানিলে না যে, কীট-দষ্ট সেফালি-কলি শুধু বাতাসের অপেক্ষায় রহিয়াছে, বাতাস বহিলেই ঝরিয়া পড়িবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হাসিও শুনিল। সন্ধ্যাবেলা মাতা গৃহে আসিল। হাসি প্রদীপ জ্বালিতেছিল, বলিল,—"মা! আজ তোর এত দেরি হ'ল কেন?"

প্রসন্নময়ী হাসি-ভরা মুখে বলিলেন,—"মা! তোর খেলুড়ীর এই অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে, তারই কথা শুন্‌ছিলুম।"

হাসির চক্ষের উপর দিয়া সহসা একখণ্ড মেঘ ভাসিয়া গেল—কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"কা'র?"

"প্রমোদের।"

সহসা প্রদীপ নিবিয়া গেল!

মা বলিলেন,—"ওমা! কি কল্লি? আর যে দে-কাটি নাই—এই কাল হারির কাছ থেকে ধার করে নিয়ে এনু, সেই বা আর দেবে কেন? বস মা একটু, দেখি যদি কেউ গোটা দুই দেয়।" এই বলিয়া প্রসন্নময়ী চলিয়া গেলেন।

হাসি অর্দ্ধেক শুনিল, অর্দ্ধেক শুনিল না। যাহাও শুনিল, তাহা বুঝিল না। তাহার পদতল হইতে তখন পৃথিবী সরিয়া গিয়াছিল! কে যেন তাহাকে শূন্য হইতে শূন্যে ফেলিয়া দিল! সে ঘূরিতে ঘূরিতে সহসা যেন কোন কঠিন স্থানে গিয়া পড়িল!! চমকিত হইয়া দেখিল, সে মাটীতে বসিয়া পড়িয়াছে।

বাবুদের বাড়ী আরতীর বাজনা বাজিয়া উঠিল, হাসি চমকিয়া উঠিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে সপ্তমীর চাঁদ উঠিয়াছে। আধ-ফোটা জুঁইয়ের উপর চাঁদের হাসি ফুটিয়াছে। হাসি চলিল, অদূরে সেই উদ্যান, হাসি প্রবেশ করিল। দেখিল, সেই গাছ, সেই লতা, সেই পাতা, সেই ফুল, সেই জল, সেই ঘাট, সকলেই সেই; তবুও যেন কি নাই—'কি' বিহনে সব যেন শূন্য, 'কি'—হীন, কেমন ফাঁকা ফাঁকা। 'কি' বিহনে যেন তাহাদের সেই প্রস্ফুট মাধুরী অস্ফুট রহিয়াছে, সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল কোমলতায় মলিনতার ছায়া পড়িয়াছে! হাসির চক্ষে জল আসিল—সেই শশিকর-প্রোজ্জ্বল পুষ্করিণী তীরে বসিয়া হাসির চক্ষে জল আসিল; হাসি কাঁদিল। সমীর-হিল্লোলে শ্যামজলে তরঙ্গ উঠিল। ছোট ছোট ঢেউগুলি হেলিয়া দুলিয়া হাসির গায়ে ঢলিয়া পড়িল, ছোট ছোট ফুলগুলি মৃদুল সমীরণ-কম্পে হাসির মাথায় ঝরিয়া পড়িল! হাসি কাঁদিল, বহুক্ষণ কাঁদিল। আরতি থামিল, হাসি থামিল না।

সহসা পশ্চাতে পদশব্দ শ্রুত হইল। কতকগুলি পাখী কলরব করিয়া উড়িয়া গেল; হাসি চমকিয়া পশ্চাতে চাহিল, দেখিল—আবার দেখিল—অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আবার দেখিল—দেখিল, প্রমোদ!

প্রমোদ ডাকিল, "হাসি!" হাসি পড়িতেছিল, প্রমোদ হাত ধরিল, বলিল,—"হাসি!" হাসির চক্ষে তখন জগৎ ঘুরিতেছিল। প্রমোদ বলিল,—"হাসি! তুমি এখানে কেন?"

এবার হাসি কথা কহিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"আর আসিব না।"

প্রমোদের মুখ গম্ভীর হইল, বলিল,—"কেন হাসি?"

হাসি ফোঁপাইয়া বলিল,—"না।"

প্র। তবে কাঁদিতেছিলে কেন?

হাসির পূর্ব্বভাব যেন আবার ফিরিয়া আসিল, প্রমোদের বুকে মুখ লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। যেন কাঁদিয়াই কত সুখ। প্রমোদের হৃদয় উথলিয়া উঠিল; উভয়ে নীরবে কতই কাঁদিল। আঁখিজলে আঁখিজল মিশিল, জগতের সেখানেই মৃত্যু হইল। উভয়ে বহুক্ষণ কাঁদিল—সেই স্থির জ্যোস্নালোকে দাঁড়াইয়া উভয়ে বহুক্ষণ কাঁদিল। কাঁদিবার সাধ আর মিটে না। সেই ক্ষুদ্র হৃদয় দু'টীতে কতই আবেগ, কতই আন্দোলন, আলো ও ছায়ার কতই উদ্বেল—স্ফীতি! হৃদয় হইতে হৃদয়কে সরাইয়া হৃদয়কে হৃদয়হীন করিতে কেহই চাহে না।

বহুক্ষণ কাঁদিয়া, হৃদয়কে একটু হাল্কা করিয়া প্রমোদ বলিল, "হাসি!"

হাসি ধীরে ধীরে মুখ তুলিল, যেন সে হৃদয় পৃথক করিতে অনিচ্ছুক, বলিল,—"কি?"

"সত্য বলিবে?"

কিছুক্ষণ পরে হাসি বলিল,—"বলিব।"

"তুমি কাঁদিতেছিলে কেন?"

"তুমি কেন কাঁদিতেছিলে?"

"জানি না।"

"আমিও জানি না।"

প্রমোদ হাসির চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিল, সস্নেহস্বরে বলিল,—"বল না ভাই! আমি কি তোর পর?"

এইবার হাসি মুখরা হইল। প্রমোদের বুক হইতে মুখ তুলিয়া বলিল,—"পর নইলে আমাদের বাড়ী এলেনা কেন?"

"ভাবিয়াছিলাম, তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না।"

"আজ কি আমি চিনিতে পারিলাম না?"

প্রমোদ হার মানিল। মুখরা বলিল,—ছিঃ! তুমি এমন? আমি তোমাকে এত——" বলিতে বলিতে হাসি নীরব হইল।

প্র। তার পর? থামিলে যে?

হা। না।

প্র। না কি? আমাকে বল্‌বে না হাসি?

হাসির আবার কথা ফুটিল, বলিল,—"আমি তোমাকে এত ভালবাসি, তুমি বাস না।" বলিয়াই সলজ্জে হাসি প্রমোদের বুকে মুখ লুকাইল।

প্রমোদের হৃদয়ে তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিল, নয়নসম্মুখে জগৎ হাসিয়া উঠিল—সেই বিমল চন্দ্র-কিরণে অনিল-তরঙ্গ-নিঃসৃত মৃদুল মর্ম্মরধ্বনি যেন কল্পিত কিন্নর-কাকলীর ন্যায় বোধ হইল! প্রমোদ সবেগে হাসির হাত ধরিয়া বলিল,—"হাসি! সত্য বল, তুমি আমাকে ভালবাস?"

হাসি প্রমোদের মুখ চাপিয়া ধরিল। প্রমোদ বুঝিল, বলিল, "বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ। কিন্তু আমি কি তোমাকে ভালবাসি নাই হাসি? শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে, জাগরণে, বিদ্যালয়ে, এমন কি পরীক্ষা-মন্দিরে সর্ব্বদা তোমারই মুখ দেখিয়াছি।" হাসির বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। প্রমোদ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "হাসি! একটা কথা বলি।"

হাসি মুখ তুলিল, বলিল,—"বল।"

"আমাকে বিবাহ করিবে?"

হাসির মাথা ঘুরিল, যেন সে কথা তাহার কল্পনার বাহিরে—ধীরে ধীরে বলিল,—"আমি দরিদ্র।"

"তুমি দরিদ্র নও, তুমি ধনী, তোমার হৃদয় আছে। এখন বল, কি করিবে?"

"করিব—কিন্তু——"

প্রমোদ কাঁপিয়া বলিল,—"কিন্তু কি—কিন্তু কেন?"

"দুঃখিনীকে বিবাহ করিলে তোমার পিতা রাগ করিবেন।"

"সে ভার আমার।"

হাসির হৃদয় হইতে একখণ্ড মেঘ সরিয়া গেল, মুখে হাসি কান্না দুই-ই ফুটিল। দুঃখিনীর হৃদয়ে তখন কি হইতেছিল, কে বলিতে পারে?

এমন সময়ে মা ডাকিল, "ও হাসি! কোথা গেলি, আয় না লো!"

হাসি বলিল,—"যাই"—কিন্তু পা সরে না। প্রমোদ ধীরে ধীরে হাসির মুখ তুলিল, দেখিল, নীল নয়নছ'টী আধ-ফোটা কুসুমের ন্যায় ফোটে ফোটে—ফোটে না; রক্তাভ অধরটী নবীন বসন্তোদ্গত কনক পল্লবের ন্যায় ফোটে ফোটে, ফোটে না। প্রমোদের মুখ—জানি না কেন—ধীরে ধীরে অবনত হইল, ধীরে—ধীরে—ধীরে—সহসা পশ্চাতে পত্র-মর্ম্মর! উভয়ে চমকিত হইল—হাসি বলিল,—"তবে আজ আসি।"

প্রমোদ নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, নির্জ্জীব, পরাগপুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। হাসি চলিয়া গেল। দূর হইতে একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল—সোপানোপরি এক নিশ্চল মূর্ত্তি!

হাসি চলিয়া গেলে প্রমোদের চৈতন্য হইল, গৃহে যাইবার জন্য সোপানারোহণ করিতে লাগিল। আবার পত্র-মর্ম্মর! কে যেন সরিয়া যাইতেছে। প্রমোদ দাঁড়াইল; দেখিল, বৃক্ষ-পার্শ্বে কে দাঁড়াইয়া বলিল,—"কে ও?"

বৃক্ষপার্শ্বস্থিত মূর্ত্তি বাহির হইয়া জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইল—সেই অস্ফুট চন্দ্রালোকে প্রমোদ দেখিল,—কিরণ। কিরণ তবে সব শুনিয়াছে। ছিঃ! ছিঃ! প্রমোদ লজ্জায় মরিয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

"সেই মুখখানি।"

(১)

নিবিয়া জ্বলিল আশা !
অজানা সুদূর-দেশে
গিয়াছিল স্রোতে ভেসে ;
তবু ভালবাসা—
আনিল রে পুনরায় অন্তরে আমার ;
"সেই মুখখানি"—নাই তুলনা যাহার।

(২)

এই সাঁজের গগনে,
উঠে তারা নভোময় ;
একে একে উথলয়
কত ভাব মনে ;
ভাবি' মনে পূর্ব্ব-স্মৃতি, ভুলি রে সংসার ;
"সেই মুখখানি"—নাই তুলনা যাহার।

(৩)

কোকিল কুহরে শাখে ;
অনুপম অতুলন,
মনে পড়ে সে বচন,
কেবা আর দেখে
নয়ন হইতে ঝরে অশ্রু অনিবার ;
স্মরি' সেই মুখ, নাই তুলনা যাহার।

(৪)

নভঃপরে হেরি' ঘন,
মুক্ত পুচ্ছে নাচে শিখি,
কভু নাহি চেয়ে দেখি,
মেলি' নয়ন ;
পাছে মনে জেগে উঠে বসন তাহার,
"সেই মুখখানি"—নাই তুলনা যাহার।

(৫)

নদী-তীরে গেলে দেখি,
সুরঙ্গে তরঙ্গ ভরে
মরাল গমন করে
হয়ে মনে সুখী ;
মনে পড়ে সে চলন, কি কহিব আর ;
"সেই মুখখানি"—নাই তুলনা যাহার।

(৬)

ফুটেছে চম্পক ফুল,
মধুর সুবাসে তা'র,
আমোদিত চারি ধার,
আমি রে আকুল ;
পাছে মনে প'ড়ে যায় অঙ্গুলী তাহার,—
"সেই মুখখানি"—নাই তুলনা যাহার।

(৭)

প্রতিক্ষণ হয় মনে,
হৃদয়ের অন্তস্তলে
সেই নাম সদা চলে
শোণিত মিশ্রনে ;
ত্বকে ত্বকে আছে যেন ছবি আঁকা তা'র,
"সেই মুখখানি"—নাই তুলনা যাহার।

(৮)

আর কি হেরিব তা'কে ?
ঢাকি' দেহ পীত-বাসে
মুখে মৃদু মধু হেসে
চাহিয়া বঙ্কিম চোকে
আসিবে কি আর পুনঃ নিকটে আমার ?
"সেই মুখখানি"—নাই তুলনা যাহার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

পল্লীগ্রামে।

লক্ষ্মীপুর একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম,—গ্রামে অনেক ভদ্র লোকের বাস,—গোয়ালা, কৈবর্ত্ত এবং মুসলমানের বাসও বড় কম নয়। গ্রামের উত্তর পশ্চিমে দূরে তৃণ-শস্য পূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা; গ্রামটী দেখিতে বেশ মনোহর। বৎসর বৎসর মাঠে যে ধান্য এবং রবি শস্যাদি উৎপন্ন হয়, গ্রামবাসীগণের তাহাতেই বেশ চলিয়া যায়। দু' দশ টাকার সংস্থান অনেকেরই আছে; দিবসের পরিশ্রমে গ্রামবাসীগণের ঐহিক সুখ-শান্তির যেমন বড় অভাব নাই, তেমনি নিশায় সুমধুর হরি-সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত থাকিয়া তাহারা পারত্রিক সুখ-শান্তি লাভ করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান, সুতরাং দেখিতে গেলে তাহাদের আর্থিক পারমার্থিক সকল দিকেই সুখ; যাহারা এই দুটী দিক পরিষ্কার রাখিতে পারেন, তাহারাই ত প্রকৃত সাধু ও সুখী। যাহারা কেবল ঐহিকের জন্য ব্যস্ত, তাহাদের কোন কালেই সুখ নাই; আর যাহারা পারত্রিকের জন্য ব্যস্ত, তাহাদের সকল দিকেই সুখ। ইহার রহস্যই এই টুকু! তুমি, আমি আশা এবং অর্থের ক্রীতদাস, সুতরাং এ রহস্যের কথাটাও যেন কেমন কেমন বোধ হয়, পাগলামী মনে হয়, হাসিও পায়। কিন্তু আশা এবং অর্থলালসাকে যিনি আপনার বশ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই এই রহস্যের মর্ম্মভেদ করিয়াছেন—তিনি আর এ কথায় হাসিবেন না। পল্লীগ্রামবাসীরা যুক্তি বা তর্কের বড় ধার ধারে না; ধার ধারিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের নাই, অন্ধ বিশ্বাসই তাহাদের প্রধান অবলম্বন, তাই তাহারা সুখী। ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাহারা সন্দিগ্ধ নয়, তাঁহার কৃপায় তাহারা অবিশ্বাসী নয়,—সুখ-দুঃখে তাহারা ঈশ্বরে আত্ম নির্ভর করিয়া থাকে, কিন্তু একটু পশ্চিমে হাওয়া লাগিয়া আমার মনটায় কেমন একটা স্ফূর্ত্তি হইয়াছে যে, সহজে এ সব বড় মনে লাগে না। কিন্তু এটায় কাহারি দোষ, তাহার নিশ্চয় নাই; কলকথা যুগধর্ম্ম!

আজ কয়দিন হইল, আমি এখানে আসিয়াছি, এখানে আমার এই প্রথম আসা নয়, পূর্ব্বে আরও দু'একবার আসিয়াছিলাম; সুতরাং

ইহাতে কিছু নূতনত্ব নাই, তবে সেবারে আর এবারে একটু প্রভেদ আছে—একটু কেন বিলক্ষণ!

বলিয়াছি, নূতন স্থানে আমি আসি নাই, তা'ই নূতন স্থানে আসায় যে আনন্দ বা মনোমধ্যে একটা কেমন নূতন ভাবের উদয় হয়, তাহাও হয় নাই; হইবার কথা নয়।—যা কিছু সুখ মনোহারিত্ব সবই নূতন নূতন। এ কথাটা চিরাগত সত্য, নূতন পাইলে আমরা পুরাতন ভুলিয়া যাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নূতনও আবার অধিক দিন নূতন থাকে না। শেষে যখন পুরাতন হইয়া যায়, তখন কতকগুলা পুরাতনের মধ্যে কোন্ পুরাতনটা ভাল—তাহাই খুঁজিয়া বেড়াই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাটা মনে মনে নূতনের জন্যই চিরদিন প্রবল থাকে। নূতন আর পুরাতন, স্মৃতি এবং বিস্মৃতি, মিলন ও বিচ্ছেদ, বর্ত্তমান আর অতীতের এই আলোক-আঁধারের মধ্যে মানুষ হাসি-কান্নার কেমন রং তামাসা দেখাইয়া থাকে! এ ভবের মহামেলায় সং সাজিয়া যে ভাল রংতামাসা দেখাইতে পারিবে, তাহারি বাজিমাৎ। যত সাজসজ্জা করিবে, তত লোকের কাছে বাহবা পাইবে; কিন্তু তার পর যখন আসর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাজঘরে যাইয়া পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিবে, তখনই তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইব। যাত্রারদলের ছেলেগুলো সাজসজ্জা করে, আসরে কেহ রাজপুত্র, কেহ সওদাগরপুত্র, কেহ বা বীর বৃকোদর, কত হুড়ুম হুড়ুম ডাক হাঁক করে, কিন্তু যেই পালা ফুরাইল, তখন সাজঘরে যাইয়া দেখ, কাহার পেটে আধসের তিনপোয়া পিলে, কেহ বা শ্বাসকাশে কণ্ঠাগত প্রাণ; আসরের সেই মধ্যম দাদার তখন হয় ত একটা ঘটী সরাইতে বুকে ব্যথা লাগে। এ দুনিয়ার দুদিক দেখিতে গেলেই সব ফাঁক হইয়া পড়ে। কাজে কাজেই যাহারা এ দুনিয়ার দুদিক দেখিয়াছে, আর যাহারা কেবল একদিক দেখিয়াছে, ইহাদের উভয়দলের মধ্যে মতামত ও যুক্তি তর্ক লইয়া এত মারামারি বকাবকি হইতে দেখি। তাই বলি, দুদিক দেখ, তখন দু-এক কথা বলিও, মাথা হেঁট করিয়া শুনিব; নতুবা এক পাতা উল্টাইয়া অত লম্ফ ঝম্ফ করিতে দেখিলে বড় দুঃখ হয়।

যা'ক, কি বলিতে কি বলিতেছি, কিন্তু বিকারগ্রস্তের এইরূপ প্রলাপটা স্বাভাবিক; পাপ-বিকারে মন বিকৃত, তখন আর ইহাতে আশ্চর্য্য হইলে চলিবে কেন? বলিব, ভাবিয়াছিলাম অতীতের কথা, কিন্তু অতীতের কথা তুলিব না। সেবারের কথা আর এবারে কেন? আর এবারের কথাই বা সেবারে কেন? যেবারের কথা সেই বারেই মিটে যাওয়াই ভাল, মিছামিছি বুকের মাঝখানে বোঝা বওয়া কেন? তাও আবার ভাঙ্গাবুকে—যদি নাও ভাঙ্গা হয়, দুদিনেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। ঔষধ অনায়াস লভ্য নয়! কিন্তু পোড়া অতীতই বা কেমন? কোন দেশ ছাড়িয়া কোন দেশে আসিলাম, তবু সেই সেখানকার কথা, সেই পুরাতন দিনের কথা! কেন বাপু? তোমার ত দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছি—তবে সীমা ছাড়াই নাই; বুঝি, তাই যেথা যাই, যাই করি, যে কিছু নূতন দেখি, থাকিয়া থাকিয়া সেই যেখানকার মানুষ সেইখানেই ছুটিয়া যাইতে সাধ হয়;—অবোধ মনের অবাধ গতি বাধা দিবার সাধ্য নাই। এখন বুঝিয়াছি, কবি কেন বলিয়াছেন,—

"Whenever I roam whatever realm I see,
My heart untravelled fondly turns to thee."

তাই বলি, অতীতটা যেন জীবনের ভিত্তি; যত কিছু গড় ভাঙ্গ সব ইহার উপর। অতীতকে ছাড়িবার যো নাই; এ জীবনটাই যে অতীতের জের জমা। অতীত ও বর্ত্তমানের জমা খরচে যে দিন সমান দাঁড়াইবে, সেইদিন কৈফিয়তের ঘরেও শূন্য; তখন তোমারও কর্ম্ম ফুরাইল। কিন্তু কেবল হিসাব নিকাষির একটা দায় থাকিয়া যায়, জমা-খরচের মধ্যে কিছু অন্যায় আছে কিনা!

কিন্তু আবার বলি, এটার জন্য অতীতকেই শুধু আবার দোষি কেন? স্নেহ ভালবাসার আকর্ষণটা কি কিছুই নয় না কি? বুঝিতে পারিলাম না এটা স্মৃতির টান, কি স্নেহমায়ার আকর্ষণ অথবা সুখ-আশার প্রাবল্য। নানা গোলোযোগে এগুলি একটু চাপা পড়ে, কিন্তু সেই আবার অতীতের দেশে ফিরিয়া আসিলে তীব্রতর হইয়া উঠে! দেখ কবে এই দেশে আসিয়াছিলাম, কাহাকে দেখিয়াছিলাম, কাহার

সহিত কথা কহিয়াছিলাম, কি কথাটা কহিয়াছিলাম, কেমন করিয়া কহিয়াছিলাম, সবগুলি যেন মনের মধ্যে এককালে উদয় হয়! গাছের পাতায়-পাতায়, লতায়-লতায়, ঘাটে, বাটে, মাঠে, পবন হিল্লোলে, পাখীর মাথা মুণ্ডু কিচিমিচিতে যেন সেই সব! ছোট ছোট গাছগুলো এখন কত বড় হয়েছে, কিন্তু কথাগুলোও যেন বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে! কিন্তু নাই কি? নাই কেবল যার জন্ম এত কাণ্ড! নহিলে যন্ত্রনা হয় কিসে? মনের সুখে আগুণ, আর যার মনে আগুণ তার মুখেও যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল। ভালটাও যে আবার বড়, শীঘ্র হয় না; এ দরিয়ায় না বুঝিয়া চলিলে, তুফান দেখিয়া হাল না ঠিক রাখিতে পারিলে, এইরূপেই প্রায় ভরা ডুবি হইয়া থাকে। অভিমান অনুযোগ বৃথা!

তবে হৃদয় যতই পুড়িয়া যা'ক, সংসার-সংগ্রামে হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি যতই পাষাণ হউক, মনে যতই যে-সে ভাবনা চিন্তা থাকুক, পল্লীগ্রামে আসিলে মনে কতকটা শান্তি অবশ্যই হইবে। এ গুলো নাকি বিশ্বপতির বাস্তু ভিটে—এ গুলো তাঁর নিজের হাতে গড়া। এখানে আসিলেই যাতে তাতে তাঁহার পূর্ণ বিকাশটা বেশ নয়ন ও মনের গোচর হয়। বিশ্ব-শিল্পীর অপার মহিমা ও সৃষ্টি-চাতুর্য্য এখানে নিয়ত স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এখানে আসিলে, আমরা তাঁহার অতি নিকটে আসিয়া পড়ি, একটু যত্ন আব্দার বা জোর করিলেই তাঁহার কোলে উঠিতে পারি। আহা! তাঁহার কেমন দিব্য প্রসন্ন মূর্ত্তি! আমি তখন আর আমাকে, ভিন্ন ভাবিতে পারি না, যেন তাঁহাতে মিশাইয়া যাই। কি আনন্দ! এ যেন একটা নূতন রাজ্য। ফুলে ফুলে তার মধুর হাসি, পল্লবিত তরু শাখা লতিকায় তাঁহার দিব্য শ্যাম কান্তি, মন্দ মন্দ সুগন্ধ গন্ধবহে তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস, তরু-পত্রের মরমর শব্দে ও তটিনীর কলকল স্বনে তাঁহার অস্ফুট সানন্দ অভয়বাণী মনকে একবারে মাতাইয়া তুলে! সুবিশাল শ্যাম শস্য ক্ষেত্র, কোথায় দূর দিগন্ত রেখা, কোথায় নীল নভোপথ—এ সকল যাঁহার বিরাট মূর্ত্তির এক এক দেশ, নয়ন ভরিয়া দেখ, হৃদয় জুড়াইয়া যাইবে, কিন্তু আবার একবার

মনশ্চক্ষু চাহিয়া দেখ, দেখিবে—সকলই অনন্ত—অসীম! আর একটু স্থির হইয়া ভাব, দেখিবে—সেই বিরাট দেহে কত বিস্তীর্ণ নদ নদী, বিশাল গিরি কন্দর, মনোহর লতা-পাদপ-পূর্ণ নিবিড় অরণ্যানী, অগণ্য পশু পক্ষী, প্রকাণ্ড সূর্য্য, নক্ষত্র, চন্দ্র অবিরাম ছুটাছুটি করিতেছে! ভাব দেখি, সেই জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত কি আনন্দের! তোমার হৃদয়ের তীব্র জ্বালা তখন কোথায়? পার্থিব তুচ্ছ মান, সম্ভ্রম, গর্ব্ব, তেজ, অভিমান সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় তখন কোথায় লুক্কায়িত হয়। সেইত জীবনের প্রকৃত আরামের সময়। যখন আমার প্রাণের প্রাণ বিশ্বময়ে মিশাইয়া পূর্ণানন্দে ডুবিয়া যাই, তখন আর আমার আমিত্ব আমি ভাবিয়া পাই না; সেই পরমানন্দময়ে মিশাইয়া পরমাত্মার ক্ষুদ্র জীবাত্মা একত্র হইয়া সেই এক হইয়া যায়। কিন্তু স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এ মেশামিশি কতক্ষণ! অনেকক্ষণ! কিন্তু অনুপলবৎ উপলব্ধি হয়! আনন্দের দিন এমনি করিয়া কোথা দিয়া চলিয়া যায়! আহা! কেন না সেই অমৃতময়ে চিরদিনের জন্য মিশাইয়া থাকি? হায়! সে দিন আমার কবে বা হবে? কি বিভ্রাট! আজিও কেন আমি এমন করুণাময়ের শান্তি রাজ্যের দ্বারে আসিয়া আবার কোন আঁধারের দেশে পতিত হই? কি বলিব, ঐ ছটা পেয়াদাকে আমার বড় ভয় হয়! জানি না, কেমন করিয়া কত দিনে আমি তাদের হাত ছাড়াইব! বিপথে আসিয়া, পাপের রাজ্যে প্রবেশ করিলাম; বুঝি, এই অনধিকার প্রবেশ দায়ে পড়িয়াছি! তা দেখি, এবারে এ সাজার মেয়াদ ফুরাইলে আমি সত্যের পথ দেখিয়া লইব, সেই পথে যাব, কোন দিকে ফিরিব না, বাহ্য সৌন্দর্য্যে ভুলিয়াও ক্ষণিক সুখ লোভে কুপথে যাইব না। এইরূপে সত্যের পথ বহিয়া প্রকৃতির দ্বারে যাইব, বিবেকের দেখা পাব, বৈরাগ্যের দ্বারের চাবি তাহার হাতে, বিবেককে খুব ভালবাসিব, ভক্তি করিব—সে যাহা বলে তাহাই শুনিব, তখন প্রেম ভক্তির জোরে বিবেক আপনা হইতে বৈরাগ্যের দ্বার খুলিয়া দিবে, বাসনার বেসাতি পাছে পড়িয়া থাকিবে, তখন প্রকৃতির বিশাল দেহে নিশ্চিন্ত হইয়া একেবারে মিশিয়া

থাকিব। তখন বাহ্যেন্দ্রিয়ের কাণ্ড অন্তরেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া নয়ন আপনি মুদিয়া আসিবে, হৃদয় আলোকে ভরিয়া যাইবে! সে আলোকে সকলই দেখিতে পাইব! কিন্তু ইহার জন্য কাতর হৃদয়ে প্রকৃতির দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে, বাহ্য প্রকৃতিতে মানব প্রকৃতি মিশাইতে হইবে। প্রকৃতির শান্তি কুটীর এই পল্লীগ্রামে, প্রকৃতি সাধকের পবিত্র আসনে—তরুলতা কুঞ্জে নির্জ্জনে আপনা ভুলিয়া আত্মার যোগ সাধন করিতে হইবে! নগরীর সুরম্য উচ্চ প্রাসাদে থাকিয়া, অথবা লোকারণ্যের বিষময় গোলোযোগে মিশিয়া, তরঙ্গান্দোলিত তৃণের ন্যায় অঙ্গ ঢালিয়া, উঠিলে পড়িলে চলিবে না! আইস, এই আনন্দ সাগরের তীরে আইস! কেন? শুনিয়াছি, নগর গুলো এক একটা প্রকাণ্ড জেলখানা, লোক গুলো সব কয়েদী, তবে এক একজন এক এক রকমের; কেহ ফৌজদারীর, কেহ দেওয়ানীর, কেহ বা আবার নজরবন্দী। নিয়মের বশে সকলকেই চলিতে হইবে। বেচাল হইলে বা কাজ কম হইলেই মুস্কিল—তাড়না লাঞ্ছনার একশেষ! দেশে কত আনন্দ, কত উৎসব, পোড়া কয়েদী গুলোর কিন্তু তা দেখিবার যো নাই। প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে নিয়ত কত আনন্দ-উৎসব, নগরে থাকিয়া তাহা দেখিবার যো নাই।

কলিকাতার যাদুঘর, আলিপুরের পশুশালা দেখিয়া লোকে অবাক হয়, কিন্তু প্রকৃতি রাজ্যের যেখান যাও, এমন কত যাদুঘর কত পশুশালা দেখিতে পাইবে। কত ফুঁ দিয়ে এ চাবি সে চাবি টিপিয়া বাজনা শোন, আর এখানে এস, একটু স্থির হয়ে শোন, কি দিনমান কি নিশামান সকল সময়েই তরঙ্গিণীর কুলু কুলু নাদে, বিহঙ্গের কাকলিতে বৃক্ষপত্রের মর্‌মর্‌ শব্দে, কর্ণের কত আরাম বোধ হইবে—হৃদয় জুড়াইয়া যাইবে! সপ্তসুর, তিন গ্রাম, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী চারিদিকেই মিলাইয়া লও, তোমার হৃদয় তন্ত্রের সুরে সুরে গ্রামে গ্রামে কেমন মিলিয়া যাইবে, তালে তালে তোমার হৃদয় নাচিয়া উঠিবে, হৃদয়ের কপাট খুলিয়া যাইবে, তখন যে কত সুখ তা কি সহরে থাকিয়া হৃদয়ের কপাটটি আঁটিয়া রাখিলে বুঝিবে?

যাহারা নগরে চিরদিন বদ্ধ থাকে, তাহারা সংসারটার কেবল একটা দিক্‌মাত্র দেখিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতা চিরদিনই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অসম্পূর্ণ জ্ঞানে মনুষ্য জীবনের যে কি উন্নতি তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। আর এক কথা—যারা চিরদিন এইরূপে বদ্ধ থাকে, তাহারা এক প্রকার বালক। তাহাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, একটা কিছু পাইলেই তাহারা ভুলিয়া যায়। জিনিসটা যে কি, কোথা হতে আসে, কে তার সৃষ্টি করিল, সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা তাহারা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারে না—বুঝিবার চেষ্টাও করে না; ক্ষুদ্রাধারে অধিক বস্তুর স্থান হয় না। বালক প্রকৃত স্বর্ণ কি গিল্টি করা বুঝে না—চক্‌চকে দেখ্‌লেই ভুলে, এতদুভয়ে তারতম্য করিবার জ্ঞান তাহার নাই, কল্পনাতেও আসে না। নগরে যাহারা চিরদিন বদ্ধ থাকে, তাহারা বাহ্য-চাকচিক্যে মোহিত। প্রকৃতির দ্বারে আইস, একবারমাত্র একটী বিশালবৃক্ষ, বেগবতী নদী, গগনস্পর্শী গিরিশৃঙ্গ, অনন্ত বিস্তীর্ণ অপার নীল পারাবারের একটী প্রবল তরঙ্গ দেখ, তোমার হৃদয়ের স্রোত ফিরিয়া ক্ষুদ্র হৃদয় কত বড় হইয়া পড়িবে! তখন আর তোমার ক্ষুদ্র নগর কারাগার কিছুতেই ভাল লাগিবে না, হৃদয় ছুটিয়া ছুটিয়া প্রকৃতির দ্বার পানে যাইবার জন্য আকুল হইবে। কেন? তখন সে প্রকাণ্ড হৃদয়ের একটু স্থানে সঙ্কুলান হইবে কেন? তুমি তখন ভবের ভাবুক হইয়া উঠিলে; কুহক-জালে বড় ভয় হইল; যেখানে কুহক নাই, সেই স্থান তখন তোমার ভাল লাগিবে! জগতের যা কিছু কুহক নগরে! প্রকৃতির শান্তিকুটীর পল্লীগ্রামে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কেবল সরলতা। কুঞ্জে কুঞ্জে সুখ-শান্তির ভাণ্ডার, পাতায় পাতায় আনন্দচ্ছটা, বায়ুর তালে তালে প্রেমময়ের প্রেমে মত্ত হইয়া কেমন নৃত্য! আর অই যে—নব তৃণ শস্যময় হরিত ক্ষেত্রে নয়নরঞ্জন শ্যাম তাল, তমাল, রসাল, পিয়াল, বংশ বেতসের গ্রামের সীমা রেখায় শরতের, নাতিঘোর জলদ জালাবৃত অস্তোন্মুখ সৌর-কররাশির কেমন মধুর শোভা! উহা দেখিয়া ত প্রাণের আশা মিটে না, দর্শন-পিপাসা কেবল দ্বিগুণ হয়! দেখ, ঐ

শোভা দেখ, হৃদয় যে একেবারে প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়িবে, ভাব-তরঙ্গে হৃদয় ভরিয়া যাইবে। নারীর কলকণ্ঠ তখন হলাহল বোধ হইবে! হ্যাঁরে, যাতে আমার অমৃত পান করিতে বাধা, সে কি কখন ভাল লাগে? অদৃষ্ট! বল আমি কি করিয়াছি? আর কি করি নাই, যে তুমি আমায় নগরকারাগারে বদ্ধ রাখিয়া আমায় এমন সুখসুধা-পানে বঞ্চিত কর? ধিক্‌রে পরাধীন জীবনে!

বিশাল সাগরবক্ষে, উন্নত সানুশিরে, আর সুদূর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার শোভা দেখিতে কত সুন্দর! দেখিয়াছিলাম, একদিন পবিত্র সাগর-সঙ্গমে প্রশান্ত নীল পারাবারবক্ষে সন্ধ্যার জগত-জীবন দেব দিবাকরের অস্তগমন; সেই বিরাট কাঞ্চন বর্ত্তুলের কোলে আরক্তিম সাগরজলের হেলা দোলা তরঙ্গ খেলা দেখিয়া হৃদয়ে কত তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সূর্য্যবংশাবতংস ভগীরথ, প্রবল পরাক্রান্ত সগর-সন্ততিগণের অদম্য প্রতাপ, মহর্ষি কপিল দেবের যোগবল, জগতের উত্থান পতন, কত পরিবর্ত্তন, কালে সাগর তীরে মানবের কত ছুটাছুটি—কোলাহল কতই ভাবিয়াছিলাম। সেই সাগর যাত্রায় জীবনের মহা যাত্রার কথা কত ভাবিয়াছিলাম! আর একদিন ভারতোত্তর হিমাদ্রির উন্নত প্রদেশে দাঁড়াইয়া, উন্নত শৈল প্রদেশের কথা ভাবিয়া-ছিলাম। তপ্ত বালুকা স্তূপময় জীবনের মরু ক্ষেত্র ভাবিয়া আকুল নেত্রে পশ্চিমাকাশে অস্তাচলশায়ী অংশুমালীর ম্লানমূর্ত্তি দেখিয়া, জীবনের শেষ দিনের ভাবনা ভাবিয়া কত তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়াছিলাম। আর আজ পল্লীগ্রামে সন্ধ্যার প্রান্তরে একা দাঁড়াইয়া কত ভাবনা। কিন্তু এ শোভা অতি সুন্দর! সন্ধ্যা হয়, রাগে মুখখানা রাঙ্গা করিয়া রবি ঠাকুর পশ্চিমে পালিয়ে যান, পাছে যেতে যেতে আবার না খান, তাই রাঙ্গা কালো, সাদা মেঘগুলো যেন যমের পল্‌টনের মত পথ ছেয়ে ফেলে। সন্ধ্যার আঁধার তখন ঘাসের আগায়, গাছের পাতায়, বাড়ীর মাথায়, যেখানে যে আলোটুকু থাকে, একেবারে ঢেকে ফেলেন। তা যাই হোক সন্ধ্যার আঁধারটুকু এই রকম আঁচল বিছিয়ে আসেন বলেই মেঘগুলোর ফাঁক দিয়ে রবিঠাকুর আবার সময়ে সময়ে

কত রকম রং ফলিয়ে একটু মায়া বাড়িয়ে যান। সে সময়ে যে কত শোভা তা কে বলবে? আমি সেই সময় মনকে সঙ্গে নিয়ে মাঠে মাঠে ছুটে যাই, যে দিকে চাই, কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সৌন্দর্য্য! একে শরতকাল, তায় সন্ধ্যা, তাতে আবার আদুরে শ্যাম কলেবর মাঠগুলোর মাজখানে, সম্মুখে রঙ্গিনী তটিনী খিল্ খিল্ করে হেসে কোথায় ছুটে যায়! এত শোভা কি আমার মত মনুষ্যের হৃদয়ে ধারণা হয়? তাই ভয়ে এক একবার চোখ বুজি, কিন্তু ও হরি! তাতে যে আরও গোল! হৃদয় যে একেবারে ফাটিয়া যাইতে চায়! তখন ভাবি, হৃদয়টা খুব বড় হলে কি মজাই হ'ত?

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

অদহনীয় কালী।

নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া অদহনীয় কালী প্রস্তুত করা যায়।—

কোপাল গঁদের চূর্ণ——১২॥০ গ্রেণ।

ল্যাভে-ণ্ডর (Lavendor) ১০০ গ্রেণ।

এই দুই দ্রব্য উত্তপ্ত করতঃ পরে প্রদীপের শিষের কালী—১॥০ গ্রেণ, নীল (Indigo)—১৪ গ্রেণ মিশ্রিত করতঃ ঘুঁটিতে থাকিবে। পরে দেখিবে যে, কালী প্রস্তুত হইল, তাহাই অদহনীয় কালী Fire-proof Ink) ইহা দ্বারা লিখিতকাগজ পুড়িয়া গেলেও তাহার লেখা স্পষ্ট ও উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

অসিদ্ধ দাউল সহজে সিদ্ধ করিবার উপায়।

'যে সকল দাউল সহজে সিদ্ধ না হয়,' রন্ধনকালে লবণ দেওয়ার পর অতি অল্প পরিমাণে বাইকার্ব্বনেট অব সোডা (Bicarbonate of Soda)

তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, অতি সহজে সিদ্ধ হইবে। উক্ত দ্রব্য সকল ডাক্তারখানাতেই পাওয়া যায়; মূল্য অতি সুলভ।

কাপড়ের চিতি উঠাইবার সহজ উপায়।

বস্ত্রের যে স্থানে চিতি পড়িয়াছে, সেই স্থানে উত্তমরূপে সাবান ঘসিয়া, পরে উত্তম চাখড়ির গুঁড়া দিয়া উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া, ঘাসের উপর বিছাইয়া শুষ্ক করিবে। ২।৩ বার এইরূপ করিলে কাপড়স্থিত চিতি একেবারে উঠিয়া যাইবে। অনেক সময়ে চিতি পড়ায় অনেকের উত্তম উত্তম কাপড় নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহাদিগের উক্ত নিয়মটী অবলম্বন করা উচিত।

সাবানের অপব্যয় নিরাকরণ।

একখানি কাপড় কাচিতে যত সাবানের প্রয়োজন, উক্ত সাবানের সহিত কিঞ্চিৎ সোহাগা মিশ্রিত করিয়া কাপড় কাচিলে, তাহার অর্দ্ধেক সাবান লাগিবে। কাপড়ও শুধু সাবান দিয়া কাচিলে যত পরিষ্কৃত হইত, ইহাতে তাহা অপেক্ষা অধিক শুভ্র হইবে।

জল-পরীক্ষা।

ভাল মন্দ জল পরীক্ষা করিতে হইলে, প্রথমে একটী বড় শিশিতে বা বোতলে জল পুরিয়া, ঐ জলে কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কৃত চিনি **Loaf Sugar** ফেলিয়া দিয়া, ছাঁকিয়া উত্তমরূপে ছিপি বন্ধ করতঃ, ২।১ দিন রাখিয়া দিবে। পরে জল যদি ঘোলা বা দুগ্ধের মত দেখায়, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে, জল ব্যবহারোপযোগী নহে।

[ক্রমশঃ]

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি নমস্তে॥"

২য় খণ্ড। } আষাঢ়, ১৩০২ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

আমি অনাদি ও অনন্ত।

আমার আদি নাই, অন্তও নাই; আমি কল্প-যুগ, মহা-প্রলয়ের অগ্রেও ছিলাম, আবার যুগ-যুগান্তে—মহা-প্রলয়ান্তেও অনন্ত-কাল থাকিব, আমি অনাদি ও অনন্ত।

ক্ষুদ্র মানব আমি, আমার মুখে এ কথা কিরূপ? জন্ম, মৃত্যু, উৎপত্তি—নাশ, প্রত্যহ, প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্ত্তে—প্রত্যক্ষ করিয়াও নশ্বর ক্ষণ-ভঙ্গুর মানবের মুখে এ কথা প্রলাপোক্তি বই আর কি বলিয়া গণ্য হইতে পারে? প্রতিক্ষণে কত জীব উৎপন্ন হইতেছে, আবার প্রতিক্ষণে কত জীব দেখিতে দেখিতে কাল-সাগরে লীন হইয়া যাইতেছে, আর তাহাকে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই আমার দেহেই, এই আমার চতুর্দিকস্থ পদার্থ সমূহে, প্রতিমুহূর্ত্তে কাল, ধীরে ধীরে আপন ধ্বংশ কার্য্য সাধন করিয়া যাইতেছে। অদ্য আমি যেমন আছি, কল্য সেরূপ ছিলাম না; আবার আগামী কল্য সেরূপ থাকিব না। আমরা নিয়তই অবস্থান্তরিত হইতেছি। এই জড় জগতে নিয়তই হ্রাস বৃদ্ধির জোয়ার ভাটা খেলিতেছি।

জন্য বস্তু মাত্রেরই নাশ আছে, পদার্থ মাত্রেই যখন জন্য, তখন তাহাদেরও অবশ্যই বিনাশ হইবে। আমি যদি জন্য হই, তাহা হইলে আমার নাশ কেন না থাকিবে?

ভাল কথা। অই যে বুদ্‌বুদ্‌টী জলের উপর ভাসিয়া উঠিল, মন্দ-মারুত হিল্লোলে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিল, আবার দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল; উহা অবশ্য অই জল হইতেই বায়ুর শক্তিতে উৎপন্ন হইয়াছিল, বায়ুর সঙ্গেই খেলা করিয়াছিল, আবার বায়ুর প্রকোপে ভগ্ন হইয়া অই জলেই মিশাইয়া গেল। বুদ্‌বুদ্‌ নামধারী অই জন্য বস্তুটীর আদিও জল আবার অন্তও জল। জলে মিশিয়া গেলে তাহার সেই বুদ্‌বুদ্‌ নামটী নষ্ট হইয়া গেল বটে, কিন্তু বল দেখি, তাহাতে যে পদার্থ ছিল, তাহার কিছুমাত্র ধ্বংশ হইয়াছে কি? ঠিক্ যে জলাংশ জল হইতে উঠিয়া, বুদ্‌বুদ্‌ নাম ধারণ পূর্ব্বক জন্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, আবার সেই জলাংশই, ঠিক ততটুকুই কেবল নামটী মাত্র হারাইয়া আবার সমগ্র জলেই মিশিয়া রহিল। পূর্ব্বে তুমি যাহাকে বুদ্‌বুদ্‌ বলিয়াছিলে, এখন তাহাকে আর বুদ্‌বুদ্‌ আকারে পাইতেছ না; কিন্তু অবশ্যই জলাকারে সেই পদার্থই বর্ত্তমান আছে, পূর্ব্বেও ছিল, সুতরাং অই বুদ্‌বুদের যে পদার্থ, তাহার আদিও যাহা, অন্তও তাহাই—অর্থাৎ—সেই জল। এখন জল যদি অনাদি ও অনন্ত হয়, তাহা হইলে, যে বস্তু সেই জলের কার্য্য, যে বস্তু সেই জলেরই অংশ বা বিকাশ এবং যাহা কারণেই লীন হইয়া যাইতেছে, তাহাও কি অনাদি ও অনন্ত হইবে না?

যেমন জল মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকারের তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদাদি উৎপন্ন হইয়া বায়ুর হিল্লোলে নানা প্রকার নাম ও অবস্থা প্রাপ্ত হওতঃ নিয়ত রূপান্তরিত হইয়া—কেবল নামটী হারাইয়া আবার সেই জলেই লীন হইতেছে, সেইরূপ সমস্ত পদার্থই, সমস্ত সৃষ্টিই, সমস্ত কার্য্যই সেই স্রষ্টার, সেই কারণেরই বিকার বা বিকাশে কাল প্রবাহে নিয়ত নামান্তর, অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া আবার সেই স্রষ্টাতেই—সেই কারণ বারিতেই লীন হইয়া যাইতেছে, আবার সেই কারণ হইতে বাহির হইয়া পুনরায় কারণেই মিশিতেছে। এইরূপ আবর্ত্তনে কেবল নামান্তর ও অবস্থান্তর হইতেছে মাত্র, কিন্তু পদার্থের উৎপত্তি বা ধ্বংশ কিছুই হইতেছে না, মূল পদার্থ পূর্ব্বেও যাহা ছিল, এক্ষণে তাহাই আছে,

পরে আবার চিরকাল অনন্তকাল তাহাই থাকিবে; সুতরাং পদার্থ মাত্রেই অনাদি ও অনন্ত।

কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে। পদার্থ মাত্রেই পঞ্চভূতের বিকার বা বিকাশ। পদার্থরূপ যে কার্য্য তাহার উৎপত্তি ও নাশ তাহার কারণরূপী পঞ্চভূত! অর্থাৎ, পদার্থ মাত্রেই পঞ্চভূতের বিকারে অবস্থান্তর ও নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া আবার সেই পঞ্চভূতেই মিশিয়া যাইতেছে; কার্য্য কারণেই পরিণত হইতেছে, আবার সেই কারণ হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে। যখন কোন পদার্থ সেই পঞ্চভূতে লীন হয়, যখন পদার্থ অবস্থান্তরিত বা রূপান্তরিত হয়, তখনই আমরা সেই পদার্থের "পঞ্চত্ব প্রাপ্তি" বলি। জীব-দেহের ন্যায় সকল পদার্থই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, পরমাণু সমষ্টির আবার কারণ। সেই পরমাণু সমূহ কি, কাহার বিকাশ বা বিকার, সেই পরমাণু সমষ্টি আবার কাহার সহিত মিশিয়া যাইবে?—তাহাই দেখা যাউক।

পরমাণু সমূহের আদি কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত প্রকৃতি পুরুষ হইতে উৎপন্ন, সমস্তই সেই প্রকৃতি পুরুষের বিকার বা বিকাশ মাত্র, আর জীবাত্মা সেই পরমাত্মারই অংশ; সুতরাং আমার উৎপত্তি এবং লয় সেই প্রকৃতি-পুরুষরূপী পরমাত্মাতে বা পরব্রহ্মেই হইতেছে। সেই পরব্রহ্ম যখন নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, তখন আমি কি নিত্য, অনাদি ও অনন্ত নহি?

সাংখ্যকারের মতে "সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ং" অর্থাৎ প্রকৃতির সত্বাদি গুণত্রয়ের ন্যূনাতিরিক্ত ভাবই বৈষম্য ভাব, নতুবা সাম্য ভাব। এই বৈষম্য ভাবেই সৃষ্টি, আর সাম্যভাবেই প্রলয়। প্রলয়ে কার্য্য কারণে মিশিয়া যায়;—"নাশঃ কারণ লয়ঃ" অর্থাৎ কার্য্য বা সৃষ্টি যখন কারণ বা পরব্রহ্মে লীন হয়, তখনই আমরা 'নাশ' বলি, কিন্তু এই নাশ, এই মৃত্যু, এই পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি কিছুতেই আমার আমিত্বের অন্ত করিতে পারিবে না। এই আমিই বারে বারে—আসিতেছি, বেড়াইতেছি—যাইতেছি।

সৃষ্টি ও স্রষ্টা, কার্য্য ও কারণ যে একই পদার্থ, তাহা হিন্দুরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ইহাই হিন্দুর 'সোঽহং' তত্ত্ব; এই 'সোঽহং' লইয়াই

হিন্দুর হিন্দুত্ব, ইহাই হিন্দুকে ধর্ম্ম-জগতে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছে। জগতে কেবল হিন্দুই বলেন,—"আমি তিনিই," তাঁহাতে আমি বর্ত্তমান এবং আমাতেও তিনি বর্ত্তমান; কেবল আমি কেন, কীটানুকীট প্রত্যেক পরমাণুই তিনি। মহাভাগবত, ভক্ত-প্রবর প্রহ্লাদ, এই তন্ময়ত্ব লাভ করতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্ব উপলব্ধি করিয়া ভগবানকে স্তব করিবার সময় বলিয়াছিলেন,—"অনন্তের সর্ব্বব্যাপিত্ব জন্য তিনিই আমি, আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, আমি সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান এবং সনাতনরূপ আমাতেই সমস্ত লীন হইবে। আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে অক্ষয়, নিত্যও আত্ম সংশ্রয় ব্রহ্মনামক পরমাত্মা এবং আমিই শেষে পরম-পুরুষ"।

সাধক রামপ্রসাদ, জন্ম পরিগ্রহ ও মৃত্যু সম্বন্ধে কেমন সুন্দর কথা বলিয়া, জন্ম যে আদি নহে এবং মৃত্যু যে শেষ নহে—তাহাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। একটী গীতের একাংশে আছে—(জীবন সম্বন্ধে)

"যেমন জল বিম্ব জলে উদয়,
জল হ'য়ে সে মিশায় জলে।"

সাধক শ্রেষ্ঠ মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন যে—আমাদের এই জীবাত্মা, সেই পরমাত্মার অংশ স্বরূপ সেই পরমাত্মা হইতে উদিত হইয়া আবার সেই পরমাত্মাতেই মিশায়। তিনি বুঝিয়াছিলেন, "সকল পদার্থ পরব্রহ্মের অংশ বা বিকাশ মাত্র।"

আবার মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"তুই ঘটাকাশ ঘটের আকাশ,
ঘটের নাশকে "মরণ" বলে।"

অর্থাৎ দেহীর দেহ ঘটতুল্য, আর জীবাত্মা তন্মধ্যস্থ আকাশ বা "ঘটাকাশ" তুল্য; এক্ষণে ঘট ভগ্ন ইহলেই যেমন সেই ঘটাকাশ অনন্ত আকাশে, আর সেই ঘট পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, সেইরূপ দেহরূপ ঘটের নাশে জীবাত্মারূপী আকাশ পরমাত্মারূপ অনন্ত আকাশেই মিশিবে, যদ্দারা এই ঘটরূপ দেহ ভগ্ন হয়, তাহাই মৃত্যু; সুতরাং মৃত্যু আমার অন্ত নহে।

অনেক মহাপুরুষ এই সোঽহং তত্ত্ব অবগত হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন,—"আমি তিনিই" "আমি অনাদি ও অনন্ত" যখন দেখিতেছি, প্রত্যেক পরমাণু হইতে অত্যুচ্চ গিরিবর পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহা হইতে অভিন্ন, সুতরাং অনাদি ও অনন্ত, তবে আমি কি পাপমুখে বলিতে পারিব না, "আমি অনাদি ও অনন্ত"

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

ক'রোনা নৈরাশ।

মন প্রাণ সবি মোর সঁপেছি তোমায়
ভালবাসো নাই বাসো দুঃখ নাহি তায়!
কাঁদাইয়া সুখী যদি পূরে মনোসাধ
চাহিনা তোমার সাথে সাধিবারে বাদ।
ভালবেসে সুখী আমি, নাহি অন্য আশ,
সে ভালবাসায় মোরে ক'রোনা নৈরাশ।
অরধ জীবন গত তব আরাধনে,
না পূরাও কামনা সে ঠেলোনা চরণে।
দিনান্তে চোখের দেখা বারেক বাসনা,
ঘৃণায় নয়ন তুলে তাও দেখিবে না?
যতদিন আছে এই অতৃপ্ত জীবন
পূজে লই ও চরণ ক'রোনা বারণ।

শ্রীমতী কিরণশশী বসু।

সুধায় গরল।

কেতকী, মল্লিকা, মালতী, গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি পরম রমনীয় কুসুমনিকরে সুসজ্জিত অদূরে ঐ উদ্যানটীর কি মনহারিণী শোভা। বালকের চঞ্চল-কটাক্ষ, স্থাবরের স্থির-দৃষ্টি, ভাবুকের ভাবোদ্ভাসিনী নব-রসচ্ছটা, তরুণীর তরুণ প্রেমোচ্ছ্বাস, কোকিলের মধুর কূজন, এ সকলই এক সময়ে একধারে সমাবিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় ফুল-রাঁজির ন্যায় একটী হারে গাঁথা। লালফুল দেখিয়া বালকের চিত্ত-চপলতা প্রকাশ পাইল; ফুলটী ছিঁড়িয়া বালক অমনি কর্ণমূলে বা মস্তকোপরি ধারণ করিল—মনের ক্ষোভ ভুলিয়া গেল। সমাগত বৃদ্ধ কুসুমের নববিকাশে স্বীয় জীবনের নব-যৌবনোপলব্ধি করিল; ভাবুকগণ স্বীয় চিন্তনীয় বিষয়ের অনুকূল প্রকৃতি-বিকাশাবলোকনে ভাব-রসে ডুবিয়া রহিল; যুবতী কুসুমের নব-লাবণ্যচ্ছটা পরিদর্শনে স্বীয় পতির গলায় প্রেম উপহার পরাইবার জন্য একচিত্তে কুসুম-মালা গাঁথিতে লাগিল এবং গাঁথিতে গাঁথিতে প্রেমামোদে আটখানা হইয়া, বিম্বাধরে, লালমেঘের অঙ্কে বিজলী খেলার ন্যায় সুধাহাসি হাসিল। বসন্তের প্রিয়-সহচর কোকিল, সুগন্ধি সংমিলিত প্রভাত সমীরণে বসন্ত-মলয় ভ্রমে সপ্তমতালে গগন-তল ভেদ করিয়া, সুমধুর সঙ্গীতে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল।

প্রকৃতি এই মনোমোহিনী মূর্ত্তি বাল-সূর্য্যের রক্তিমালোকে হাসিয়া জগৎ হাসাইল। নিদ্রিত বিশ্ব জগৎ জাগ্রত হইল। নিমীলিত নেত্রদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। উদ্‌ঘাটিত নেত্রদ্বার দিয়া স্বভাবের রমণীয় জ্যোতি নয়নোপরে প্রতিভাত হইল, কিন্তু বিষয়ানুরক্ত মানবের পার্থিব নয়ন সামান্য পার্থিব দর্শনোপভোগেই চিত্তসুখ অনুভব করিতে সমর্থ। উহার অপার্থিব লাবণ্য ও গৌরব বিকাশের কি বুঝিবে? চক্ষু থাকিলেই দেখিতে পারা যায় না—দেখার মত দেখা বা দর্শনীভূত পদার্থ সমূহের কার্য্যোপলব্ধি করা স্বতন্ত্র বিষয়। অনেকেই আত্ম-

ফলের ভূপতন স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু নিউটন * যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তেমন চক্ষে কয়জন উহা পরিদর্শন করিয়া থাকেন? ফুলটী দেখিয়া মানবমণ্ডলী স্ত্রী পুরুষ সকলেই ভুলিয়া রহিল; কিন্তু ফুলের মাহাত্ম্য, ফুলোৎপত্তির হেতু পর্য্যালোচনা কয়জনের মনে জাগরিত ও আন্দোলিত হইতেছে? সকলেই উহাকে বিলাসোপহারে পরিণত করিয়া বিলাসাতীত ভগবন্মহিমা-কীর্ত্তনে-বিরত মানবের চিত্ত বিনোদনার্থ ব্যবহার করিতেছে, সৃষ্টিকর্ত্তার অপার করুণা ও কৌশলের বিষয় ক্ষণমাত্রও কাহারু মনে উদিত হইতেছে না! তাই বলিয়াছি— "দেখার মত দেখতে আমরা জানিনা।" হায়! আমরা নয়ন থাকিতেও অন্ধ।

হায়! যদি আমরা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের (Wordsworth) মত জ্ঞানী ও চিন্তাশীল হইয়া স্বভাবশোভা পরিদর্শনে ভগবন্মহিমা অনুভব করিতে সমর্থ হইতাম, যদি আমাদের হৃদয় প্রহ্লাদের মত "ক" দেখিয়া আবেগ স্রোতে "কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া গলিয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলে প্রকৃতি দেবীর কোমল অঙ্কগত কুসুম-সৌরভে ভগবৎ প্রেমের অতুলনীয় মলয়প্রবাহে পুলকিত ও শীতল হইয়া প্রাণ মন অনন্ত আমোদরসে আপ্লুত হইত, অজ্ঞান-তমসা বিদুরিত হইয়া অপার্থিব জ্ঞানালোকে প্রতিভাত হৃদয় তন্ময় হইয়া যাইত। হায়! আমাদের হৃদয় ওরূপ নয়, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি নিস্তেজ। আমরা মোহান্ধ। হায়! ভগবানের স্বকরাঙ্কিত প্রকৃতি-ছবির মুখাবলোকনেই যদি তাঁহাকে স্মরণ করিতে বা চিনিয়া লইতে না পারিলাম, তবে কৃত্রিম কৌশলোদ্ভূত রিপুকর-চিত্র পরিদর্শন করতঃ কিরূপে ভগবদুপাসনা ও তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিতে

* সার আইজাক নিউটন, ইনি একদা যখন মাঠে বৃক্ষতলে বসিয়া স্বীয় পাঠাভ্যাসে রত ছিলেন, তখন একটী আতাফল বৃন্ত-চ্যুত হইয়া ভূ-পতিত হয়। তিনি, ইহা কেন ভূপতিত হইল, কেন উপরে উঠিল না? ইত্যাদি বিষয় ভাবিতে ভাবিতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিয়া ছিলেন।—বী, সং।

সমর্থ হইব? চপলচেতা মানব-হৃদয়ে ভগবদ্ভাব আর তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষে জীর্ণতরী—উভয়ই সমান—উভয়ই বিঘ্নসঞ্চারক।

তরুণীর ভাল দেশস্থিত রক্তিমাভানুকরণ করিয়া উষা দেবী পূর্ব্ব ভাগে বালার্ক সিন্দুর ফোঁটায় সুসজ্জিতা হইল ও ভগবন্মহিমা কীর্ত্তনোদ্ভব প্রেমাশ্রু ছলে অজস্র-ধারে তুষার বিন্দু পাতিত করিয়া ভূমণ্ডল সিক্ত করিল। তপনদেব কুমুদিনীর প্রফুল্ল বদনোবলোকনে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া স্বীয় প্রণয়মূর্ত্তি কমলিনীকে ফুটাইয়া সমাগত মধুলোলুপ মধুকর কর্ত্তৃক পরমপিতা পরমেশ্বরের অতুল যশঃ গান করাইয়া মজিয়া রহিল ও জগৎ মজাইল। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেরই আজ আহ্লাদ-সাগর উথলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সঙ্কীর্ণ মানবান্তর এই বিশ্ব-মনোমোহন আমোদের অংশ হইতে বঞ্চিত। যদি আজ হৃদয়ে প্রকৃতি-হাস্যের ক্ষণদাবিলাসে ভগবন্মহিমার ক্ষীণালোক প্রতিভাত হইত, যদি প্রকৃতি বিকাশের অন্তর্নিহিত অভেদ্য রহস্য, মূলস্থিত কোন গুপ্ত উৎসবের বর্ত্তমানত্বের বিন্দু মাত্র পরিচয় প্রদান করিত, তাহা হইলে প্রকৃতির এই নিরুপম উপহার হৃদয়কে আজ ক্ষণেক তরে শান্তি নিকেতনে পরিণত করিত, হৃদয় আজ আবেগের স্রোতে স্বর্গ-মন্দাকিনীর প্রবাহে আপ্লুত হইত, নয়নে আজ প্রেম-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে পদ্মিনীর ফুল্লসুষমা বিরাজ করিত। হায়! হৃদয়ত তেমন নয়। দর্পণের গুণানুসারে প্রতিবিম্বের তারতম্য হইয়া থাকে। তাই বলি—হৃদয়খানি কুসুম কোমল, অবলা-সরল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ও কোকিলের মত তাল লয় সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন, যেন স্বভাবের হাসিমাখা বদন-চন্দ্রমালোকে সৃষ্টিকর্ত্তার অপার মহিমা প্রতিবিম্বিত ও কীর্ত্তিত হইতে পারে। কুসুম-সুশোভিত উদ্যানাবলোকনে ভগবৎপ্রেমিকের মন নাচিয়া উঠিল এবং সংসারের অতুল উপহার স্বরূপ সচন্দন পুষ্পরাশি তদ্গতচিত্তে ভগবচ্চরণে উৎসর্গ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! আমার প্রাণ মন তৎপ্রেমে ভিজিল না কেন? তৎগুণানুকীর্ত্তনে সমুৎসুক হইল না কেন? বুঝিলাম, আমার হৃদয় তৎচরণোপহারের উপযুক্ত নয়। পাপরূপ জলদাবরণ আমার হৃদয়াকাশে

ভগবন্নামচন্দ্রমার বিমল অবলোক প্রতিভাত তন্মহিমা-প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতে দিতেছে না? হায়! এই বিশ্ব-নয়ন-প্রীতিকর উদ্যানশোভা আমার নয়ন পরিতোষের জন্য নহে; এই কুসুম প্রস্ফুটন আমার জ্ঞান-নেত্র ফুটাইবার জন্য নহে, কোকিল-কুজন উদ্ভাসিত প্রেমোচ্ছ্বাসে আমাকে ভগবন্মহিমা কীর্ত্তনে নিয়োজিত করিবার জন্য নহে। এই উদ্যানটী আমার নয়নে—অপূর্ব্ব বিলাস ভবন, কুসুম অত্যুত্তম পার্থিব কৃত্রিম প্রণয়োপহার, কোকিল-কুজন বিরহ যন্ত্রণা, মিলনে ভ্রমর-গুঞ্জন বলিয়াই প্রতীতি হয়। হায়! মায়ার অঙ্কে কালসর্পের অঙ্কে নিদ্রিত হইয়া আমি সংক্ষিপ্ত জীবন অপাত্রে উপহার প্রদান করিলাম। হায়! "সুধায় গরল" বোধে আমি সাধের জিনিষ হারাইলাম। জগতে এইরূপই "সুধায় গরল" সাধে বাদ সাধিয়া যায়।

শ্রীমধুসূদন সেন।

দূরে থাক।

থাক, থাক, দূরে থাক, নিকটে এসনা।
শুনিব যে আছ ভাল,
দূরে থাকি চিরকাল,
একাকী থাকিয়া শুধু পাইব বেদনা।
থাক, থাক, দূরে থাক, নিকটে এসনা॥

স্বপনে হেরিব সব,
মধুর মূরতী তব,
চিরদিন র'ব সহি' বিষম যাতনা।
থাক, থাক, দূরে থাক, নিকটে এসনা॥

আসিবে আসিবে ভেবে,
আশায় জীবন যা'বে,
নিরাশ হইলে প্রাণ দেহেতে রবেনা।
থাক, থাক, দূরে থাক, নিকটে এসনা॥

হ'য়ে পাগলিনী মত
হাসিব কাঁদিব কত
যতনে চরণ তব করিনু সাধনা।
থাক, থাক দূরে থাক, নিকটে এসনা॥

নিয়ত হৃদয়ে ভাবি',
তোমার সুন্দর ছবি,
জীবন কাটা'ব সুধু ভাবিয়া ভাবনা।
থাক, থাক, দূরে থাক, নিকটে এসনা॥

সুখে থাক প্রাণময়,
প্রণমি চরণদ্বয়,
আসি ভবে আসি তবে দাসীরে ভুলনা।
থাক, থাক, দূরে থাক, নিকটে এসনা॥

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।

কলিতে সত্যশাসন।

মথুরার শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্যের চার পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কাশীনাথ একজন বড়দরের চাকুরে। মাস গেলে ৪০০৲ শত টাকা ঘরে আনেন। অপর তিনটি ভাই সামান্য রকমের কাজ কর্ম্ম করেন; অতএব কষ্ট,—ডাইনে আনিতে বাঁয়ে কুলায় না। ভগবান যাদের

ধন দেন, তাদের প্রায় পুত্র দেন না, সুতরাং কাশীনাথ নিঃসন্তান। ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুকন্যাদিগের ভরণপোষণ ও বিবাহ প্রভৃতিতেই তাঁহার আয়ের অধিকাংশই নিঃশেষিত হয়, সঞ্চয় প্রায় হয়না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাশীনাথ তথাপি সর্ব্বদা প্রফুল্লবদন। তিনি সর্ব্বদাই বলেন, "আমিই বা কে, আর ওরাই বা কে? এক গাছের চারিটি শাখা বৈ আর কিছুই নয়!"

কাশীনাথের এইরূপ আচরণে বড় বউঠাকুরাণীর মনে বড়ই কষ্ট হয়। তিনি স্বামীকে কুপরামর্শ দিতে একদিনও ভুলেন না। একদা কাশীনাথ রজনীযোগে আহারাদি করিয়া, তাকিয়া হেলান দিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন, এমন সময় মানময়ী উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া অভিমান প্রস্ফুরিতাধর ও বাষ্পবিগলিত নেত্রে স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাশীনাথ তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু ভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— "কি বড়গিন্নি! ফোঁপাচ্চ কেন?"

মান। তুমি খালি আমাকে ফোঁপাতেই দেখ।

কাশী। যা দেখ্‌ছি—তাই বল্‌ছি, তুমি যদি না ফোঁপাতে, তা' হলে কি আর অমি অমন কথা মুখে আনতুম্?

মান। আমার জ্বালা তুমি বুঝ্‌বে কি?

কাশী। আধখানায় জ্বালা ধরলে কি আর আধখানা কিছু টের পায় না?

মান। কৈ আর পায়?

কাশী। তবু কি হয়েছে বলই না?

মান। তুমি ত আর আমার নও, তুমি এখন পরের।

কাশী। ভাল বুঝ্‌তে পারলেম না, ভেঙ্গেচুরেই বল?

মান। বলি, মাস গেলে যে চার চাল্লিশ টাকা ঘরে আন, তার চার কড়া কড়ি আমায় দেখাও দেখি।

কাশী। ওঃ! তাই বল—বুঝ্‌তে পাই।

মান। কেন? কথাটা কি মনে ধর্‌লো'না?

কাশী। সংসার খরচে যদি টাকা ব্যয় হয়ে যায়, তা হলে আর কোথা থেকে চার কড়া কড়ি দেখ্‌তে পাবে?

মান। বলি, সংসার সংসার যে বল, তোমার সংসারের মধ্যে ত দেখ্‌চি তুমি আর আমি, এই দুটো পেট।

কাশী। আর সকলে কি বানে ভেসে এসেছে নাকি?

মান। আর সকলের কি কেউ নেই? তুমি না দেখ্‌লে কি আর কেউ দেখ্‌বার নেই?

কাশী। তারা যা আনে, তাতে তাদের কুলায় কি?

মান। তা তুমি কি কর্‌বে?

কাশী। আমি কি কর্‌ব! আমি তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই, তারা না খেতে পেলে আমায় দেখ্‌তে হবে না?

মান। তবেই তোমার টাকা জমেছে? আর যদি বল যে আমার কিছু জমেনা, তা হলে দশ কথা শুন্‌বে আমার কাছে।

কাশী। তা কি মিছে কথা? সব টাকা ত সংসার খরচেই যায়।

মান। তুমি সংসারের কথা কইলেই আমার গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেয়।

কাশী। তুমি পরের মেয়ে, তোমার গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেবে আশ্চর্য্য কি?

মান। পরের মেয়ে নিয়েই ত সংসার, পরের মেয়েইত আপনার।

কাশী। অবিশ্যি আপনার বলে মানি, কিন্তু তুমি যদি আপনার মত না হতে পার, তা হলেত আর আপনার নও।

মান। ভাল কথা বল্লে কি পর হয়ে যায়?

কাশী। তুমি যদি ভাল কথা কও, তা হলে তুমি আমার মাথার মণি, তা নইলে তুমি আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল।

মান। আমি আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল আর ওরা তোমার মাথার মণি।

কাশী। তা নয়ত কি? আজ যদি তুমি মরে যাও, তা হলে তোমার মত বৌটা [illegible] পায়ে ধরে সাধাসাধি কর্‌বে, তখন তোমাদের আবার মুখ কি?

মান। ভগবান! সেই দিন দাও, যেন আমি শীঘ্র মরি, তোমার হাড় যুড়োয়।

কাশী। তা রোজ রোজ এ রকম করে জ্বালাতন হওয়ার চেয়ে জ্বালাতন না হওয়াই ত ভাল!

মান। তবে পা নিয়ে এস, তোমার পায়ে মাথা কুড়ে মরি, তোমার স্ত্রী-হত্যার পাতক হো'ক।

কাশী। বাঃ! বেশ মজার কথা! তুমি আত্মহত্যা কর্‌বে, আর স্ত্রীহত্যার পাতক হবে আমার!

মান। রঙ্গই খালি শিখেছ বৈত নয়, ভাল কথায় ত কাণ দেবে না?

কাশী। তুমি ভাল কথা কহিতে শিখেছ—একথা শুন্‌লেও আমার আহ্লাদ হয়। এত ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠ কর্‌লে, কিন্তু তুমি যে বাঁদর—সেই বাঁদরই আছ, মানুষ আর হলে কবে?

মান। আমি বাঁদর বৈকি! পোড়া কথার শ্রী দেখ।

কাশী। বাঁদর—কি মানুষ, এই এক আঁচড়েই টের পাওয়া গেল, নিত্য এত বকুনি খাও, তবুত শোধ্‌রালে না! বাঁদর কি আর গাছে ফলে?

মান। ভাল আমি বাঁদর, বাঁদরই আছি, তুমি ত মানুষ?

কাশী। সেটা কি আর মিছে কথা? পাড়ার লোক কাকে ভাল বলে, আর কাকেই বা মন্দ বলে?

মান। ওঃ! পাড়ার লোকের কথায় আমি ডরিয়ে গেলুম!

কাশী। যে নিন্দায় ডরায় না, সেকি মানুষ?

মান। বলি ওসব রাখ, একটা ভাল কথা বল্‌ব—শুন্‌বে?

কাশী। অবশ্য, ভাল কথা আমার শিরোধার্য্য।

মান। বলি, আলাদা হও, তা হলে সব দিকেই সুবিধে।

কাশী। ভগবান ত দেহ কয়টা আলাদাই দিয়াছেন, আবার আলাদা হ'ব কি রকম?

মান। বলি তা নয়, হাঁড়ি আলাদা কর।

কাশী। তাত আছেই, ভাতের হাঁড়ি আল্‌দা—ব্যঞ্জনের হাঁড়ি আলদা।

মান। তোমাকে যে বোঝাবে, তার এদেশে ঘর নাই।

কাশী। কেন, তুমি ত বোঝাচ্চ, তুমি কি এ দেশের মেয়ে নও? তুমি কি বিলেতের?

মান। তা' তুমি বুঝ্‌চ কৈ?

কাশী। আমি এ দেশের ছেলে, তাই বিলিতি কথা বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

মান। কেন, এত সাদা কথা?

কাশী। আমি ত দেখ্‌চি সবই কাল, কালি-ঢালা একবারে। তোমার কথায় কাজ কল্লে আমিও কাল হয়ে যাব।

মান। বটে! আমি তা' হলে এত মন্দ!

কাশী। তা যদি তুমি এত শীঘ্র দেখ্‌তে পাও, তা হ'লে ত আমি বাঁচি।

মান। পাগলের সঙ্গে আর আমি বক্‌তে পারিনে; আমি এখন যাই। কাল যা' হয় একটা ঠিক করো।

কাশী। গেলেই বাঁচি। কালই ঠিক করা যা'বে।

মানময়ী হতাশ হইয়া প্রস্থান করিল, কাশীনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে আফিস্ যাইবার পূর্ব্বে চারি ভ্রাতা একত্রে আহার করিতে বসিলেন, মানময়ী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মানময়ী ঘোম্‌টা টানিয়া পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময় কাশীনাথ মধ্যম ব্রজনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দেখ ব্রজ! বড়বউ তোমাদের আলাহিদা হইতে চান্। তোমরা কি তাতে রাজি আছ? যদি রাজি থাক, তাহা হইলে অদ্য যাহা হইবার হইয়াছে, কালি হইতে উহাঁকে একটি করিয়া মাল্‌সা ও কিছু চাল ডাল দিবে, উনি স্বয়ং রন্ধনাদি করিয়া খাইবেন, আমরা চারি ভাই, আমাদের ভাবনা কি? আমরা একটা সদুপায় চিন্তা করিব। মেজবউমা কালি হইতে রন্ধনাদি করিবেন, আমরা ও ছেলে পিলে সকলে খাইবে। উনি আলাহিদা থাকিতে ভালবাসেন,

আলাহিদাই থাকিবেন।" এই লজ্জাজনক নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মানময়ী ভাতের থালা আছড়াইয়া ফেলিয়া রন্ধনশালায় গিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল—"মাগো! তুমি কোথায় আছগো—আমায় ডেকে নাও গো, এমন পোড়া ভাঁতারের হাতে আমায় সঁপে দিয়েছিলে গো, আমি যে আর সইতে পারিনে গো, আমি যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেলুম গো!" ইত্যাদি নানা সুশ্রাব্য কথায় পাড়া জাগাইতে লাগিল। কাশীনাথ ও অপর তিন ভ্রাতা কোন প্রকারে আহারাদি সমাপন করিয়া আফিস্ চলিয়া গেলেন।

পর দিবস হইতে কাশীনাথের কড়া হুকুম অনুযায়িক কার্য্য আরম্ভ হইল। মেজবউ ঠাকুরাণী রন্ধনের ভার লইলেন, বড় বউ ঠাকুরাণীর মাল্‌সা ভোগ আরম্ভ হইল। একদিন রবিবারে সকলেই বাড়ীতে আছেন; বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বড়বউ মাল্‌সা চড়াইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে কাশীনাথ তাঁহার রন্ধনশালার দ্বারে উঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বড়গিন্নি! কেমন আছ? রাঁধাবাড়া হলো? আমি কিছু প্রসাদ পাব কি?" এই ব্যঙ্গোক্তিতে মানময়ী বলিয়া উঠিলেন,—"আমার সঙ্গে কারুর কথা কইতে হবে না, আমি কারুর সঙ্গে কথা কইতে চাই না—কাঙ্গালের সঙ্গে কথা ক'য়ে কি সুখ পাবে?"

কাশীনাথ দেখিলেন,—কথাগুলা এখন বাঁকা আছে, কিন্তু অনেকটা অভিমান-ব্যঞ্জক। কাশীনাথ ভাবিলেন, রোগের শেষ রাখা উচিত নয়। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—"দেখ, বড়গিন্নি কারুর সঙ্গে কথা কইতে চান না, তোমরা ওঁর সঙ্গে আজ অবধি কেউ কথা কয়ো না।"

কাশীনাথের হুকুম লঙ্ঘন করিলেই অনর্থপাত। বড়বউ ঠাকুরাণীর সহিত আর কেহ কথা কহেন না। তাঁহার কেবল দিনান্তে মাল্‌সা ভোগ ও মৌনব্রতে কাল কাটিতে লাগিল। বড়বউ ঠাকুরাণী ভাবনা ও ক্ষোভে ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিলেন। স্বভাবেরও অনেকটা বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া আসিল।

একদা রজনীযোগে কাশীনাথ আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে মানময়ী ভাবিলেন,—'আর কতদিন এমন করিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিব? জগদীশ্বর আমার দুর্ম্মতির জন্য আমাকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়াছেন, এইবার একবার স্বামীর চরণে শরণ লই।'

এই ভাবিয়া, মানময়ী ধীরে ধীরে গমন করিয়া স্বামীর গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কাশীনাথ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বড়গিন্নি! বিয়ারামটা কেমন আছে?"—মানময়ী হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—"বিয়ারাম ভাল হইয়া গিয়াছে, এত শুকাইলে কি আর বিয়ারাম থাকে? এখন তুমি চরণে স্থান দিলেই আমি শান্তিজল পাই।"

কাশীনাথ দেখিলেন, কথাগুলি সরলতা-ব্যঞ্জক। তিনি তৎপ্রযুক্ত দুর্ব্বাক্য সকল ভুলিয়া গিয়া অন্তরে অনেকটা আর্দ্র হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ বাক্স খুলিয়া এক ছড়া অতি সুন্দর মুক্তার হার বাহির করিয়া বলিলেন,—"মানময়ি! আজ তোমার কণ্ঠ হইতে সরল কথা বাহির হইয়াছে, অতএব এই সরল মসৃণ মুক্তামালাই তোমার কণ্ঠের উপযুক্ত অলঙ্কার। আশা করি—তুমি জন্মের মত বাঁকা কথা ছাড়িয়া দিবে। তুমি বলিয়াছিলে যে, তুমি আমার চার কড়া কড়িও দেখিতে পাওনা, কিন্তু আমি তোমার সংশোধনের পারিতোষিক স্বরূপ ৪০০৲ শত টাকার এই মুক্তার মালা অগ্রেই খরিদ করিয়া রাখিয়াছি, নম্র হইয়া ঘাড় নামাইয়া দিলে তবেত পরাইয়া দিতে পারিব, দাম্ভিক ভাবে গ্রীবা উন্নত করিয়া রাখিলে, নাগাল পাইব কিরূপে? মানময়ি! তুমি জানিবে—নিজের মান নিজের হাতে। তুমি সরল হইলে ধন মানের অভাব কি? ধন মান আপনি পায়ে জড়াইয়া ধরিবে।" এই বলিয়া হার পরাইয়া দিলেন।

এই দিবস অবধি মানময়ী দেবর ও দেবরপুত্রদিগকে পেটের সন্তানের ন্যায় স্নেহ মমতা করিতে লাগিলেন। শাসন করিতে জানিলে হয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

কলিকাতার ইতিহাস।

আজি কালিকার দিনে কলিকাতার সহিত সংশ্রব নাই এমন গ্রাম বা পল্লী বঙ্গভূমে অতি বিরল; সুতরাং "কলিকাতার ইতিহাস" পাঠক-পাঠিকা মাত্রেরই প্রীতি-প্রদ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এ পর্য্যন্ত যে সকল পত্র-পত্রিকায় কলিকাতার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় একত্র পাঠ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি অতি অল্প। যত প্রকারের পত্র-পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় গ্রহণান্তর পাঠ করা দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসীর মধ্যে কয়জনের সম্ভবে? এই সমুদয় অবগত হইয়া, যাহাতে সর্ব্ব প্রকারের, সর্ব্ব অবস্থার ব্যক্তি মাত্রেই কলিকাতার এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত বিবরণ অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্য আমরা বিবিধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ সঙ্কলিত করিয়া পত্রস্থ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আমাদের দ্বারা সংগৃহীত বিবরণ যে সম্পূর্ণ, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে পাঠক-পাঠিকার মধ্যে যদি কেহ ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু অবগত থাকেন, অনুকম্পা প্রদর্শনে তাহা আমাদিগকে প্রদান করিলে, আমরা আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত পত্রস্থ করিব। সাধারণের সহায়তা পাইলে আমরা যে এক অতি সুন্দর "কলিকাতার ইতিহাস" প্রকাশ করিতে পারিব, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আশা করি, সকলেই আমাদের এ বিষয়ে জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। বী, সং।

প্রথম অধ্যায়।

আমরা এক্ষণে কলিকাতার যেরূপ অবস্থা দেখিতে পাই, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইহার এ সকল কিছুই ছিল না। দুই শত বৎসরই বা বলি কেন? দশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার যে অবস্থা ছিল, আজিকার দিনে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কলিকাতার সুখ স্বচ্ছন্দ ক্রমেই বাড়িতেছে।

যদিও বর্ত্তমান কলিকাতা নগর বহুদিনের নয়, কিন্তু এই স্থান বহুদিন হইতে এই নামে পরিচিত। আইন-ই-আকবরীতে এই স্থান এই নামেই উক্ত হইয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে কলিকাতাকে সাতগাঁও-(সপ্তগ্রাম) সরকারভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে *। এই গ্রন্থ সম্রাট আকবরের প্রধান মন্ত্রী বিখ্যাত পণ্ডিত ও যোদ্ধা আবু-উল্-ফজ্‌ল্ কর্ত্তৃক রচিত হয়। সুতরাং আকবরের সময়ে কলিকাতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না।

কিন্তু আকবরের সময়ে কলিকাতার যেরূপ উন্নত অবস্থা দেখিতে পাই, সেরূপ উন্নত অবস্থা কাল সাপেক্ষ। সুতরাং আরও প্রাচীন কালে কলিকাতার কথা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আইন-ই-আকবরীর পূর্ব্বের অন্য কোন গ্রন্থে কলিকাতার উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু এক্ষণে যে স্থানে কলিকাতা অবস্থিত, ঐ স্থানে কালীক্ষেত্র নামে কোন স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী কোন কোন পণ্ডিত বলেন, পুরাণাদিতে এই স্থানের উল্লেখ আছে। কালীক্ষেত্র একটি বিখ্যাত পীঠস্থান। পুরাণ-প্রসিদ্ধ একান্ন মহাপীঠের একটি মহাপীঠ। প্রাচীন পীঠের উপর কালীর মন্দির নির্ম্মিত হয় †। কালীক্ষেত্র বহুলা নামক স্থান হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহুলা অধুনা বেহালা নামে পরিচিত, দক্ষিণেশ্বর আজিও আছে ‡।

---

* "The Sirkar of Satgauw, contained, among others, the three towns of Calcutta, Barbakpur, Bakuya jointly paying into the Imperial Exchequer, the annual sum of Rs. 23,405." * * * "The spelling given in the Ai'n is 'Kalkatta' as pronounced by the natives now-a-days,"—J. B. Knight's *Calcutta*, P. I.

† গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ Calcutta is a place known from remote antiquity. The ancient Hindus called it by the name of KALIKSHETRA.

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে, এই স্থান অতি প্রাচীন এবং পূর্ব্বাপর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত। ইংরাজাধিকারের সূচনা হইতেই কালীক্ষেত্রের সীমা সঙ্কুচিত হইয়া আধুনিক কালীঘাটে পরিণত হইলেও, উহা আজিও তীর্থ বলিয়া বিশেষ পরিচিত। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই স্থানের অন্য কোন প্রাচীন বিশেষ বিবরণ জানিবার উপায় নাই।

তৎপরে একেবারে বল্লাল সেনের সময়ে এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় *। সে সময়ে ইহা একটি সুসমৃদ্ধ সহর ছিল। তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এখানে অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ হইত।

[আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে, বল্লাল সেন খ্রীঃ ১০৬৬ অব্দে রাজা হন। তিনি দেশহিতকর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।]

খ্রীঃ ১২০৩ অব্দে বাঙ্গালাদেশ মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইলেও এই স্থান প্রায় আরও শত বৎসর কাল স্বাধীন হিন্দু রাজার অধীন ছিল।

বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীন হইলে, ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইত। সপ্তগ্রাম ঐ

It extended from *Bahula* to *Dakhinashar*. *Bahula* is modern *Behala*, and the site of *Dakhinashar* still exists. According to the *puranas* a portion of the mangled corpse of SATI or KALI fell somewhere within that boundary; whence the place was called *Kalikhshetra*. Calcutta (Kalikata) is a corruption of *Kalikshetra*. In the time of Bollal sen it was assigned to the descendants of *Sera*.—*Pundit* PADMANAV GHOSHAL'S *letter, dated Calcutta, July* 1873 *in the* "INDIAN ANTIQUARY."

* গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

সকল প্রদেশের একটি। এ অঞ্চল মুসলমানাধিকৃত হইলেই, সপ্তগ্রাম এঁকটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হয়, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান সম্ভবতঃ সপ্তগ্রাম প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল। সম্রাট মহম্মদ তোগলক যে সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে, আজম-উল্-মুল্‌ক্ সে সময়ে সপ্তগ্রাম শাসন করিতেছিলেন। এ সময়ে বঙ্গের শাসনকর্ত্তারা কেবল মুখে দিল্লীর শাসন স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্য্যে প্রায় স্বাধীন ছিলেন।

কিন্তু এ সময়েও কলিকাতার বিবরণ কিছু জানিবার উপায় নাই। তৎপরে সম্রাট আকবরের সময়ে আবার কলিকাতার কথা দেখা যায়।

[জেলাল-উদ্দীন মহম্মদ আকবর সাহ্ খ্রীঃ ১৫৫৬ অব্দ হইতে ১৬০৫ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করেন। খ্রীঃ ১৫৪২ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি মানসিংহ, তোডরমল প্রভৃতির সাহায্যে উচ্ছৃঙ্খল বঙ্গদেশ, স্বকরতলগত করিয়াছিলেন।

তোডরমল্ল আকবরের সাম্রাজ্যের একটি রাজস্ব-হিসাব প্রস্তুত করেন। উহা "ওয়াশিল তুমার জমা" নামে বিখ্যাত। তাহাতে মোগল সাম্রাজ্য অষ্টাদশ সুবায় বিভক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গদেশ ঐ ১৮ সুবার একটি। বঙ্গ আবার ১৮ সরকারে ও ৬৮২ মহলে বিভক্ত। এ দেশের রাজস্ব ১০৬, ৮৫ ৯৪৪ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম ঐ আঠার সরকারের একটি এবং কলিকাতা একটি মহল ছিল। খ্রীঃ ১৫৮২ অব্দে ঐ হিসাব প্রস্তুত হয়।]

কিন্তু আকবরের সময়েই কলিকাতা অঞ্চলের দুর্দ্দশার দিন উপস্থিত হইয়াছিল। "১৫৮৫ অব্দে বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময় ভয়ানক ঝড় ও সমুদ্রের আক্রমণে দক্ষিণদিক নষ্ট হইয়া যায়। প্রায় দুই লক্ষ প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। একটি মন্দির অবলম্বন করিয়া কতকগুলি লোক রক্ষা পায়। তৎপরে ঘোর ভূমিকম্প হইয়াছিল। গঙ্গার অসংখ্য শাখার বেগ পরিবর্ত্তিত হইয়া অনেক স্থান নষ্ট হইয়া যায়। তদবধি দক্ষিণদেশ ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। যে দুই একজন অধিবাসী ছিল, তাহারাও মগদিগের

উৎপাতে বাসস্থান পরিত্যাগ করে। প্রায় দুইশত বৎসর হইল সুন্দরবন সম্পূর্ণরূপে অরণ্য হইয়াছে।” এই সুন্দরবন কলিকাতার কতক অংশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই সময় হইতে কলিকাতার আবার ভগ্নদশা হয়। কালীঘাটের সন্নিকটের অবস্থা কতক ভাল ছিল বটে, কিন্তু সুন্দরবনের নিকটে সামান্য গ্রামের আকারে ঐ সকল স্থান অবস্থিত ছিল মাত্র। ঐ স্থানে দুই চারি ঘর অল্পবিত্ত কৃষকের কুটির ব্যতীত অন্য কিছু প্রায়ই দৃষ্ট হইত না। খ্রীঃ ১৬৪৮ অব্দের পর পর্য্যন্তও কলিকাতার সেই দশা ছিল, পরে ইংরাজেরা এই স্থান স্বায়ত্ব করিবার পর হইতেই ইহার উন্নতির দশা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কলিকাতার উন্নতির কথা বলিবার আগে, যাঁহাদের হইতে এই উন্নতি, তাঁহাদের বঙ্গদেশে আগমনের কথা এইস্থানে সংক্ষেপে বলা উচিত।

[“মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একদল ইংরেজ বণিক ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন (১৬০০)। ১৬১১ অব্দে তাঁহাদিগের বাণিজ্যতরী পিপ্লী পর্য্যন্ত আইসে। যখন ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার ও আফজু খাঁ বেহারের সুবাদার ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা এক বৎসরের জন্য পাটনায় কুঠী করেন (১৬২০)। অনন্তর (১৬৩৪) তাঁহারা সম্রাটের নিকট পিপ্লীতে কুঠী করিবার আদেশ পান। একদা সাহজহান বাদসাহের একটী কন্যার কাপড়ে আগুণ লাগিয়া তাহার দেহ দগ্ধ হয়, বৌটন নামক একজন ইংরেজের চিকিৎসায় তাঁহার আরোগ্য লাভ ঘটে এবং সম্রাট পুরস্কার দিতে চাহিলে বৌটন প্রার্থনা করেন যে, ইংরেজেরা যেন বাঙ্গালায় নিষ্করে বাণিজ্য করিতে পারেন (১৬৩৪)। বাদসাহ এই মর্ম্মের আদেশ পত্র দিলে, বৌটন তৎসহ

এদেশে আসেন, এবং সুজার অন্তঃপুরবাসিনী কামিনী বিশেষের পীড়া শান্তি করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধা পান (১৬৩৯)। এই সময় ইংরেজেরা সুজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, হুগলী ও বালেশ্বরে কুঠী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইলেন এবং বিনা করে বাণিজ্য দ্রব্যজাত আমদানী রপ্তানী করিতে লাগিলেন।"] *

এই রূপে বঙ্গদেশে ইংরাজের ব্যবসায় বাণিজ্য একপ্রকার বেশ চলিতেছিল। কিন্তু এখনও তাঁহারা কলিকাতায় পদার্পণ করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়দের উৎপাতে, মুসলমান সুবাদারের ফৌজদার প্রভৃতির উৎপাতে দুই দশ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অনেক মধ্যবিত্ত লোক নিরাপদ হইবার জন্য কলিকাতার সন্নিহিত প্রদেশে—এমন কি সুন্দরবনের মধ্যেও আশ্রয় লইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

এই সময়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট। ইংরাজেরা খ্রীঃ ১৬৭৪ অব্দে তাঁহার নিকট হইতে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহাতে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার কর স্বরূপ তাঁহাদিগকে বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা দিতে হইবে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট থাকে, এই সময়ে হুগলী, পাটনা, ঢাকা ও কাশীমবাজারে ইংরাজদিগের কুঠী ছিল। কুঠী সমূহের শাসনকর্ত্তা হুগলীতে থাকিতেন। খ্রীঃ ১৬৮১ অব্দে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ হেজেস্ সাহেবকে বঙ্গদেশীয় কুঠী সমূহের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান।

খ্রীঃ ১৬৮২ অব্দে বেহারে একটি বিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহীরা ইংরাজদিগের কোন অনিষ্ট করে নাই, ইহাতে সুবাদার, ইংরাজেরা বিদ্রোহে লিপ্ত আছেন মনে করিয়া, সে বৎসর তাঁহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেন। খ্রীঃ ১৬৮৫ অব্দে ইংরাজেরা সুবাদার সায়েস্তা খাঁর নিকট ভাগীরথী মোহানায় একটি দুর্গ স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সুবাদার তাহাতে আরও অসন্তুষ্ট হন। ফল এই

* বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস ৪৯।৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

হইল, দুর্গ স্থাপনের অনুমতি দেওয়া দূরে থাকুক, সুবাদার ইংরাজদের নিকট নির্দ্দিষ্ট মাশুল বর্দ্ধিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন।

এই সময় জব চার্ণক * কুঠী সমূহের শাসনকর্ত্তা হইয়া হুগলীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সুবাদারের আদেশে ক্রুদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডে সম্বাদ পাঠাইলেন। খ্রীঃ ১৬৮৬ অব্দে কাপ্তেন নিকল্‌সন দশখানি রণতরী ও কতকগুলি সৈন্য লইয়া ভাগীরথীর মোহনায় আসিয়া উপস্থিত হন। কাপ্তেন সাহেবের উপর চট্টগ্রাম আক্রমণের আদেশ ছিল।

এই সময়ে ফৌজদারের কয়েকজন মুসলমান সিপাহীর সহিত ইংরাজ সৈনিকের বিবাদ হয়। তাহাতে ইংরাজেরা হুগলী নগরে গোলাবর্ষণ করেন। ফল এই হইল, সুবাদার পাটনা মালদহ, ঢাকা ও কাশীমবাজারের কুঠীগুলি অধিকার করিলেন এবং ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। চার্ণক বিপদ বুঝিয়া স্বীয় দলবল লইয়া সুতানুটীতে পলায়ন করিলেন (খ্রীঃ ১৬৮৬ অব্দ ২০এ ডিসেম্বর)। ইহাকেই বর্ত্তমান কলিকাতার, প্রথম সূত্রপাত বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এখানে আসিয়াও তাঁহারা নিরাপদ হইলেন না। সুবাদারের সৈন্য এখানেও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। চার্ণক তখন নিরুপায় হইয়া হিজ্‌লীতে পলায়ন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি ডিরেক্টরগণের নিকট সম্বাদ পাঠাইলেন। তিনমাসকাল তাঁহাকে এখানে থাকিতে হইয়াছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অনুচরগণের অর্দ্ধাধিক নষ্ট হয়। এইরূপ বিপদে পড়িয়া চার্ণক সুবাদারের সহিত সন্ধি করিয়া আবার সুতানুটীতে পুনরাগমন করেন। [শিঃ-পুঃ]

[ক্রমশঃ]

---

* **Mr. Job Charnock অথবা Jobus Charnock.**

সমালোচনা।

কানন-বালা—গার্হস্থ্য উপন্যাস। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

এই গার্হস্থ্য উপন্যাসখানিতে দুইটী বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত সংসার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। একটী স্বর্গের সুন্দর ছবি, অপরটী নরকের ঘোর বিকট চিত্র। আলোক আঁধার, পাপ পুণ্য, সৎ অসতের পরস্পর সংঘর্ষণে, যে কত বিভিন্ন আকারের পৈশাচিক কার্য্যের সূচনা হয়—তাহা ইহাতে বেশ দেখান হইয়াছে। স্থানে স্থানে বাক্যের বাহুল্য ও স্থানজ দোষ থাকিলেও মোটের উপর বলিতে গেলে, উপন্যাসখানি সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী বলা যাইতে পারে। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ মন্দ নহে, আকারানুসারে মূল্য বেশী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

মায়ালীলা—ধর্ম্ম ও নীতি-বিষয়ক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত রামদয়াল সেনগুপ্ত প্রণীত। মূল্য লিখিত নাই।

এরূপ উপন্যাস আমরা অনেক দিন পাঠ করি নাই। উপন্যাস-চ্ছলে ইহাতে যে সকল গূঢ় ধর্ম্মের মর্ম্মোদঘাটন করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বাস্তবিক একথার সত্যতা প্রতীয়মান হইবে। অসার নাটক নভেল প্লাবিত বঙ্গের কপালে এরূপ নভেল অতি অল্পই আছে। এ অবধি আমাদের ধারণা ছিল, নভেল পড়িলে লোকের মন হীন হয়, কিন্তু "মায়ালীলার" ন্যায় নভেল হস্তে পড়াতে সে ধারণা দূর হইয়াছে। আমরা আশা করি, পাঠক সম্প্রদায় ইহা একবার পাঠ করেন।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

২য় খণ্ড। } শ্রাবণ, ১৩০২ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

হাসি।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কিরণ বলিল,—"প্রমোদ।"

প্রমোদ কিছু অন্যমনস্ক হইয়াছিল, চমকিয়া বলিল,—"দিদি!"

"এখানে কেন?"

প্রমোদ অপ্রতিভ, লজ্জিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়,—কি করিবে, কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। কিরণ হাসি চাপিয়া বলিল,—"ও কে গেল প্রমোদ?" কিরণ গাছের আড়াল হইতে সব দেখিয়াছে, সব শুনিয়াছে, দেখিয়া শুনিয়াও জিজ্ঞাসা করিল,—"ও কে গেল প্রমোদ?"

প্রমোদ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—"কে—না—ও—হাসি।"

"রাধানাথের কন্যা?"

"হাঁ।"

"কেন এসেছিল?"

প্রমোদ কোন উত্তর করিল না—অবনত-মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

"এই রাত্রে বাগানে সোমত্ত মেয়ে তোমার কাছে কেন এসেছিল?"

প্রমোদ নীরব। কিরণ বলিল,—“প্রমোদ! তুমি ছেলে মানুষ, তোমার কি এ সব সাজে? ছিঃ!”

প্রমোদ এবার কথা কহিল, বলিল,—“দিদি! তোমার ভাই নিষ্কলঙ্ক। হাসি আমার ছেলেবেলার খেলুড়ী, অনেক দিনের পর দেখা কর্ত্তে এসেছিল।”

কিরণ সব জানিত, শুধু রং দেখিবার জন্য এরূপ করিতেছিল। এখন রং ছাড়িল, বলিল,—“ব’স ভাই! তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।”

প্রমোদ বসিল। কিরণ প্রমোদের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—“প্রমোদ! আমার একটা কথা রাখ্‌বি? আমি তোর দিদি হই।”

প্রমোদ বলিল,—“কি?”

“বিবাহ কর্‌বি? আমি বাবাকে বলেছি, তিনি সম্বন্ধ কর্‌ছেন।” এই অগ্রহায়ণ মাসে তোর বিবাহ।”

প্রমোদ বলিল,—“না।”

“কেন? আমি তোর বোন্, আমার একটা কথাও রাখ্‌বি না? তোকে বিয়ে কর্‌তে হ’বে। দেখ্‌ব, কেমন না করিস্।”

প্রমোদ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত যে, কিরণ তখন টিপি টিপি হাসিতেছিল। কিন্তু সে দেখিল না, ভাবিল, দিদি সত্যই বলিতেছে। তাহার বুকের মধ্যে ঠিক্ সেই সময়ে হাসির ভাসা ভাসা চোখ দু’টী ফুটিয়া উঠিল,—প্রমোদ কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—“দিদি! তোমার পায়ে পড়ি আমি অন্ত—আমি বিবাহ করিব না।”

কিরণ সব বুঝিল। কিরণের মুখ গম্ভীর হইল, হৃদয়ে ভ্রাতৃস্নেহ উছলিয়া উঠিল; অঞ্চলে প্রমোদের চক্ষু মুছাইয়া বলিল,—“প্রমোদ! একটা কথা বল্‌বি?”

“বল।”

“আগে আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর্ সত্যি বল্‌বি।”

প্রমোদ তাহাই করিল।

"তুই হাসিকে ভালবাসিস্। না?"

প্রমোদ মাথা হেঁট করিল।

"সে ছুঁড়িও তোকে ভালবাসে। না?"

প্রমোদ নীরব। কিরণ বুঝিল। খিল্ খিল্ করিয়া এক মুখ হাসিয়া ফেলিল, "হয়েছে, যা খুঁজ্‌ছিলুম্ তাই। বেশ কনে পেয়েছি. তোদের বিয়ে দেব। দেখিস্ ভাই! এই অগ্রহায়ণ মাসে হাসি তোর্।" এই বলিয়া কিরণ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল। প্রমোদ আত্মহারা। বহুক্ষণ বসিয়া কল্পিত সুখের কল্পনা করিতে লাগিল। কতক্ষণ বসিয়াছিল, সে জানে না; যখন উঠিল, তখন মাথার উপর অসংখ্য তারা হাসিতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রে সরদা রামপ্রসাদ বাবুকে কি বলিতেছিল। রামপ্রসাদ সারদার সেই সুন্দর মুখের কথাগুলা হাঁ করিয়া গিলিতেছিলেন।

সারদা বলিল,—"কি বল, আমি যা বল্‌ছি ঠিক নয়?"

রামপ্রসাদ। হুঁ।

"ও কি? উত্তর দাও না। হাঁ ক'রে থাকলে চল্‌বে না।"

রাম। ঠিক্।

"তবে শুন্‌বে না?"

"বটে?"

"আচ্ছা, আমি আর কথা ক'ব না।"

এবার রামপ্রসাদের চৈতন্য হইল, বলিলেন,—"বল বল, এবার আমি, শুন্‌ব।"

সারদা বলিল,—জানইত রাধানাথ ভিখিরী ছিল, ভিখিরীর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলে আমাদের আর মুখ দেখাবার ঠাঁই থাকবে না।"

"না না, রাধানাথ ভিখারী ছিল না, ভাগ্যদোষে দরিদ্র হয়েছিল। সে আমাদের স্বজাতি, আমার বাল্য বন্ধু; তাহারই শেষ অনুরোধে আমি হাসির সঙ্গে প্রমোদের বিবাহ দিচ্ছি।"

"দাও, তোমার ছেলে তুমি দাও, আমি বিষ খেয়ে মরি। লোকের কাছে আর মুখ দেখাব না; ছিঃ ছিঃ, আমার কপালে এই ছিল!"

এই বলিয়া রমণী-সুলভ ব্রহ্মাস্ত্র ক্রন্দনাঘাতে রামপ্রসাদকে আহত করিয়া শ্রীল শ্রীযুক্তা সারদাসুন্দরী দেবী স্বীয় নবনী-কোমল বিশালাঙ্গ কঠিন পরাগ-শয্যায় ঢালিয়া দিলেন। রামপ্রসাদ বাবু অস্থির হইলেন। প্যান্‌প্যানানী, ঘ্যান্‌ঘ্যানানী, ফোঁস্‌ফোঁসানী সপ্‌সপানী প্রভৃতি বিষাক্ত অস্ত্রের সহিত রামপ্রসাদের শুনানী, মানানী, বিনয়, অনুনয় প্রভৃতি আত্মরক্ষোপযোগী অস্ত্রসমূহ নিঃশেষিত হইবার পর সারদাসুন্দরী একটু হাসিলেন, যেন বৃষ্টির উপর বিদ্যুৎ নল্ পাইল!

রামপ্রসাদ বলিলেন,—"কথা ক'বে না?"

সারদা কথা কহিল। একটু হেলিয়া, একটু দুলিয়া, মাথার কাপড় একটু টানিয়া, ঠোঁট একটু ফুলাইয়া বলিল,—"আগে আমার কথা শুন্‌বে বল।"

"সব শুন্‌ব।"

"বল, প্রমোদের সঙ্গে হাসির বিবাহ দেবে না।"

"ভাল, কিন্তু—"

"আবার—কিন্তু!"

"না। বল্‌ছিলাম কি, রাধানাথ মৃত্যুকালে আমার উপর কন্যার বিবাহের ভার দিয়া যায়।"

"তা, বিবাহ দাও না কেন।"

"আর পাত্র কোথায়?"

"কেন—তারাপদ?"

তারাপদ সারদার ভাইপো; কুৎসিত, কুচরিত্র। সারদা জানিত তাহার বিবাহ হওয়া দুষ্কর। কোন্ পিতা কন্যাকে অগাধ-সলিলে

ভাসাইয়া দিবে? সারদা দেখিল, হাসির পিতা নাই। মাতা আছে, কিন্তু মাতা দরিদ্রা; তাহার অন্নের সংস্থান হইলেই যথেষ্ট। তাহাকে "শ্বেত গোলক" দেখাইলে, বা কন্যাকে হীরার গহনা দিলে সে কেন না এ সম্বন্ধে সম্মত হইবে? সারদা জানিত, প্রমোদ হাসিকে চাহে, হাসিও প্রমোদকে চাহে। কিন্তু তাহার সুন্দর মুখের সাহায্যে সে যে শীঘ্রই এই প্রবল কণ্টককে পথ হইতে অপসারিত করিতে পারিবে, তাহাতে তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল। তাহা কার্য্যেও পরিণত হইল। রামপ্রসাদ বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু যুবতী ভার্য্যার নিকট বৃদ্ধ স্বামীর সচরাচর যে দশা হয়, রামপ্রসাদেরও তাহাই হইয়াছিল। রামপ্রসাদ স্ত্রৈণ ছিলেন। সারদার ভ্রমরাক্ষের কৃষ্ণোজ্জ্বল কটাক্ষ-বাণে বৃদ্ধ বাণ-বিদ্ধ মৃগের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, সারদারও কার্য্য সিদ্ধি হইল। মনে মনে বলিল, "আর যায় কোথা?" প্রকাশ্যে বলিল,—"তুমি এখন এ কথা কাউকেও ব'ল না—সকলে যেন জানে যে, প্রমোদের সঙ্গেই হাসির বিয়ে হ'বে, আর—" তার পর কথা কাণে কাণে হইল। বহুক্ষণ পরে সারদা বলিল,—"কেমন রাজি?"

রামপ্রসাদ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"ভাল।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সকালে কিরণ হাসির কুটীরে গেল। প্রসন্নময়ী স্নানে গিয়াছিলেন। হাসি একলাটী বসিয়া কি ভাবিতেছিল, সে রোজই এরূপ ভাবে।

কিরণ বলিল,—হ্যাঁলা হাসি, ঠাসি, ধাসি!

হাসি চমকিত হইল, দেখিল, কিরণ; অমনি শশব্যস্তে উঠিয়া ঢিপ করিয়া একটী প্রণাম করিল। কিরণ বড় দুষ্ট, বলিল,—"বলি হ্যাঁলা, আমার ভাইটী না হয় দুদিনের জন্য বাড়ীতেই এসেছে, তা' তোর কি অমন করে বাগানে গিয়ে পুকুর ধারে তার মন ভোলাতে হয়? সোমত্ত মাগি, লজ্জা কল্লে না? লোক শুন্‌লে কি বল্‌বে? ওমা কি ঘেন্না!!"

হাসির আপাদ মস্তক বেত্রলতার ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল! সেই কথাগুলি সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের মাঝে কতই তরঙ্গ তুলিল; তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয় চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল, হাসি কাঁদিয়া ফেলিল। কিরণ এবার হাসিল না, কাঁদিল। বলিল,—"আমি সব জানি বোন্, কাঁদিস্‌নে; আমি এতক্ষণ তামাসা কর্‌ছিনু। তুই প্রমোদকে ভালবাসিস্ আমি জানি, তাই তোকে একটা সুখবর দিতে এনু। আগে খবরটা শোনালে পাছে হঠাৎ আহ্লাদে তুই মূর্চ্ছা যাস্, তাই এই রঙ্গ কর্‌লুম। অগ্রহায়ণ মাসে তুই আমার ভাজ হ'বি।"

এই অসম্ভব কথটা সহসা বিশ্বাস করিতে দুঃখিনীর যেন সাহস হইল না; সে বিস্ফারিত নেত্রে কিরণের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিরণ হাসির চিবুকটী ধরিয়া সেই ফুল্ল অধরে—সেই অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ-কোরকে একটী চুম্বন করিল। এত আদর যেন দুঃখিনীর সহিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল।

কিরণ বলিল,—"সত্যি বল্‌ছি, এই অগ্রহায়ণ মাসে তোর বিয়ে। আমি কাল শ্বশুর বাড়ী যাব। অগ্রহায়ণ মাসে এসে তোকে ভাজ বল্‌ব। দেখিস্, ঠাকুরঝিকে ভুলিস্‌নে। এখন আসি।"

এই বলিয়া কিরণ চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রমোদের ছুটি ফুরাইয়া গেল। কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বে হাসির সহিত দেখা হইল; উভয়ের মনে যাহা আসিল, তাহাই করিল। গাড়ীতে তুলিয়া দিবার সময়ে রামপ্রসাদ বলিলেন,—"বাবা, ২৭শে অগ্রহায়ণ তোমার বিবাহ, তুমি ২৩শে এখানে আসিবে।" পুত্র প্রণাম করিল, পিতা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

প্রমোদ চলিয়া গেল। আকাশে কাক ডাকিল—কা কা, পথের ধারে ঝাউগাছ ডাকিল—সাঁই সাঁই, প্রমোদের মন করিল—হু হু!!

কিরণ পূর্ব্বেই গিয়াছিল; সুতরাং এখন বাড়ীর মালিক তারা, গোপাল, কৈলাস, হরে, নশে, শঙ্করা, মদো। তাহারাই বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা, হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। মালিকে বলে, "ফুল আন্"—চাকরকে বলে, "তামাক দে"—ঝিকে বলে, "এই মাগি, ঘর ঝাঁট্ দে।" কিন্তু ঝি জাতি ছাড়িবার জীব নহে, তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়—"মর্, নিজের বাড়ীতে নিত্যিই হরিবাসর কি না, এখানে এসে অন্ন দেখে ক্ষেপে গেছে।" আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, গদারমাকে অবতার-বৃন্দ বিলক্ষণ ভয় করিত।

আপদ বালাই বিদায় হইল, সারদার আল্‌গা উপায় আঁট হইল। রামপ্রসাদ বাবু সারদার "কলের পুতুল," যে দিকে চাপ দেন, সে দিকেই নাচেন। তা ছাড়া সারদার "ধামা-ধরা"ও অনেক।

সারদা একদিন প্রসন্নময়ী ও হাসিকে নিমন্ত্রণ করিল। নিজের গহনাগুলি স্বহস্তে হাসিকে পরাইল, দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলিল; বলিল,—"আহা! এমন সুন্দর গায়ে উঠ্‌লো না তো গহনা হয়েছিল কিসের জন্যে? তা, বাছা, আমার প্রমোদের বৌ হ'লে কি আমি এম্‌নিটী রাখ্‌ব? সোণায় মুড়ে দেব।"

প্রসন্নময়ী গলিয়া জল হইয়া গেলেন। হাসির মনে সুখের ঢেউ খেলিল; সে ভাবিল, প্রমোদের সহিতই তাহার বিবাহ হইবে। কিন্তু হায়! সর্পিনীর তীব্র হলাহলের কুটীল শক্তি সরলা বালিকা কি বুঝিবে?

সারদা প্রমোদের নামে হাসিকে আশ্বস্ত করিয়া বিবাহ-রাত্রে তারাপদের সহিত তাহার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাই এত আদর। আর রামপ্রসাদ? সে রমণীর দাস; তাহার দ্বিতীয় মত নাই।

সেই দিন হইতে হাসি সেখানেই রহিল, মাতা কন্যার সুখেই সুখী, তাঁহার মুখে অনেকদিনের পরে আবার হাসি ফুটিল। হাসি দেখিল, সম্মুখেই জ্যোৎস্নালোকিত কুসুম-নিকেতন, কিন্তু পশ্চাতেই যে ঘন-ঘটাচ্ছন্ন অমানিশার দ্রুত-সমাগম, তাহা অভাগী দেখিয়াও দেখিল না। [ক্রমশঃ।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রমোদ কিরণের পত্র পাইল। কিরণ লিখিয়াছে—"ভাই! আজ ২০শে অগ্রহায়ণ। বাবা তোমার বিবাহের কি করিতেছেন, জানি না। আমাকে লইয়া যাইবার নাম নাই—আমার বড় সন্দেহ হইতেছে। বাবা স্ত্রীর অধীন। আমি শুনিয়াছি, বাবা তাহার পরামর্শে হাসির সঙ্গে তারাপদর বিবাহ দিবেন। আমার গা কাঁপিতেছে, তুমি শীঘ্র বাড়ী যাও। ইতি, তোমার দিদি। কাটোয়া, ১২——সাল।"

প্রমোদ পত্র পড়িল—আবার পড়িল, ভাল বুঝিতে পারিল না, সব যেন একটা রহস্য বলিয়া বোধ হইল। আবার পড়িল, তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, আর দাঁড়াইতে পারিল না—বিছানায় শুইয়া পড়িল। একবার ভাবিল, মিথ্যা কথা—আবার ভাবিল, না, দিদি লিখিয়াছে।

প্রমোদ উঠিল। তাড়াতাড়ি পিতাকে পত্র লিখিল। তিন দিন অপেক্ষা করিল, কোন উত্তর আসিল না। প্রমোদ তখন বড় উতলা হইল, সেই দিনই কালিকাপুর যাত্রা করিল। কালিকাপুর পর্য্যন্ত রেল নাই, স্থলপথে পাছে বিলম্ব হয়, এই জন্য জলপথে যাত্রা করিল। পর দিন কাল্‌না। সে দিন ২৬শে অগ্রহায়ণ। প্রমোদ মাঝিকে বলিল,—"কাল সন্ধ্যার আগে পৌছিতে পারিলে পুরস্কার পাইবি।"

মাঝি বলিল,—তা' আর পার্‌বো না বাবু? আমার ফুফির চাচা মস্ত মাঝি ছিল।"

পরদিন নবদ্বীপ। মাঝি বলিল,—"বাবু! একবার কাছি বাঁধ্‌ব?" প্রমোদ ভ্রু-কুঞ্চিত করিল। মাঝি পাল তুলিল, নৌকা তীরবেগে চলিল। দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপের মন্দিরশ্রেণী আকাশের ধূসর প্রান্তে মিলাইয়া গেল।

অগ্রহায়ণ মাস—মাঝে মাঝে চড়া পড়িয়াছে, নৌকা বাঁচাইয়া যাইতে অনেক সময় নষ্ট হইল। বৈকাল বেলা উতরাইয়া গেল, সন্ধ্যা আসিল—কালিকাপুর এখনও দুই ক্রোশ। প্রমোদ অস্থির হইল, বলিল,—"আর কত দূর?" মাঝি বলিল,—"দুই ক্রোশ।"

প্রমোদ ছইয়ের ভিতর শুইয়া পড়িল।

সে দিন তৃতীয়া। আকাশের পশ্চিমকোণে তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্র উঠিয়াছে। ছোট ছোট ঢেউগুলির উপর চাঁদের কিরণ চিক্ চিক্ করিতেছে—নাচিতেছে, খেলিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, ডুবিতেছে। প্রমোদের সে দিকে মন নাই; প্রমোদের মন বোধ হয় কালিকা-পুরে, সেই নিভৃত কুটীরে—যেখানে সেই হাসি-মাখা ফুলটী ফুটিয়াছে।

কালিকাপুরও আসিল—প্রমোদের মন মেঘের ন্যায় শূন্যে দুলিতে লাগিল। মাঝি বলিল,—"বাবু! নামুন।"

প্রমোদ নামিল। তখনও তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। ধীরে ধীরে স্বীয় অট্টালিকাভিমুখে চলিল—ধীরে ধীরে—কারণ তখন পা কাঁপিতে-ছিল। দুর হইতে দেখিল, অট্টালিকার নূতন সংস্কার হইয়াছে—প্রত্যেক কক্ষ দীপমালায় সজ্জিত উজ্জ্বল দীপালোকে শ্বেত অট্টালিকা ধপ্ ধপ্ করিতেছে। প্রমোদ বসিয়া পড়িল।

পথ দিয়া দুইজন লোক যাইতেছিল, একজন বলিল,—"এমন ঘটার বিয়ে কখনও দেখি নাই।"

প্রমোদ কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে—কা'র?"

প্রমোদের মুখে তখন গাছের ছায়া পড়িয়াছিল, তাহারা চিনিতে পারিল না, বলিল,—"তারাপদ বাবুর।"

তারাপদ এখন বাবু হইয়াছে।

প্রমোদ বলিল,—"পাত্রী কোথাকার?"

"এই কালিকাপুরের। রাধানাথ দত্তের কন্যা।"

প্রমোদের চক্ষে সহসা দীপালোক নিবিয়া গেল, জাহ্নবী-কল্লোল ডুবিয়া গেল, আকাশ সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া তাহার মস্তকে পড়িল!!! প্রমোদ এক নিশ্বাসে আসিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইল, নৌকায় উঠিয়া উন্মত্তের ন্যায় তীব্র কণ্ঠে বলিল,—"নৌকা খোল, নৌকা খোল, ওপারে, ওপারে—" তাহারা প্রমোদের মুখ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। বিনা বাক্যব্যয়ে ও-পারে নৌকা লাগাইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পর দিন উঠিয়া মাঝিরা দেখিল—প্রমোদ নৌকায় নাই।

সেই রাত্রে হাসির হাসি ফুরাইল।

সে ভাবিয়াছিল প্রমোদই তাহার স্বামী হইবে, তাই সারাদিন হাসিয়া বেড়াইল। বৈকাল বেলা সারদাকে বলিল,—"মা! দিদি কোথায়?" মনে মনে বলিল, "প্রমোদ কোথায়?"

সারদা বুঝিল, বলিল,—"সে প্রমোদের সঙ্গে ও-বাড়ীতে আছে। বিয়ের আগে তো দেখা হতে নাই, তাই প্রমোদ ও-বাড়ীতে আছে।"

সরলা তাহাই বুঝিল। ভাবিল, 'প্রমোদ ও বাড়ীতে। কাল প্রমোদ আমার, প্রমোদ আমার, প্রমোদ আমার—'আমার প্রমোদ!' একবার এদিক ওদিক চাহিল। সেই সময়ে তাহার মনে সেই জ্যোৎস্না-রাত্রির কথা মনে পড়িল, জিব কাটিয়া বলিল,—"ছিঃ ছিঃ! আমি কি বেহায়া?"

সন্ধ্যা হইল। বিবাহ-লগ্ন আসিল, সারদা বলিল,—"চল মা।" হাসি চলিল। তাহার মনে তখন কত কি হইতেছিল!

হাসি বলিল,—"মা কোথায়?"

সা। ও-ঘরে।

হা। কেন?

সা। তোমার কোষ্ঠিতে বিবাহ-কালে স্বামী ও মাতার মুখ দেখা নিষেধ। মুখ দেখিলে তাহাদের অনিষ্ট হইবে।

হাসির গা কাঁপিল, কিছু বলিল না। সম্প্রদান স্থানে আসিয়া সারদা বলিল,—"মা! তোমার একবার চোখ্ বাঁধ্‌তে হ'বে। চারি চোক্ষে মিলনের আগে স্বামী দেখ্‌তে বারণ, স্বামীর অমঙ্গল হ'বে।"

প্রমোদের অনিষ্ট! হাসি কোন আপত্তি করিল না। চোখ্ বাঁধা হইল। যথা সময়ে সম্প্রদান হইয়া গেল; কে করিল, কাহাকে করিল, হাসি কিছুই দেখিল না। সারদা মাঝে মাঝে "প্রমোদ" "প্রমোদ" করিতে লাগিল, হাসি ভাবিল প্রমোদ। সাত পাক

ঘুরান হইল; সারদা ভাবিল "আর কি?" মাথায় কাপড় ঢাকিয়া বলিল,—"মা! চোখ্ খোল।"

হাসির হৃদয় দুলিয়া উঠিল। ধীরে—ধীরে—ধীরে—পাছে সহসা খুলিলে এ সুখে বঞ্চিত হয়—ধীরে—ধীরে নয়ন উন্মীলন করিল, দেখিল——অমনি অস্ফুট চীৎকার করিয়া ছিন্ন বল্লরীর ন্যায় ভূমিশায়ী হইল! "কি হইল" "কি হইল" বলিয়া সকলে সেই দিকে ছুটিল, দেখিল হাসির সংজ্ঞা নাই!!

[ক্রমশঃ]

শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

বুঝিয়াছি।

১

বুঝিয়াছি মরুভূমে মরীচিকা সম,
আমার এ আশা হায়! হ'বে না পূরণ!
পিপাসা-আকুল বুকে,
ছুটে যা'ব সেই মুখে,
দূরে দূরে চিরদিন, পা'ব না কখন!
ট্যাণ্টেলাস্ মত শুষ্ক-কণ্ঠ আজনম!

২

বুঝিয়াছি মরুভূমে মরীচিকা সম,
আমার এ আশা হায়! হ'বে না পূরণ!
অভাগ্য লিয়ড মত,
চোখে অশ্রু, বুকে ক্ষত,
সংসারের দূরে দূরে, হায়! আমরণ
অপরাধী মত হ'বে করিতে ভ্রমণ

৩

বুঝিয়াছি মরুভূমে মরীচিকা সম,
আমার এ আশা হায়! হ'বে না পূরণ!
বুঝিয়াছি শশধর!
তোমার ও স্নিগ্ধকর,
আমারি কপাল দোষে দীপ্ত হুতাশন,
তিল তিল করি' দগ্ধ করিবে জীবন!

৪

বুঝিয়াছি মরুভূমে মরীচিকা সম,
আমার এ আশা হায়! হ'বে না পূরণ!
খেয়েছি যে হলাহল,
নাশিবে জীবন বল,
পলে পলে মৃত্যু গণি' অবসন্ন মন;
কত করি তবু কিন্তু হ'বে না মরণ!

৫

বুঝিয়াছি এ সাধনা এ ভাবনা মম,
নিষ্ফল—জীবনে তা'র নাই কাজ কোন!
বুঝেছি—মন্দার ফুল,
আমারি হ'য়েছে ভুল,
অমরের হৃদি-হার কণ্ঠের ভূষণ
ধরার মানব—তা'র দুরাশা—স্বপন!

৬

বুঝিয়াছি এ জীবনে নাই "বিস্মরণ"!
নিরত সহিতে হ'বে স্মৃতির দংশন!
পাষাণ চাপিয়া বক্ষে,
অশ্রু-জল রোধি' চক্ষে,
ভালবাসা ভোলা যায়? মূঢ় সেইজন!
প্রবল স্রোতের মুখে বালীর বন্ধন!

৭

বুঝিয়াছি চিরদগ্ধ শ্মাশন মতন
বুকে শত হাহাকার চিতা সুভীষণ—
হিংসা-দ্বেষ বিষ-ভরা,
হৃদি-শূন্য এই ধরা,
ইহার(ই) বক্ষেতে হ'বে করিতে ভ্রমণ!
এত সহি সে বাসনা হবেনা পূরণ!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লীগ্রামে।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

কোন লেখক বলেন,—প্রকৃতির শোভা দেখ্‌তে চাও, তবে এই শরতকালে দেখ; মাঠের শোভা দেখ্‌তে চাও, এই শরতকালে দেখ; আকাশের শোভা দেখ্‌তে চাও, এই শরতকালে দেখ; আর অন্তঃপুরের শোভা দেখ্‌তে চাও, তাও এই শরতকালে দেখ! আগে আগে কথাটায় আমার বড় হাসি পেত; ভাবতাম, এমন পাগলও এ দুনিয়ায় থাকে গা? কিন্তু এখন সে পাগলের উপর আমার যথার্থ বড় ভক্তি হয়—আর ভাবি, লোকে যে এদের পাগল বলে, তা এরা পাগল কি? যারা পাগল বলে, তারাই পাগল, তার নিশ্চয় কি? না বুঝে অনেকেই অনেককে পাগল বলিয়া থাকে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এত বড় দুনিয়াটাই যে পাগলের! তার কখন কিরূপ, কোথায় থাকে, কি করে না করে, কিছুই বুঝিবার যো নাই। সে পাগলের পাগলামী বুঝ্‌তে গেলেই পাগল হতে হয়। নহিলে প্রাণে প্রাণে মেশে না—ভাবটাও তত হয় না! এই যে সন্ধ্যার কাণ্ডটা, এটা কি কম পাগলামী? এ দেখে শুনে পাগল না হয়ে কি থাকা যায়? দেখ, পাগলের এই পাগলামীর মধ্যে কত মজা! দেখে শুনে হাসিও পায়—ভাবনাও হয়! তুমি ভাল

মানুষ, কত আদর করে নূতন বাসা বেঁধেছ, যৌবনের তেজে আপনাকে মধ্যাহ্ন-কালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রখর প্রভাবশালী করিয়া তুলিয়াছ, কিন্তু যখন পরমায়ুর শেষে মরণ আঁধার ঘুনিয়ে আস্‌বে, তখন তোমার ও জীবনসূর্য্য কোথায় থাক্‌বে বাপু? পাগল কি তোমার কাণে কাণে বলে দেবে যে, বাপু! তোমার এই এই হবে! তা নয়, তার ঐ পাগলামীর মধ্যে তার কার্য্য দেখিয়া তোমায় বুঝিয়া লইতে হইবে—সাবধান হইতে হইবে। পাগলামী বলিয়া হাসিয়া উড়াও, বেশ কথা বাপু! অজর অমর হ'তে পার ভালই, কিন্তু শেষে যেন না কাঁদিতে হয়। আমার ত এই রকম মাঠে মাঠে বেড়িয়ে বেড়িয়ে পাগ্‌লামী আজ কাল কিছু বেশী বেশী বোধ হয়। রবি ঠাকুর ডুব্‌লেন, আবার ভাবনা হ'ল, ক'ল্লাম কি—করিই বা কি? আবার ভাবিলাম, দূর হোক, অত ভাবনা কেন? এখনও অনেক সময় আছে। হা অদৃষ্ট! তখনই খিল্ খিল্ করে হাসিতে আমার চমক ভাঙ্গিল। ভাবিলাম, লোকটা কে হে আমায় ঠাট্টা করে! আমার এই ভরা যৌবন দুনিয়া-খানাকে সরার মত ভাবিয়া মাটিতে পা ফেলিতে চাহি না, পাছে ভাঙ্গিয়া যায়। আমার দেহের শক্তির ইয়ত্তা নাই। তবে কোন সাহসে কে হে তুমি আমায় ঠাট্টা কর? চাহিয়া দেখি, সম্মুখে একটা সামান্য রজত রেখার ন্যায় ক্ষুদ্র নদী নাচিতে নাচিতে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। আমাকে তাহার পানে চাহিতে দেখিয়া সে যেন আরো খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি দেখিলাম, এর সঙ্গে বড় জোর যবরদস্তী বা রাগ অভিমান খাটিবে না। তখন ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া বলিলাম, কেগা তুমি! আমায় ঠাট্টা কর কেন? রঙ্গিণী তরঙ্গিণী তখন বিলাসিনীর মত একটু চলিয়া দুলিয়া নাচিয়া তরঙ্গ ছুটাইল। ভাবিল, লোকটা তবে নেহাতই গায়ে আসিয়া পড়িল, অহঙ্কারে অঙ্গটা উছলিয়া উঠিল। একটু পরে, বামা-বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আ'সব না ত কি? তোমার যেমন রকম!

আমি। কি রকম গা বাছা?

তরঙ্গিণী। আ মরেঁ যাই, ভাববার একবার ঢং দেখেছ?

আ। আমি ত তোমার ঢং দেখিয়াই আকুল। তুমি আবার আমার ভাববার কি ঢং দেখ্‌লে। ঢং নিয়েই আছ কেবল, লোকের ঢং দেখেই বেড়াও। ভাব আবার কি?

ত। আহা হা! এদিকে নিজে যে সং তা আর লোকে তোমার ঢং দেখ্‌বে না কেন? মাথা মুণ্ডু কি ভাবছিলে? হাসিও পায়, দুঃখও হয়, পোড়া তোমাদের মানুষের মত হাবা ত আর আমি কোথাও দেখিনি!

আ। কেন গা অত লম্বা লম্বা কথা? সামান্য একটা নদী, যে সে অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে, তোমার আবার অত কেন? কি ভাবছিলাম, খুলেই বল না কেন?

ত। বলছ বটে, কিন্তু একটু ভেবে বল্লে আর ও কথাটা বল্‌তে পারতে না। তা তোমার কি দোষ। মানুষের গতিকিই অই। তবে নেহাত দু একটা ভাল হয় বটে, সে সমুদ্রের বারি-বিন্দুবৎ। তা যে যাই হোক, তুমি এখন থেকে একটু মানুষের মত হও, তা হ'লে তোমারও ভাল, আমারও ভাল। ভাল হলেই ভিতরের চোখটা খুলে যাবে; তা হ'লে বুঝবে যে, আমাকে অনায়াসে পার হওয়া যার তার কর্ম্ম নয় হে!

আ। না, তোমাকে পারা গেল না। একটা কথায় হাজারটা কথা শুনিয়ে দিলে, কিন্তু এমনি চাপা যে, কাজের কথাটা কেবল বল্লে না। আমার ভাবনাটা কি ভেঙ্গেই বল না?

ত। তোমাদের মানুষের ঐ কেমন এক রকম জিদ্‌টুকু খুব আছে, কিন্তু বলে কি হবে, ফল কিছু হবে বল্‌তে পার? তোমাদের দেখিয়ে দেব—বুঝিয়ে দেব, তবু বল্‌বে কই! মেয়েরা ঠিক বলে, হাতে দই—পাতে দই তবু বলে কই কই?

আ। তুমিও ত তাদেরই একজন, তাদের কাছে হার মানি আর না মানি সে পরের কথা, কিন্তু তোমার কাছে আজ হার মান্‌লাম; এখন যা' বল্‌বার হয় খুলে বল, নয় আমি চল্‌লাম।

ত। সেটা বলে জানান বাহুল্য, আমাদের হাতে পড়্‌লে নাকানি চোবানি না খাওয়াইয়া কি আর তোমাদের ছেড়ে দিই। কিন্তু তাতেও ত তোমাদের চৈতন্য হয় না। বল্‌বার সময় কত কথাই না বল। রমণী বচনে সুধা সুধা নয় সে—বিষের বাটী; বল পান কর—ছট ফট্‌ কর—প্রাণ যায় যায়—ইহকাল পরকাল একেবারে পুড়িয়া খাও, কিন্তু অভিমানের একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গের বেগ ত সহ্য করিতে পার না! তোমার যত বিবেক বৈরাগ্য সেই এক মুখ নাড়ায়, নয় ত এক ফোঁটা চখের জলে কোথায় ভাসিয়া যায়—নিজেও সেই জলে ডুবিয়া যাও, তখন কেবা কোথায়। তাই ভাবি আর হাসি, যখন অসহ্য হয় একটু কাঁদি, কিন্তু আমার কাঁদায় কি হবে? যার দায় সে না কাঁদ্‌লে কি হবে? তাই বলি, ও সব মিছে বলা। কেন আর খেপাম কর, এসেছ বেড়াতে, সন্ধ্যার একটু হাওয়া খেয়ে যাও, উপরটা তো ঠাণ্ডা হোক, ভিতর ঠাণ্ডা আর তোমাদের কটা মানুষের বল দেখি? শুধু হাওয়ায় না হয় একটু অবগাহন কর, গায়ের ধূলোগুলো ধুয়ে ফেল, লোমকূপগুলো সাফ কর, নইলে আবার জ্বর হবে, নাইলে দেখ্‌তেও বেশ হবে তবে, ভিতরের যে ময়লা সেগুলো থাক, তা আর ধুয়ে কাজ নাই। কেন না, পরের আবার মন ভুলাতে হবে ত? মানুষের মন বৈত নয়, বাহ্যিক চাকচিক্যেই বেশী ভুলিয়া থাকে, আর এই নূতন সংসারটা পেতেছ, সহজে কি ছাড়া যায়, তায় আবার ভরা যৌবন?

আ। ও হো! বুঝিছি বুঝিছি, আর বলতে হবে না। তোমার ঠাট্টা বুঝিছি গো! ও হরি! তুমি তবে বড় সাধারণ নও। এই নিয়ে এত?

ত। বুঝলে ভালই হল, আর একটু বুঝলে ও নিয়ে যে কত হয় তা বুঝতে পার্‌বে। যা হোক্‌, আপনা হ'তে যে বুঝতে পার্‌লে সেই ভাল!

আ। তা আচ্ছা, কিন্তু আমি অন্যায়ই বা কি ভাবছিলাম?

ত। তাত বলিছি—তোমাদের মানুষের মনটা জলের মত, তাহাতে দাগ কাট দাগ পড়্‌বে, কিন্তু তখনি আবার মিলিয়ে যাবে?

আ। ভাল—মানিলাম, কিন্তু আমার ভাবনাগুলো কি ঠিক নয়? সত্য সত্যই কি সময় নাই, না ছাই পাঁস এমন ভরা যৌবনটা লইয়া কি একটু অহঙ্কার কর্‌তে পার্‌ব না? তুমি বল কি? আমি ত অবাক হলাম। ছি ছি! তোমার মত প্রৌঢ়াবস্থা ত আর সকলের হয় নি! শরত এসেছে প্রৌঢ়া হয়েছ, বর্ষায় তোমার জ্বালায় সকলে একেবারে জ্বালাতন পোড়াতন হয়েছিল, তোমার যৌবন জোয়ারের রেনো জলে কত লোকের যে সর্ব্বনাশ হয়েছে, তার আর ঠিক নাই; ভরা-যৌবনের সময় ত আর দিগ্বিদিক, স্থান অস্থান, পাত্রাপাত্র কিছু বাচ-বিচার ছিলনা। এখন ত তপস্বিনী হবেই!!

ত। বঁধু হে, এ দুনিয়ার খবরটার কিছু রাখ কি? তোমার মানুষের গতিক বটে। অশক্ত হলেই সাধু হন, রোগী হলেই দেবতা-ভক্ত হন, মেয়েগুলো বুড়ী হলেই তপস্বিনী হয়ে পড়েন, বয়সকালে আর কিছু জ্ঞান থাকেনা। স্থান সময় এবং মনোমত লোক পাইলে কত কাণ্ডই যে কর্‌তে পারেন তা বলা যায় না। আরে মর্ বয়স আর কার কোন দিন ছিল না লো? তা ভাই, এ সব খবর রাখ কি? না, তা রাখ্‌বে কেন? ও যে দেবাঃ ন জানান্তি কুতো মনুষ্য! কিন্তু আমার বেলায় খুব মজবুত দেখছি! আমার যৌবন গিয়াছে তার বেশ গিয়াছে কিন্তু স্মৃতি যায় নাই তাই কেবল মনে হয় আর দুঃখ হয় তাইত তোমায় ঠাট্টা কচ্ছিলাম। বলি, ভরা যৌবন ভরা যৌবন কর্‌ছ, কিন্তু ক'দিনের জন্য? সূর্য্যি বুড়োর দুর্গতি দেখেও কি তোমার জ্ঞান হল না? হয়েছিলো সে সেই জলের দাগের মত দু'দণ্ডের জন্য, নইলে কি ভাব এখনও সময় আছে! সময় আছে সত্য, যদি আপনার কাজটা বাগিয়ে নিতে পার, নহিলে সবই গেছে হে রসরাজ! আমি ঠেকে শিখেছি বলেই তোমাকে এত করে বলছি। ভরা যৌবনটা বটে, জীবনের চেয়ে যৌবনটা বড় আরামের বটে, কিন্তু সুজনের সঙ্গে সেই যৌবনটা যাপন কর না কেন? জুয়াচোর ব্যবসাদারের হাতে সেটা বিলিয়ে দাও কেন? শেষে যে পথের কাঙ্গাল হতে হবে, কেও ফিরেও চাইবেনা, তখনকার উপায়টা কি হবে—ওহে ও গুণধর?

তোমার গুণের বালাই লইয়া মরি! যেমন রূপ তেমনই গুণ না হলে কি সাজে? দেখ, বুদ্ধির জোরে শেষে যেন উদরের পরিধিটা নাসিকার অগ্রভাগের সম সূত্রান্তর না হইয়া পড়ে? তখন আবার যোড়া মেলা ভার হবে!

আ। আ মর! এমন পাড়াকুঁদুলীর হাতেও শেষে পড়লুম গা! আচ্ছা! রসিকতা দেখে যে আর বাঁচিনে! বল্‌চ ভালকথা, তত্ত্বজ্ঞানের কথা, তার সঙ্গে আবার ন্যাকামো! বঁধুহে! ভাই হে! একেবারে গলাগলি ঢলাঢলি! তোমার যা বলবার থাকে, সাদাসিদে বলে যাও। আমার য়া আছে, তাই আমার ঢের, আর আমার কারো বঁধু হইয়া কাজ নাই, আমার পিঠ অত শক্ত নয়, কাণগুলো রাখা চাই, লোক-সমাজে যেতে আস্‌তে হবে তো। তোমার সঙ্গে আমার অত সম্পর্কই বা কিসের?

ত। বুঝিয়ে দেব তোমায় আমায় কত নিকট সম্বন্ধ। না, আগে তোমার একটু মনটা ঠিক করে দিই।

আ। না, আগে সম্বন্ধটা স্থির হোক, তার পর মন ঠিক হবে!

ত। বুঝলাম, তুমি রসিক বটে হে, মিষ্টালাপীও বটে, কিন্তু আমি বলি, কাজের কথাগুলো আগে হোক। আমি কে, কত বড়, সেটা না জান্‌লে কি অমনি অজ্ঞাতকুলশীলে কখন সম্বন্ধ হয়?

আ। না তুমি বড় পাকাপাকি করে তুল্‌লে, শেষে আমার ঘরে ফেরা দায় হবে।

ত। অই ত, অই খানেই যত গোল! ঘর ঘর করে মর্‌বে তবে আর তোমায় বোঝাব কি মাথা মুণ্ডু! বলি, প্রেমটা কি এতই সঙ্কীর্ণ যে, তাতে একজন বই আর দু-জনের স্থান হয় না? তুমি জান কি—এই বিশাল বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থের সহিত তুমি কি অটুট প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ? কার কাছে যাবে, কার মন রাখ্‌বে? একটাকে মনে স্থান দাও—হৃদয়টা অত ক্ষুদ্র হলে নিজেই জলে পুড়ে মরবে। আর এই প্রকাণ্ড বিশ্বটাকে ভাল-বাসিতে শেখ, তা হলেই সুখ পাবে। এক জনের সঙ্গে যদি

তোমার ভালবাসার সীমা হয়, তোমার সে কি ভালবাসা না ব্যবসাদারী? প্রকৃত ভালবাসার কাছে সব সমান। এক জনকে পাইয়া কি এক জনকেই ভালবসিতে হইবে? সেই এক হইতে বিশ্ব-সংসারকে ভালবাসিতে শেখ। তুমি একা ত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ হৃদয়ের সকলই অসম্পূর্ণ, দুয়ে মিলিয়া এক সম্পূর্ণ জীব হইয়া বিশ্বপ্রেমে মাতিয়া যাও। একাধারে পুরুষ-প্রকৃতি প্রেমময়ের প্রেম-রাজ্যে প্রেম বিলাও, প্রেমময়ের মহিমা প্রচারিত হউক। ও হরি! এ টুকুও শেখনি? তুমি আবার বিশ্বরূপের বিরাট দেহে প্রাণটা মিশাতে গেছিলে হে? আ, তোমার মুখে আগুণ! না ভাই! যাও, তুমি তোমার পথে যাও, আমিও আমার পথে যাই। অমন ক্ষুদ্র হৃদয়ের সহিত আমার মিলিবে না! এসেছিলে আমার কাছে, ভাবিয়া ছিলাম লোকটা ভাবুক; দু একটা অনন্ত পথের কথা বলিব। কিন্তু বল্‌ব কা'কে? থালির ভিতর কি আর হাতির স্থান হয়। যাও ভাই, আবার আদরিণীর মুখভার সহ্য হবে না!

আ। না, আমি ব'সলাম, কি ব'ল্‌ব বল।

ত। কোনটা বলব?

আ। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়।

ত। তা আমি এক দমেই সব ব'লব, ভিন্ন ভিন্ন কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। মন দিয়ে শুনো, যেন সেই মুখখানির কথা মনে করো না, তা হলেই গোল! দেখ, আমি সামান্য বটে, কিন্তু জেনো এ সংসারে সামান্য কিছুই নয়। কোথায় রবি ঠাকুরের ল্যাজ ধরে নাচ্‌তে নাচ্‌তে কতকগুলো বারিবিন্দু আকাশে উঠে মিলে-মিশে মেঘ হয়ে কত হাঁকা-হাঁকি ডাকা-ডাকি করতে লাগ্‌ল, অহঙ্কার আর ধরে না, কিন্তু অত দর্প স'বে কেন? দেমাকের ভরে ফুলে ফুলে শেষে টুপ্ টাপ্ করে মাঠে, বনে, পর্ব্বতে পড়তে লাগ্‌ল। পাহাড়ের গাছগুলো চিরকাল পাহাড়ের আশ্রয়ে থাকে, শিকড় দিয়ে বিষ্টি-ফোঁটা কতকগুলো টেনে নিয়ে ছোট ছোট গর্ত্ত দিয়ে পাহাড়ের ভিতরে পাঠিয়ে দিতে লাগ্‌ল, তারা গড়িয়ে গড়িয়ে এর তার ভিতর

দিয়ে যেয়ে, মিলে মিশে কত শক্ত মাটী নরম মাটী পার হয়ে, ফাঁক পেয়ে পাহাড়ের এক দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আর তাদের কে রাখে? রাখলেই বা থাকবে কেন? এ সংসারে কার্য্য হেতু যাহাদের জন্ম, তাহাদিগকে কে কিসে আটকাইতে পারে? তখন সকলে মিলিয়া দেশ-বিদেশের উপকার করতে ছুটিল। আসিতে আসিতে পথে আর অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তারাও অই রকম পাহাড় ফুটে বেরিয়েছে। এইরূপে সকলে মিলিয়া তখন এক ক্ষুদ্র জলস্রোত হইল, এইরূপে আমার জন্ম; তখন মানব হৃদয়ের আশার ন্যায় নিভৃত দেশ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগলাম। আসিতে আসিতে কতদেশ ভাঙ্গিলাম, কত গড়িলাম, সম্মুখে যাহা পাইলাম ভাসাইয়া লইয়া চলিলাম। এইরূপে চলিয়াছি, শেষে সাগরে যাইয়া মিশিব!

আ। আ মরি! বেশ বলেছ, তাতে আর মাথা-মুণ্ডু কি হল, ধান ভানতে শিবের গীত আনলে যে!

ত। আমি মনে করেছিলাম, তুমি শুনছিলে না, গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছ?

আ। আহা! যে গল্প একটু রস্ টস্ কিছু নেই?

ত। কেন, রাজকন্যা টন্যে নেই বলে? তা আচ্ছা, কত দিন কত রাজকন্যে, মন্ত্রীকন্যে আমাতে নাইতে আস্ত, আমার বুকে ডুবেও অমন কত মরে গেছে, তা জান? তা ঠিক ধরেছ? রসহীন হচ্ছিলো বটে, কিন্তু কেমন করে জানব, আমি ভয়ে বলিনি, ভেবেছিলাম পাছে মেয়ে মানুষের নাম শুনে কুরুচি ভেবে বিরক্ত হয়ে উঠে যাও, কিম্বা একদম মূর্চ্ছাই যাও, শুনচি নাকি, কোকিল পাপিয়া গুলিকেও সুরুচি ও সুনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে, আইন পর্য্যন্তও হবে, তা তোমরা নব্য সম্প্রদায়, তোমাদের সঙ্গে অনেক ভয় করে কথা কওয়াই ভাল। যাক, এখন ভেঙ্গে চুরে তোমায় সব কথা বলি। দেখ, তুমি যা ভাবছিলে, সেটা নেহাত অস্বাভাবিক নয়। মানুষের এইরূপ ভাবনাই হয়ে থাকে, বিশেষ আজ কালকার কালে 'পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ' কথাটা পাগলের বলে, বোধ হয়

জীবনান্তে বনং ব্রজেৎ হয়ে উঠেছে। তা যাই হোক্, তোমাকে কিন্তু বলি—দেখ, যেমন আমার এই স্রোতমুখে কত ভাঙ্গিয়াছি, কত গড়িয়াছি, কত ডুবাইয়াছি, বল-বুদ্ধি-জরা-যৌবন কিছুই গ্রাহ্য করি নাই, কেহ শিশু বা যুবা বলিয়া আমার হাত হইতে নিস্তার পাই নাই, তেম্‌নি হে ভাবুক ভাই! প্রবল কালের স্রোত, তোমার ঐশ্বর্য্য তেজ, শৈশব বা যৌবন কিছু মানিবে কি? এই মুহূর্ত্তেই ত তোমার সময়ের শেষ হইতে পারে! আমি যখন পর্ব্বত প্রদেশে ছিলাম, কেমন নির্ম্মল ছিলাম, কিন্তু যত সিন্ধুমুখে অগ্রসর হইতেছি, ততই বিস্তৃত হইতেছি, অগন্য তরঙ্গমালা আসিয়া সেদিনের সেই প্রশান্ত বক্ষে দেখা দিতেছে, উভ তটের কর্দ্দম রাশিতে দেহ ক্রমে পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে। তুমি ভাই ভাবিয়া দেখ, শৈশব নিভৃত উন্নত প্রদেশে তোমার জীবন নদী কত নির্ম্মল ছিল, কোথায় কয়টী তরঙ্গ ছিল বল? কিন্তু এখন তাহার কত বিস্তার! কুল দেখিতে পাও কিনা সন্দেহ! ভীষণ তরঙ্গমালা দেখিয়া আতঙ্কে থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছ! কালের তট-রেখায় ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে দেহ মন কত পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে, শৈশবের সে নির্ম্মল হৃদয় কৈ? আমার তীরে কত কুসুম ফুটিয়া আমার স্বচ্ছ আরসী সমান বক্ষে মুখ দেখিয়া বায়ু ভরে নৃত্য করে, আবার আমি তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাই! হাসিতে ভুলিনা, শোভা দেখি না, স্রোতের গতি কে রোধ করে? তোমার কালের স্রোত কোন জীবন কুসুমের মুখ চাহে কি? কখনই না! তুমি বলিলে, যে সে আমায় পার হইয়া যায়, সত্য, যাহার ক্ষমতা আছে, সেই পারে! বালক বালিকারা পারে না! আবার প্রবল কালস্রোত ও উত্তীর্ণ হইবার উপায় আছে! একজন ভবকর্ণধার আছেন! যে কায়মনোবাক্যে তাঁহার স্মরণ লয়, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকে সেই হাসিতে হাসিতে অনায়াসে কালসাগর পার হইয়া যায়। যে এ সব কথা জানে না, চুল পাকিলেও সে ক্ষুদ্র বালক, সে কখন কালসাগর পার হইতে পারে না! ভাই হে! আমার যৌবন গিয়াছে, কিন্তু আমি ত সাগর পানে ছুটিয়াছি—

সেখানে যখন কান্তের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিব, তখন কি আর আমার যৌবন কি বার্দ্ধক্য কিছু বুঝিতে পারিবে? সেই আশাতেই আমি যৌবন হারাইয়াও তোমাকে বিদ্রূপ করিয়া চলিয়াছি, শুধু তোমাকে নয় তোমার বোকা মানুষগুলো সকলকেই। কিন্তু ভাই বল দেখি, তোমার কি আশা আছে? তোমার যৌবন গেলে আর যৌবন পাইবে কি? পাইতে পার, যদি আমার কথা শোন! সেই দয়ার সাগরকে হৃদয়ের সর্ব্বেশ্বর কর, তাঁহার উদ্দেশে সকল ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া—বন্ধন ছিঁড়িয়া এক প্রাণে এক তানে তাঁহারই ধ্যানে—তাঁহারই জ্ঞানে—তাঁহার কাছে চল, জরা থাকিবে না! যৌবন যাইবে না। এ নশ্বর যৌবন যায়, শেষে অনন্ত যৌবন পাইবে, তাহার আর ক্ষয় নাই। আমার কাছে আসিয়াছ, তুমি ভাবুক, আমার প্রাণের প্রাণ, আঁধার ঘরের মাণিক, তোমায় বঁধু বলিব না ত কি হে, আমি ত ভাবুকের চিরসঙ্গিনী, একি নূতন কথা? ভাবুকের অত ভয় করিলে চলিবে কেন? ভাবুকের শত শত সঙ্গিনী, চন্দ্রমা তাহার পাটরাণী, কল্পনা তাহার ঘরণী-গিন্নী। হৃদয় দ্বারের চাবি তাহারই হাতে। তবে তুমি অত ঘর ঘর কর কেন? তোমার আবার ঘর বার কি? নূতন নূতন কি এত হয় গা? কে জানে বাপু! তা যাই হোক, তোমাকে চুপে চুপে আর একটা কথা বলি। দেখ, আমার মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ো, পরীক্ষা বা প্রলোভনে ভুলিও না। কুসুম হাসিয়া আমায় ভুলাইতে চাহে, চন্দ্রমা মুচকি মুচকি হাসিয়া আমায় কত কথাই বলে, কিন্তু আমি কাহার জন্য অপেক্ষা করি না। আমি জানি যখন আমি আমার প্রাণকান্তের বিলাস অঙ্গে মিশিব, তখন অমন কত চন্দ্রমার উদয় অস্ত আমার অঙ্গেতেই হবে, তখন আমার গৌরব কত হবে! তুমিও কাহার হাসিতে ভুলিও না। অবাধে অপার করুণাময় প্রাণকান্তের কাছে চল, কত সুখ—কত হাসি—কত রবি শশী দিব্যাঙ্গনা তোমার সাধনা করিবে। বুঝিলে হে, ভুলিও না; গণা দিন শীঘ্র ফুরাইবে, যৌবন জলমের মত যাইবে। তাই বলি, সাবধান হও, আমি চলিলাম, আর দাঁড়াইব না, আমায় অনেক দূর যেতে হবে।

কুল্ কুল্ কল কল কোথায় তটিনী ছুটিয়া চলিল, মন সেই সঙ্গে কিছু দূর ছুটিল, আর পারিল না। তখন আস্তে আস্তে উঠিলাম। হৃদয়টা যেন একবারে উদাস হইয়া গেল। একবার দূর নভোপথ পানে চাহিলাম। আহা! কি মধুর দৃশ্য! যখন আকাশ ধবল জলদ-জাল বিমল কিরণ মাল শারদ পৌর্ণ মাসী মাঠে, ঘাটে, পথে, লতায়, পাতায়, যে দিকে যাই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-ভাতি দূরে গ্রামের ধারে ধারে এখানে সেখানে এক একটী আম্র-কানন মায়ামুগ্ধ জীবগনের ন্যায়, মধ্যে দারুণ আঁধার, বুকে করিয়া রাখিয়াছে। পুণ্যালোকে মোহান্ধকার। পুণ্যের প্রভাব ও মহিমা দ্বিগুণ হইতে লাগিল। এককালে দুইদিক দেখিলাম। একে একে তটিনীর কথাগুলি মনে হইল! প্রফুল্ল চন্দ্রমার সেই বিরাট পুরুষের দিব্য প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলাম। সেরূপ নহিলে কি চাঁদের অত রূপ হয়? তখন প্রাণের মাঝে কে যেন বলিয়া উঠিল, তার চন্দ্রে হরি, দেখ প্রাণ ভরিয়া দেখ, হৃদয় ভরিয়া ডাক! বার বার ডাকিলাম, হৃদয় জুড়াইয়া গেল, ভয় ভাবনা দূর হইল। নূতন চক্ষে নূতন সংসার দেখিলাম। সহসা দূরে মধুর হরি-সংকীর্ত্তন ধ্বনি শুনিলাম। সমবেত স্বর গ্রাম নৈশ নীরবতা ও পবন ভেদ করিয়া শূন্য হতে শূন্যে উঠিয়া যেন চাঁদের পাশে ছুটিল। সংকীর্ত্তন ক্রমে নিকটে আসিল। আমিও তাহাদের সহিত মিশিলাম। তাহারা গাইল;—

হরি নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে!
বল মাধাই মধুর স্বরে।
নামের গুণে গহন বনে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে॥

আমিও তাইতে যোগ দিলাম, ভাবিলাম, হে দয়াময় হরি! এ দিনের শুষ্ক হৃদয় যদি তোমার নামে মুঞ্জরিত হয়, তবেই জানিব তোমার নামের গুণ, এ দীনের ত আশা ভরসা নাই, তবে তুমি দীননাথ, পাপী তাপী বিচার নাই, যে চায় তাকেই করুণা বিলাও। দেবের দুর্লভ ধন কাঙ্গালের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া যাচিয়া ছড়াও। দয়াময়! আমিও কাঙ্গাল।

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

একটী গান।

[নট নারায়ণ—একতালা।]

কি যে অভাব তা'ত জানিবি না
কেবল কাঁদিবি প্রাণ!
তুই—মনের কথাটী মনকে লুক'বি
গাহিবি বিষাদ-গান।
কেন "হায়" "হায়" বুঝিতে পারি না
তুই (ও) ত তা' বুঝিবি না;
তো'র বিষম ব্যাধি সুধাইতে গেলে
বলিস্——"কিছুই না!"
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্মশান করিলি
এমন সুখের ঘর;
সুধু—বেদনা শুনিয়া জ্বালাতন হ'য়ে
আপনা হইল পর।
একটী কুসুম সবে আধ ফোটা
প্রথম বসন্ত গানে;
নীলাকাশ হ'তে নামেনি পাপীয়া,
এখন মধুর তানে;
এখন ফুলের হয়নি বিয়ে
আসেনি মধুপ বসন্ত পেয়ে
এখনও বীণা আছে ঘুমায়ে
দু'দিনেই হলি অবসান!

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

২য় খণ্ড। ভাদ্র, ১৩০২ সাল। ১০ম সংখ্যা।

নূতন সভ্যতার আত্মকথা।

আমার নাম নূতন সভ্যতা; আমি পূর্ব্বে এ মুলুকে ছিলাম না, সুদূর তুষারাবৃত দেশ হইতে আমি সম্প্রতি এ মুলুকে আসিয়াছি। দেশ পরিবর্ত্তনে আমার রং ও পোষাক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তাই এখানে আসিয়া আমাকে দুই বেলা গা ঘষিতে ও মাথা ভিজাইতে হয়; অন্যথা আমার রং ময়লা ও টেরী ভগ্ন হইয়া যায়। শীত-প্রধান দেশে আমার জন্ম বলিয়া এখানে আসিয়াও আমি সর্ব্বদা আপাদ মস্তক কাপড় ঢাকিয়া থাকি, হাত দুইটী পকেটের মধ্যে গুঁজিয়া দিই এবং সর্ব্বদা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ছুটাছুটী করিতে ভালবাসি। যেখানেই থাকি আমার স্বভাব, হাব, ভাব ঠিক পূর্ব্ববৎ বজায় আছে।

আমি দূর দেশে থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে এ মুলুকের কথা শুনিতে পাইতাম; শুনিতাম,—এখনকার লোকেরা প্রায় উলঙ্গ থাকিত, ভাল করিয়া বস্ত্র পরিধান করিতেও জানিত না, বৃদ্ধ না হইলে চক্ষে চস্‌মা দিত না, মাংস পলাণ্ডু প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য সকলের পরিবর্ত্তে উদ্ভিজ্জ ও অন্ন আহার করিত। সর্ব্ব-শরীর প্রায় উলঙ্গ করিয়া, আবার কেহ কেহ (বলিতেও ঘৃণা হয়) সেই উলঙ্গ দেহে

মৃত্তিকা ও নানাবিধ রং লেপিয়া বিকট বেশ ধারণ পূর্ব্বক এমন কি মহিলাকুলের সম্মুখে যাইতেও লজ্জা বোধ করিত না। স্বীয় প্রণয়িনী ও দাস দাসী ব্যতীতও কতকগুলি বাজে লোক যথা—বৃদ্ধ পিতা, মাতা (পিতার পরিবার) ভ্রাতা, বিধবা ভগ্নী, ভাগিনেয়, কন্যা, মাসি, পিসী প্রভৃতি কতকগুলা বাজে লোক প্রতিপালন করিয়া অলসতার প্রশ্রয় দিত, এমন কি ইহারা স্বয়ং না খাইয়াও বা কষ্ট স্বীকার করিয়াও কেবল পরকে খাওয়াইতে ভালবাসিত এবং এইরূপ "ভূতযজ্ঞ" বা ভূত-ভোজন করাইয়া আপনারা কষ্টে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িত, তথাপি নিজের সুখের জন্য একটু ব্রাণ্ডি সেবন, নৈশ ভ্রমণ বা দুই একদিন বাগান পার্টি এ সব কিছুই করিত না। আরও ইহারা "সৃষ্টির সুন্দর রত্ন" রমণীকুলের প্রতি বড়ই নিষ্ঠুর ছিল। বলিতে হৃদয় ফাটিয়া যায়—ইহারা রমণীগণকে দাসীর ন্যায় খাটাইয়া লইত ও সর্ব্বদা "অন্তঃপুর" নামক কারাগৃহে আবদ্ধ রাখিত। পতি মৃত বা অপছন্দ হইলেও পত্যন্তর গ্রহণ করিতে দিত না, অথচ আপনারা বহু বিবাহ করিয়া স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া সুখে কাল কাটাইত! কি ভয়ানক স্বার্থপরতা!!! বামাকুলের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ কথনই সহ্য হয় না। আহারে, বিহারে, আচারে, ব্যবহারে, গমনে, ভোজনে, চলনে, বলনে ইহারা যারপর নাই বর্ব্বর হইলেও ইহারা কিন্তু নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিল না। আমাদের দেশের কতিপয় নর-পুঙ্গব, অনেক ইতিহাস পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ইহারাও সামান্যরূপ লিখিতে পড়িতে জানিত। সঙ্গীত ও শিল্প-বিদ্যাও কিছু কিছু জানিত তবে সকল বর্ব্বর জাতির ন্যায় ইহাদের জগতের সাররত্ন অর্থের প্রতি আসক্তি ছিলনা; কেবল অর্থ কেন জগতে সাররত্ন স্বরূপ যে তিনটী W অর্থাৎ Wealth, Wine এবং Woman, এই তিনের প্রতিই তাহারা বিরক্ত ছিল। Sanskrit স্যান্‌সক্রিত নামক তাহাদের এক প্রকার ভাষা ছিল, এই ভাষার রচিত কতকগুলি "কৃষক গীতি"কে তাহারা "ভেডা" গ্রন্থ বলিত; ইহা ব্যতীত তাহাদের আর দুই চারিখানি পুস্তকও ছিল। স্যান্‌সক্রিত শব্দটী বোধ হয়

স্যাক্সন+কৃত, এই অর্থ ক্রমশঃ অপভ্রংশ হইয়া Sanskrit হইয়া গিয়াছে। কথাটীর বিশ্লেষণে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ওই ভাষা স্যাক্সন জাতির কৃত; তবে কিরূপে যে এ দেশে উহা প্রচলিত হইল, তাহা আমি অবসর মত ইতিহাসের নোট (Note) দেখিয়া তোমাদিগকে বলিব।

যাহাই হউক, ইহারা যে নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিল না, শিখাইলে যে শিখিতে পারিবে,—আমার এ ধারণা ছিল. তাই আমি সুদূর দেশ হইতেও ইহাদের এই ভীষণ অবনতির কথা শুনিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে—মানুষ করিতে এ মুলুকে আসিয়াছি। কারণ "পরোপকারায় সতাংজীবনম্" একথা আমরা বেশ্ জানি।

আসিবার ইচ্ছা হইলেও আমি বিনা আহ্বানে আসি নাই, এ দেশীয় কয়েকটী কৃতবিদ্য লোক আমাকে এখানে আনিবার জন্য অনেক সাদাসাদিও করিয়াছিলেন। এইরূপে কতক পরোপকার ইচ্ছায়, কতক উপরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি বিস্তৃত মহাসাগর পার হইয়া অতি কষ্টে এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং মহানগরী 'কলিকাতাতেই' আমার "হেড্-কোয়াটার" লইয়াছি। মফঃস্বলে আমার পাণ্ডাগণ প্রেরিত হইয়াছেন। সকলের সমবেত চেষ্টায় আমি অনেকাংশে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছি—নিয়ত চেষ্টা করিয়া আমি এদেশের অনেক হিতসাধন করিয়াছি। অল্পকাল মধ্যে যে আমি ইহাদিগকে এত উন্নত করিতে পারিব, তাহা মনে করি নাই। যাই হউক, আমি ইহাদিগের মধ্যে নব্য ও বালকগণকে প্রায় মানুষ করিয়া তুলিয়াছি। ইহারা এখন কাপড় পরিতে, টেরী কাটিতে চলিতে, বলিতে, খাইতে, শুইতে বেশ শিখিয়াছে। পূর্ব্বে "ভূত ভোজনে," "মাটীর পুতুল" পূজায় এবং মরা গোরুকে ঘাস জল দিবার জন্য যে রাশিকৃত অর্থের অপব্যয় করিত, এখন সে সমস্ত প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মহিলাগণ এখন আমার প্রসাদে কারামুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে—পবিত্রভাবে—ভ্রাতৃভাবে পুরুষগণের সহিত মিশিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে, নাচিতে, গাহিতে, বেড়াইতে পাইতেছেন।

আর তাঁহাদিগকে অধীনতার কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হয় না, আর তাঁহাদিগকে দাসীর ন্যায়—পাচিকার ন্যায় কার্য্য করিয়া সোণারবরণ কালি করিতে হয় না। এখন তাঁহারা ইচ্ছামত পতি-গ্রহণ বা পতি পরিত্যাগ করিতেও পাইতেছেন। মহিলাকুল এইরূপ অভাবনীয় উন্নতি মার্গে পদার্পণ করিয়া, আমাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন, আমিও তাঁহাদের ধন্যবাদে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি।

পরকাল ও ধর্ম্ম—এই দুইটী অতীব অপ্রয়োজনীয় কথা লইয়া এ দেশের লোকে পূর্ব্বে বড়ই মাথা ঘামাইত। আমি কিন্তু ইহার কোন কারণই দেখি না। “আপনি খাও, প্রণয়িনীকে খাওয়াও এবং আপনি সাজ আর প্রণয়িনীকে সাজাও” ইহাই আমার মূলমন্ত্র। আমি এই মূলমন্ত্রে প্রায় সকলকেই দীক্ষিত করিয়াছি; পারি নাই কেবল গোটাকতক Old foolকে। তাহারা আমার সৎকার্য্যের বড়ই অন্তরায় হইয়াছে। তাহাদের সত্বর মৃত্যুই আমার এবং আমার দলস্থ সকলের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সদনুষ্ঠানে বাধা বিপত্তি অনেক, সুতরাং আমার এই সৎকার্য্যে ওই বৃদ্ধগুলা বড়ই বাধা স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আমাকে দেখিলেই “অন্তঃসার-শূন্য” বলিয়া বিদ্রূপ করে এবং পদে পদে আমার কার্য্যে বাধা দেয়। তাহারা এখনও পরের জন্য কাঁদিতে যায়, পরের সহিত দেখা হইলে কেবল ঈষৎ ঘাড় দোলাইয়া সম্ভাষণ করার পরিবর্ত্তে, তাহার শরীরিক, বৈষয়িক, পারিবারিক অনেক বাজে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, কেবল সময় নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। আমার দলস্থ সুসভ্য মহোদয়েরা সেই টিকিওয়ালা অর্দ্ধ উলঙ্গ নগ্ন-পদ বিকট বেশধারী devil গুলাকে প্রণাম করে না এবং উপদেশ দিতে যায় বলিয়া তাহারা বড়ই বিরক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের রাগ করিবার কোন কারণই আমি দেখিতে পাই না। যার তার কাছে মাথা নত করা যে নিতান্ত অশ্লীলতা-সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

গত কয়েক বৎসর কি সহরে, কি মফঃস্বলে, সর্ব্বত্রই আমার কার্য্য বেশ চলিতেছে। পূর্ব্বোক্ত কুসংস্কারগুলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; বিধবা বিবাহ, সপুত্রা বিবাহ, যুবতী বিবাহ প্রায় প্রচলিত হইয়াছে। জাতিভেদ, ধর্ম্ম প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় কথাগুলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; এক কথায় আমি অনেক সংস্কার করিয়া তুলিয়াছি। মৎকৃত সংস্কার সকল তোমরা অনেকেই চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছ ও সংবাদ পত্রেও পাঠ করিতেছ, সুতরাং সে কথায় অধিক পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, বিশেষতঃ আমি আত্ম-শ্লাঘাকে বড়ই ঘৃণা করি।

ভবিষ্যতে অর্থাৎ Old fool গুলার মৃত্যুর পর আমি আরও যে কয়েকটী অতীব প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিব বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে বলিয়া আমার এই 'আত্মকথা' শেষ করিব। সাবধান! যেন তোমরা ইহা fool দিগের কাছে প্রকাশ করিও না। তাহারা শুনিলেই একবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিবে।

আমি, স্ত্রী-পুরুষে সমান অধিকার ত পূর্ব্বেই দিয়াছি। কিন্তু আমার শাস্ত্রে যখন ইহাঁদিগকে Better half বলে তখন, অবশ্য তাঁহারা যাহাতে পুরুষ অপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হন, পুরুষগণ যাহাতে তাঁহাদের দাসানুদাস হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় রত থাকে, তাহার বিশেষ চেষ্টা আমাকে করিতে হইবে। আর এক অন্যায় ব্যবহার আছে;—দেখ রমণীগণ আজ পর্য্যন্ত সন্তান প্রসবের দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়া আসিতেছেন; অতঃপর যাহাতে তাঁহাদের পরিবর্ত্তে পুরুষগণের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয়, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। আর এক কথা—যখন পুরুষগণ নিজ পছন্দ অনুসারে একাধিক স্ত্রী লইতে পারিতেছেন, তখন রমণীগণ কেন যে এইরূপ নিজ পছন্দ অনুসারে পতি গ্রহণ করিতে পারিবেন না?—তাহার কোন যুক্তিই নাই। সুন্দরীগণের এই শোচনীয় অভাব পরিপূরণের জন্য আমি মিউনিশিপাল মার্কেটের পার্শ্বে—ঠিক ধর্ম্মতলায় একটী "পতি বাজার" বসাইতে মনস্থ করিয়াছি। তথা হইতে রমণীগণ ইচ্ছামত পতি ক্রয় করিয়া বা ভাড়া করিয়া অধিক, অনধিক

সময়ের জন্য আনিতে পারিবেন। এরূপ সুন্দর উপায় না থাকিলে কিছুতেই তাঁহাদের পতি কষ্ট বিদূরিত হইবে না। এই সকল নূতন সংস্কার সহরে অনায়াসেই সম্পাদিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু ভয় আমার পল্লীগ্রাম লইয়া। সমস্ত দেশ সভ্য করিতে না পারিলে, সকলকে আলোকে আনিতে না পারিলে আমার কীর্ত্তি থাকিবে না। যাহা হউক, মফঃস্বলেও শাখা সমিতি স্থাপন করিয়া আমি এজন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিব। যাহাতে সর্ব্বত্র আমার এই নূতন ধ্বজা উড়াইতে পারি,—যাহাতে সর্ব্বত্র আমার জয় ঘোষিত হয়, তজ্জন্য আমি আজ হইতে বদ্ধ পরিকর হইলাম। দেখি "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

জীবন বহিয়া যায়!

সঙ্কল্প ত আছে প'ড়ে, সাধনা হ'লনা তা'র,
ও দিকে কালের ভেরী বলিতেছে বারম্বার,—
—"জীবন বহিয়া যায়";

মনে করি—এই বার পূরাইব মনোরথ,
কোথা' হ'তে বিঘ্নরাশি আসি' আগুলিল পথ,
(কিন্তু) জীবন বহিয়া যায়।

গিয়াছিনু আনমনে আশার কাননে হায়!
যাওয়াত হ'লনা আর কণ্টক বিঁধিল পায়;
(ওদিকে) জীবন বহিয়া যায়।

একি এ আশার ধরা ছলনাই সার তা'র,
হ'বেনা কি এ জীবনে সঙ্কল্প সাধন আর?
(হায়!) জীবন বহিয়া যায়!

শুকাইল ফুল হার, মুছে গেল অশ্রু-জল।
লইয়া প্রাণের হাসি জীবনের নব বল
জীবন বহিয়া যায়!

জীবন-তটিনীজলে প'ড়েছে নিবীড় ছায়া,
তটে দাঁড়াইয়া তা'র নিরাশার ভীম কায়া,
জীবন বহিয়া যায়!

আবার ঐ আশা এসে বলিতেছে কাণে কাণে,
"এখনো উদ্যম কর—বিলম্বে সুফল আনে"
(হের) জীবন বহিয়া যায়—

কি কাজ সাধিতে আমি এসেছিনু এ ধরায়,
জীবনের এত দিন—বিফলে কাটানু হায়,
হায়! জীবন বহিয়া যায়।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

কলিকাতার ইতিহাস।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

তৃতীয় অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে লিখিত হইয়াছে, বর্গীদিগের উৎপাতে লোকে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে আসিয়া বাস করিত, এক্ষণে এই বর্গী কাহারা, কি জন্ত তাহারা এ দেশে এরূপ উৎপাত করিত, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। কেন না, কলিকাতার ইতিহাসে তাহাদের বিষয় অনেকবার উল্লিখিত হইবে।

[বর্গী-(মারহাট্টা)-দিগের নিবাসভূমি মহারাষ্ট্র দেশ। ইহার উত্তর সীমা সাতপুর পর্ব্বতমালা, পশ্চিম সীমা ভারত সাগর, পূর্ব্বদিকে

বেণগঙ্গা, বেণগঙ্গা যথায় বরদা নদীর সহিত মিলিতা হইতেছেন, সেই স্থান হইতে সীমা রেখা বরাবর পশ্চিম মুখে মাহুরনগরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত আসিয়া ভীমানদীর সঙ্গমস্থলের কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিয়া দক্ষিণ পশ্চিম মুখে শিবদাস গড়ের নিকট সাগর কূলে আসিয়া মিলিত ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ সকল সময়ে এই সীমা মান্য করিয়াও চলিতেন না।

মহারাষ্ট্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস অতীতের অনন্ত গর্ভে নিহিত, জানিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। শিবজীর সময় হইতেই এই জাতি অভ্যুত্থিত হয়। এই জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শিবজী, খ্রীঃ ১৬২৭ অব্দে সিউনির দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে দাদাজী কণ্ঠদেবের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া যুবা বয়সে ইনি দিল্লীশ্বরকে পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। ইহাঁর প্রতাপেই মহারাষ্ট্রীয়দের প্রতাপ বর্দ্ধিত হয়। দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত ইহাঁকে দমন করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। অবশেষে তাঁহাকে বিজয়পুর রাজ্যের কতক অংশের চৌথ (চতুর্থাংশ) ও সর্দ্দেশমুখী (শতকরা দশ হিসাবে) দিয়া ও তাঁহার পুত্র শাম্বজীকে ৫০০০ সেনার অধিনায়ক করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সর্দ্দেশমুখী ও চৌথই ভারতরাজ্যের কাল। ইহাই উপলক্ষ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা সময়ে সময়ে ভারতের নানাদেশ আক্রমণ করিত। বঙ্গদেশেও আসিত, ইহা ছাড়া বঙ্গে উৎপাত করিবার আর একটী কারণ ঘটিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

শিবজী, খ্রীঃ ১৬৮০ অব্দে ৫ই এপ্রিল রাজগড়ে বাতরোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইহারই সহিত অভ্যুত্থিত বংশের পতন আরম্ভ হয়।]

ভাগীরথীর পূর্ব্বাপারে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম না থাকাতে মহারাষ্ট্রীয়গণ এদিকে বড় উৎপাত করিত না। এই জন্য লোকে ক্রমে এদিকে আশ্রয় লইতে লাগিল। কাজে কাজেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের চক্ষুও ক্রমে সে দিকে পড়িতে লাগিল।

খ্রীঃ ১৬৯৬ অব্দে শোভাসিংহ নামে বর্দ্ধমানের একজন জমিদার, বর্দ্ধমান রাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। সেই গোলযোগের সময় বঙ্গ-প্রবাসী ইউরোপীয়গণ নবাবের নিকট আত্মরক্ষার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তদনুসারে খ্রীঃ ১৬৯৮ অব্দে ইংরাজেরা ফোর্ট উইলিয়ম নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় ঐ সময়েই তাঁহারা সম্রাট আজিম ওসানের নিকট সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয় করিয়া লন।

খ্রীঃ ১৬৯৮ অব্দে যে দুর্গ নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা বর্ত্তমান দুর্গ হইতে স্বতন্ত্র। উহা বর্ত্তমান ফেয়ার্লি প্লেসে কষ্টম হাউস প্রভৃতির স্থানে অবস্থিত ছিল।

খ্রীঃ ১৭০০ অব্দের প্রারম্ভে আর এক দল ইংরাজ বণিক ভারতে আগমন করেন। ১৭৪৬ অব্দে উহাঁরা পুরাতন সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইলে, ফোর্ট উইলিয়মে ১৩০ জন ইউরোপীয় সৈনিক সন্নিবিষ্ট হয়।

খ্রীঃ ১৭১৩ অব্দে মুরশিদকুলি খাঁ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নাজিম হন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি দেওয়ান ছিলেন। নাজিম পদ পাইয়া তিনি লোকের নিকট যেরূপ মাসুল আদায় করিতেন, ইংরাজদিগের নিকটও তদ্রূপ দাওয়া করিলেন। এই জন্য ইংরাজেরা দিল্লীতে সম্রাটের নিকট হামিণ্টন নামক একজন ডাক্তারকে দূত রূপে প্রেরণ করেন। এই সময় সম্রাট পীড়িত ছিলেন। ডাক্তার হামিণ্টনের চিকিৎসায় তাঁহার আরোগ্য লাভ হইলে, তিনি ডাক্তার সাহেবকে পারিতোষিক প্রার্থনা করিতে বলেন। হামিণ্টন সাহেব আপনার লাভের অপেক্ষা স্বজাতীয়গণের লাভ অধিক প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে সুবিধাজনক একখানি সনন্দ সংগ্রহ করিলেন। সে সনন্দের বলে ইংরাজেরা যে সকল উপকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই ;—

"১। ইংরেজ কোম্পানি বিনা মাসুলে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন।

২। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩৮ টি মৌজা ক্রয় করিতে পারিবেন।

৩। মুরশিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহে তিন দিন তাঁহাদের জন্য টাকা মুদ্রিত হইবে।

৪। যাহারা ইংরেজদিগের কাছে ঋণী, নবাবের কর্ম্মচারীগণ তাহাদিগকে ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন।" *

এই সনন্দ লাভে ইংরাজদের বল অনেক বৃদ্ধি হয়।

খ্রীঃ ১৭১৬ অব্দে কলিকাতায় প্রথম গির্জা নির্ম্মিত হয়। ঐ গির্জা রাইটার্স বিল্ডিংসের পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। ঐ গির্জার চূড়া ১৭৩৭ অব্দের ঝড় ও ভূ-কম্পে পতিত হয়। তৎপরে সিরাজের আক্রমণে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

উপরে যে সনন্দের কথা বলা হইয়াছে, উহা খ্রীঃ ১৭১৭ অব্দে লব্ধ হয়। সুতরাং ঐ অব্দ বঙ্গে ইংরাজাধিকারের একটি স্মরণীয় অব্দ বলিতে হইবে।

এই অব্দের শেষেই ডাক্তার হামিল্টনের মৃত্যু হয়।†

এই সময়ে বর্ত্তমান চাঁদপাল ঘাটের দক্ষিণেই অরণ্য ছিল। এই অরণ্য ও খিদিরপুরের মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। শেঠবংশীয়-

* বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস ৫৮ পৃঃ।

† St John's church (সেণ্টজন্‌স্ চার্চ্চ) বা পাথুরিয়া গির্জার সন্নিহিত ভূমিতে ইহার স্মরণ স্তম্ভে এইরূপ লিপি আছে—

"Under this stone lies interred the body of
WILLIAM HAMILTON SURGEON.
Who departed this life, 4th December, 1717.

"His memory ought to be dear to his nation, for the credit he gained the English in curing Ferruksier, present King of Indostan, of a malignant distemper, by which he made his own name famous at the court of that great monarch, and without doubt, will perpetuate his memory as well in Great Britain as other nations of Europe."

এই লিপি পারসী ভাষাতেও আছে। J. B. KNIGHT'S. *Calcutta &.* page 120

দিগের আনীত লোকদ্বারাই ঐ গ্রামদ্বয় অধ্যুসিত হয়। এক্ষণে যেখানে চৌরঙ্গীর পরম রমণীয় সৌধমালা বিরাজ করিতেছে, তৎকালে সেই খানে জর্ণকুটীরপূর্ণ একখানি সামান্য গ্রাম ছিল। বর্ত্তমান বেলিয়াঘাটার দুই মাইল পশ্চিম পর্য্যন্ত অরণ্য ছিল। রাত্রে লোকে ব্যাঘ্রাদির ভয়ে সশঙ্ক থাকিত। এত অসুবিধা সত্বে বাণিজ্যের বৃদ্ধি শীঘ্র শীঘ্রই হইয়াছিল। ইউরোপীয়গণ এ স্থানে অতি স্বচ্ছন্দেই থাকিতেন। হামিণ্টন সাহেব কলিকাতাবাসী ইংরাজ-গণের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন ;—

"বঙ্গে ইউরোপীয় নর নারীগণ সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করেন। সকলেই প্রাতঃকালে বিষয় কর্ম্ম করিয়া মধ্যাহ্নে আহারান্তে বিশ্রাম করেন এবং অপরাহ্নে কেহ বা মাঠে ও বাগানে গাড়ী বা পাল্কীতে করিয়া, কেহ বা চারি দাঁড়ের বজরায় করিয়া নদীতে ভ্রমণ করেন। কখন কখন নদীতে মাছধরা বা পাখীমারা, কখন বা উভয়বিধ আমোদই হয়। রাত্রি হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা বন্ধুভাবে পরস্পরের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকেন।"

সুতরাং এই সময়ে কলিকাতা উন্নতির অবস্থা বলিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

জগতে কাহারও অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। খ্রীঃ ১৭৩৭ অব্দের ১১ ই অক্টোবর তারিখে ভাগীরথীতে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পও হয়। এই ভূমিকম্পেই প্রাচীন সেণ্টজন্স্ চর্চ্চের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। কলিকাতায় প্রায় দুই শত গৃহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শুনা যায়, নৌকা ডিঙ্গা জাহাজ প্রভৃতিতে ২০০০ জলযান স্থানভ্রষ্ট হইয়া যায়। গঙ্গায় ইংরাজদের নয়খানি জাহাজের মধ্যে আটখানি নষ্ট হইয়াছিল। নাবিকেরা প্রায় অনেকেই মরিয়াছিল। এই ঝড়ে ও ভূমিকম্পে প্রায় ৩০০,০০০ প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছিল।*

* এইরূপ বর্ণনা ঐ সময়ে প্রকাশিত Gentleman's magazine নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

খ্রীঃ ১৭৪০ অব্দের নবাব আলিবর্দ্দি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। তাঁহারই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। খ্রীঃ ১৭২০ অব্দে দক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে যে চৌথ পাইবার কথা নির্দ্ধারিত হয়, সেই চৌথের জন্য তাহারা সর্ব্বত্রই দাবী করিত। এখন তাহারা সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই আক্রমণ করে। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, নবাব আলিবর্দ্দি কোন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন, ইহাও তাহাদের জাতক্রোধ হইবার এক কারণ। যাহাই হউক তাহাদের উৎপাতে বঙ্গের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাই ইতিহাসে "বর্গীর হাঙ্গামা" নামে প্রসিদ্ধ। এই উপলক্ষেই মহারাষ্ট্রের খাত কলিকাতার চতুর্দ্দিকে নিখাত হয়।

আলিবর্দ্দির পর সিরাজউদ্দৌলা নবাব হন। "কলিকাতা সংস্থাপক চার্ণকের সময়াবধি সিরাজউদ্দৌলার সময় পর্য্যন্ত ফ্রিক, ক্রটেনডেন্, ব্রেলিউ, ফরষ্টর, আলেকজাণ্ডার, ডেসন্, উইলিয়ম কাউইচ ও রোজর ড্রেক ক্রমান্বয়ে ইংরাজদের অধ্যক্ষ ছিলেন।

এই ড্রেকের সময় এক কাণ্ড ঘটে, যাহাতে ইংরাজদের ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হন। সিরাজউদ্দৌলা, ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের ধন হরণে চেষ্টা করে। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ধনরাশি লইয়া সপরিবারে কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক ইংরাজের শরণাপন্ন হন। ড্রেক তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। সিরাজউদ্দৌলা প্রথমে ইংরাজদিগের নিকট কৃষ্ণদাসকে চাহিয়া পাঠান এবং বলেন, কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে না দিলে, তিনি কলিকাতা আক্রমণ করিবেন। ড্রেক তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ফল এই হইল—খ্রীঃ ১৭৫৬ অব্দের ১৭ জুলাই ৫০০০০ সৈন্য লইয়া সিরাজ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। হলওয়েলের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, ইংরাজ পক্ষে আন্দাজ ২৭০ জন মাত্র যুদ্ধ করিয়াছিল; তাহার মধ্যে ২৫ জন মৃত এবং প্রায় ৭০ জন আহত হইয়াছিল। ড্রেক সাহেব স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে লইয়া জলপথে পলাইয়াছিলেন

যখন সিরাজ দুর্গ অধিকার করেন, তখন ১৪৬ জন মাত্র বন্দী তাঁহার করতলগত হয়। সিরাজ বন্দীদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আপনার সেনানায়কের হস্তে তাঁহাদের রক্ষাভার অর্পণপূর্ব্বক, বিশ্রাম জন্য শিবিরে প্রস্থান করেন। সেনানায়ক নির্বোধের ন্যায়, সেই বন্দীদিগকে 'অন্ধকূপ' নামক একটি ক্ষুদ্র কারাগারে সে রাত্রির মত আবদ্ধ করিয়া রাখিল। প্রাতঃকালে সেই গৃহ হইতে মৃতপ্রায় ২৩ জনকে মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

কিন্তু এই ১২৩ জনের রক্তেই, ইংরাজের ভারতে প্রোথিত সৌভাগ্যতরু কালে ফলবান হইয়াছে। শিঃ-পুঃ।

[ক্রমশঃ]

সাহিত্য।

জগৎ যেমন প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হইয়া, স্বপ্রকাশ-ক্ষম ও ক্রিয়াসাধনে সমর্থ, সেইরূপ আমাদিগের ভাষার সকল বাক্যই স্বর ব্যঞ্জন ও প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন হইয়া, ভাববিকাশ করিয়া থাকে। আরও শাস্ত্রে কথিত আছে, পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও, নিষ্ক্রিয়, এবং প্রকৃতি অচেতনা হইয়াও, সক্রিয়া; তাই তাঁহারা অন্ধ-খঞ্জের ন্যায় স্বতন্ত্র হইয়া, কার্য্য করিতে অসমর্থ। কিন্তু অন্ধ যেমন খঞ্জকে স্কন্ধে লইয়া, সকল কর্ম্মই করিতে সমর্থ, পুরুষও সেইরূপ প্রকৃতিকে লইয়া সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া-সাধনে সমর্থ; আবার ব্যঞ্জনও সেইরূপ স্বরকে আশ্রয় করিয়া, প্রত্যয়ও সেইরূপ প্রকৃতিকে লইয়া, শব্দ ও বাক্য রূপে স্বপ্রকাশে ও ভাববিকাশে সমর্থ। সুতরাং, জগতের স্বরূপ জানিতে হইলে, যেমন প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ জানিতে হয়, সেইরূপ কোন শব্দের বা বাক্যের স্বরূপ জানিতে—অর্থগ্রহ করিতে—হইলে, তাহার স্বর-ব্যঞ্জনবিভেদের ও প্রকৃতিপ্রত্যয়জনিত অর্থের উপলব্ধি করিতে হয়।

সাহিত্যের স্বরূপ জানিতে হইলে, প্রথমে তাহার প্রকৃতিপ্রত্যয়জনিত অর্থের অবগতিই আবশ্যক। (সহিত+ভাবে—ষ্ণ্য=সহিতস্য—হিতেন সহ বর্ত্তমানং যৎ তস্য—ভাবঃ=সাহিত্যম্)—হিতসমন্বিত বিষয়ের ভাবই সাহিত্য। এখন হিত কাহাকে বলে, তাহারই অনুসন্ধান করা যাউক। (হিতং=ধারণার্থক ধা+ভাবে—ক্ত; মঙ্গলম্) ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, যে সকল বিষয়ে আমাদিগের মঙ্গল নিহিত আছে, সেই সকল বিষয়ের ভাবই সাহিত্য।

এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদের কল্যাণকর বিষয় কি? যাহা আত্মা বা বিশ্বের ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম (ধারণার্থক ধৃ+কর্ত্তরি—মন্, ধরতি আত্মানং বিশ্বঞ্চেতি যঃ স এব ধর্ম্মঃ।)—তাহাই আমাদিগের হিতকর। আর শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে সেই হিতকর ধর্ম্মের সত্য নিহিত আছে বলিয়া, সেই সকল শাস্ত্রের সহিত যাহা নির্ব্বিরোধ,—সেই সকল শাস্ত্রনিহিত সত্যই যাহার আত্মা—এবং যাহাতে তাহার বিকাশ—তাহাই সাহিত্য।

যে সাহিত্যে সেই প্রকৃতিপুরুষগত মহৎতত্ত্বের আভাস নিহিত, তাহার শব্দ বাক্যের উৎপত্তিসম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা করা যাউক। "ক" এই বর্ণটীর উচ্চারণ করিলেই, ক্ ও অ এই দুইটী বর্ণই উচ্চারিত হয়। তন্মধ্যে অ কার স্বতই উচ্চারিত হয়; কিন্তু হসন্ত "ক্" বর্ণের উচ্চারণ অসাধ্য। কিন্তু অন্ধখঞ্জযোগের ন্যায়-ব্যঞ্জন-স্বরযোগে শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ স্বরব্যঞ্জনযোগে বিবিধ সার্থক শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আবার সেই সার্থক শব্দের সমবায়ে সাহিত্য উৎপন্ন—অর্থবিকাশে সমর্থ। অপিচ, সাহিত্যের উপাদান—সেই সার্থকশব্দগুলিও—নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন জগতের স্বরূপ জানিতে—পদার্থের শ্রেণীবিভেদ বুঝিতে—প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপোপলব্ধি করিতে হয়; শব্দের বা বাক্যের শ্রেণীবিভেদ বুঝিতে হইলে,—স্বরূপোপলব্ধি করিতে হইলে,—তাহার প্রকৃতি-প্রত্যয়জনিত অর্থের উপলব্ধি করিতে হয়; আর তাহা বুঝিতে পারিলেই, শব্দের স্বরূপোপলব্ধি করিতে পারা যায় ও তাহাদের

শ্রেণীবিভেদও সহজে বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে করণার্থক কৃ ধাতুকে নিদর্শনরূপ ধরিয়া, প্রত্যয়যোগে শব্দের শ্রেণীবিভেদ দেখান যাইতেছে। ইহাদ্বারা অন্যান্য ধাতুপ্রত্যয়জনিত শব্দের উৎপত্তির কতকটা উপলব্ধি করিতে—কতকটা শ্রেণীভেদ বুঝিতে পারা যাইবে।

করণার্থক কৃ ধাতু ভাববাচ্যে—ধাত্বর্থের ভাব বুঝাইতে—অনট প্রত্যয়ের সংযোগ করিলে, করণ শব্দ উৎপন্ন হয়; ইহা কৃ ধাতুর ক্রিয়ার বা ভাবের সংজ্ঞা—'করা' এই অর্থের প্রকাশক। আবার ঐ কৃ ধাতুর সহিত করণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় যোগে করণ শব্দের উৎপত্তি হইলে, তাহা (ক্রিয়তে যেন তৎ) করা যায়, যাহা দ্বারা তাহাকেই বুঝায়। আর যাহাদ্বারা করা যায়, তাহাকে সাধারণ সংজ্ঞা হইতে করণ শব্দদ্বারা বিশিষ্ট করা যায় বলিয়া,—(বি+শিষ+করণে—অনট্ বিশিষ্যতে অনেন।) যাহাদ্বারা বিশিষ্ট করা যায়, তাহার নাম বিশেষণ হওয়াতে—করণ শব্দ বিশেষণশ্রেণীর অন্তর্গত। কৃ ধাতু কর্ম্মবাচ্যে মন্ প্রত্যয়ের যোগে কর্ম্ম (করোতি যৎ তৎ) যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। এই কর্ম্মদ্বারা সাধারণ সংজ্ঞার একটীকে বিশিষ্ট করা যায় বলিয়া ইহাও বিশেষণশ্রেণীর। কিন্তু যে সংজ্ঞাটীকে পূর্ব্বোক্ত বিশেষণদ্বারা বিশিষ্ট করা যায়, তাহার—(বিশিষ্যতে যৎ তৎ=বি+শিষ+কর্ম্মণি—য্যণ্।) বিশেষ্যের—স্থানীয় বা সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্ম বিশেষ্য শ্রেণীভুক্তও হইতে পারে। আর কৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে তৃণ প্রত্যয়যোগে যে কর্ত্তা শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহাও যে করে, তাহার বিশেষণ বা বোধক। কিন্তু এই "কর্ত্তা" শব্দও বিশেষ্য বা বোধ্য সংজ্ঞার স্থানীয় হইয়া, কখন কখন সংজ্ঞাশ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি বলিতে কেবল ধাতুকেই বুঝায় না;—প্রাতিপদিককেও—নির্ব্বিভক্তিক শব্দকেও বুঝায়। তাহাদের উত্তরও বিবিধ অর্থে অনেক প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়; আর তাহাতেও অনেক বিভিন্নার্থক শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেমন শিলার বিকার শৈল—শিলা+ষ্ণ (গন্ধদ্রব্যবিশেষ); শিতের ভাব=শিত+ষ্য শৈত্য;

(তিলের স্নেহ=তিল+ষ্ণ=তৈল। ইহার আমোদ জন্মিয়াছে, এই অর্থে আমোদ+ইত=আমোদিত। সুতরাং প্রকৃতির—ধাতু নামধাতু উপধাতু বা প্রাতিপদিকের—সহিত প্রত্যয় সকল বিবিধ বাচ্যে—নানাভিধানার্থে—মিলিত হইয়া, ধাতু বা প্রাতিপদিকের অর্থের বিভিন্নরূপে বিকাশ করিয়া যে, বিবিধার্থক শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহা ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

ইহাদ্বারা দেখা যাইতেছে, ধাতু বা প্রাতিপদিকের প্রকৃতি সংজ্ঞার কারণ হইতেছে, তাহারা প্রকৃতির ন্যায় স্বপ্রকাশ—একটা অর্থবোধক। প্রত্যয় সেই অর্থের বিভিন্ন প্রকারে বিকাশ করিতে সমর্থ হইলেও, নিজে কোন কর্ম্মই করিতে পারে না;—ঠিক পুরুষের মত নিষ্ক্রিয় হইলেও, প্রকৃতিযোগে কর্ম্মসাধনে সমর্থ। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, প্রকৃতিপুরুষের ন্যায় প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে ভাষার সকল শব্দেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে;—ভাববিকাশের শক্তি পাইয়া থাকে।

আবার প্রকৃতিপ্রত্যয়জনিত অর্থদ্বারা শব্দের স্বরূপোপলব্ধি করিতে পারিলেই, তাহাদের সমাবেশে ভাববিকাশ করিতে পারা যায় না; কেন না, প্রত্যেক শব্দের সহিত যথাযোগ্য বিভক্তি যোগ করিয়া ধাতুকে কর্ত্তার সহিত অন্বিত করিয়া বিভক্তিযোগে ক্রিয়ায় পরিণত করিলে, সেই সবিভক্তিক শব্দ ও ক্রিয়ার সমবায়ে শব্দসমূহ ভাববিকাশ করিতে পারে। 'রাম হরি পৃষ্ঠ আগত কৃ বা করা' বলিলে কোন অর্থই প্রকাশ পায় না; কিন্তু ঐ শব্দগুলি বিভক্তির যোগে সমবেত হইয়া, যখন—'রাম হরির পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছে;—এইরূপে পরিণত হইবে, তখনই ভাববিকাশে সমর্থ হইবে। এই বিভক্তিযোগসম্বন্ধেও সেই মহৎ তত্ত্ব নিহিত আছে।

সেই সকল সার্থক বাক্যের স্বরূপোপলব্ধি করিতে—তাহার বিন্যাস জানিতে—হইলে, ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়। (বি+আ+কৃ+করণে-অনট্; ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে অনেন ভাষা বাক্যানি বা। ব্যাকরণ দ্বারা ভাষা বা বাক্যসকলের সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তিলাভ করা যায়।) যাহাদিগের এই ব্যাকরণে জ্ঞান আছে,

তাঁহারাই শিষ্টপ্রয়োগ দেখিয়া, বিশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার করিতে পারেন। তাহা যাঁহারা না জানেন, তাঁহারা ফণীকে অজগরবিশেষণে বিশেষিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। সাহিত্যসম্বন্ধীয় অপরাপর দুই একটী কথার এই স্থানে আভাস দিয়া, প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

এই সাহিত্যে রসাত্মক বাক্যময় হইলেই, কাব্য বলিয়া অভিহিত হয়। নানা রসাত্মক বাক্যদ্বারা হিতের—সেই শাস্ত্র নিহিত সত্যের—বিকাশ করা একে দুঃসাধ্য; তাহার উপর আবার তাহাতে লালিত্যের মনোহারিত্বের সমাবেশ করা আরও কঠিন। কিন্তু যে কাব্যে লালিত্যের ও মনোহারিত্বের অভাব, তাহার মর্য্যাদাও অল্প। তাই কোন কবি বলিয়াছেন,—

"তয়া কবিতয়া কিংবা কিংবা বনিতয়া তয়া।
পাদবিন্যাসমাত্রেণ মনো নাপহৃতং যয়া ॥"

সেই কবিতারই বা প্রয়োজন কি, আর সেই বনিতারই বা প্রয়োজন কি, যে কবিতা বা যে বনিতা পাদবিন্যাসমাত্রেই মনোহরণ না করিতে পারে। সুতরাং শাস্ত্রসম্মত হিতের—সত্যের—কাব্যে এরূপে বিকাশ করিতে হইবে, তাহা যেন জনমনোহরণে সমর্থ হয়! তাই শাস্ত্রকারগণ সুধীগণকে সাধু কাব্যের—শাস্ত্রনিহিত সত্যের বিকাশপর মনোহর কাব্যের—রচনা করিতে, ও রসগ্রাহী-দিগকে সেই শাস্ত্রনিহিত সত্যের আভাসগ্রহণজন্য, সাধু কাব্যের নিষেবণ করিতে বলিয়াছেন। এখনকার দেশ কাল পাত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, আর্য্য শাস্ত্রকারগণের লক্ষণসম্মতসাধু কাব্যের রচনা ও নিষেবণ এক প্রকার দেশ হইতে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিতেছে।

কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ শাস্ত্রসম্মত সাধুকাব্যের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, আর অপকাব্যের সংখ্যা আজ কাল ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার অপকাব্য-পাঠকের সংখ্যা যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান, তাহা ত বর্ত্তমান দেশকালপাত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। অপ-কাব্যের রচক ও পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সাধুকাব্যের, যে প্রণয়ন ও নিষেবণ ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে,—আর তাহাই যে স্বভাবসম্মত,

তাহা অস্বীকার করিলে, সত্যের অপলাপ করা হইবে। সকলেই জানেন, সুদিন—বসন্তে মদকল কোকিলকুল শ্রুতিহারী কূজন করিতে থাকে; কিন্তু দুর্দ্দিনে—বর্ষাকালে—ভেকেরই শ্রুতিকটু মক মক শব্দের স্ফুরণ হয়,—এবং তখন কোকিলকুল নিঃস্বন হইয়া থাকে। আমরা প্রাচীন সৎকবিদিগের প্রতিষ্ঠিত রসালের আবির্ভাব করিয়া, শুভপবনে জলদজালের অপসরণ করিয়া, চূতরসপায়ী কোকিলকুলের স্বর ফুটাইবার জন্য—কুহুধ্বনি শুনিবার ও শুনাইবার জন্য, ভাষা-শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্য তত্ত্বের—রসাল-রসের—আভাস দিলাম।

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।

রমণীর মন।

কামিনীর কমনীয় কান্তি সুকোমল,
কোটী কোমলতাপূর্ণ কাঞ্চনের খনি ;—
নিথর-নয়ন-নীল নীল উতপল।
বদনে বিরাজমানা ফুল্ল সরোজিনী।
সুন্দর কুন্দের মালা শুভ্র দন্ত পাতি।
নবীন পল্লবদ্বয় অলক্ত অধর।
সরস রসনা সদা সুধার প্রসূতী।
অর্দ্ধস্ফুট পদ্ম পীন পূর্ণ পয়োধর।
সুগোল সুবেল ভুজ মৃণাল মণ্ডিত।
চারু চম্পকের দাম অঙ্গুলীর দল।
সুচারু চিকণ তনু নিন্দি নবনীত।
লাবণ্যে জোছনা রাশি করে চল ঢল।
রমণীর সর্ব্ব অঙ্গ সুকোমল এত!
মন খানা শুধু কেন পাষাণে গঠিত?

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

এক ফোঁটা জল।

সেদোর এবারে সর্ব্বনাশ। কাচ্ছা বাচ্ছা গুলি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মারা যাবে। সেদোর স্ত্রী ঢের বারণ করেছিল যে, মিন্সে এমন কাজ করিস্‌নে। তা সেদো কি কাহারও কথা শোনবার লোক, যখন সেদোর পরিবার দেখ্‌লে যে অবলা কুলবালার কথা রহিল না, তখনও স্বামীকে এক দিন বলিয়াছিল, "গুরুর কথা না শুনলি কানে, প্রাণ যাবে তোর হড়ঁকা টানে।" বাস্তবিক সেই কথা এখন ফলেছে!

সেদো চাষী চিরকালটা পরের চাকরি করে। দিন আনে দিন খায়। এক বেলা ভাত এক বেলা উপবাস। আবার সময়ে সময়ে ঝড় বৃষ্টির দিনে কাজ কামাই হ'লে ছবেলা উপবাস ঘটিত। এইত সেদোর সুখ।

এক দিন বেলা ছুপ্রহর, সেদো মনিবের জমি চসিতেছে। ভয়ানক রৌদ্রের উত্তাপ, সহজ লোকের মাথা গরম হয়, সেদোরত একটু ছিট ছিল। সেদো আপনা আপনি কত কি বকিতে আরম্ভ করিল। বলি, চিরকালটাই কি এক রকমে কাটাব। এত বড় মিন্সে হলুম, চাষের সকল রকম কাজই শিখেছি, তা পরের জন্যে খেটে খেটে কি বুড় হব। বুড় হলেত আর খাট্‌তে পারব না, তখন খাওয়াবে কে? আমার মনিবের কেমন মজা, নিজেত লাঙ্গলে হাতটি দেন্‌না, আমিই সব করি, লাভে হতে তাঁর সম্বৎসরের ধন গোলাজাৎ করেন, বীজের ধান থাকে, জমিদারের খাজনা দেন, আবার ফি বৎসর গিন্নির এক খানা রুপোর গহনা হয়। আর আমার মাগের সেই রুপোর পৈঁচে আর কাঁসার মল। না, আর গোলামি করব না, আজই কাজে জবাব দেব। মাগের গহনা বেচে বিঘে কতক জমি খাজনা করে নেবো, এক বৎসর চাষ করি, মরি-আর-বাঁচি।

সেদো যা বল্লে তাই কল্লে। কাজে জবাব দিয়ে এখন নিজের খাজনা করা জমিতে চাষ কর্‌চে। সেদো এখন স্ত্রীর গুরুবাক্য গ্রাহ্য না করে সর্ব্বস্ব খুইয়ে বিশ বিঘে জমির চাষ আরম্ভ করেছে, সেদোর কপালে সে বৎসর বিস্তর ফসল হইয়াছিল। আশার দ্বিগুণ ফল ফলিয়াছিল। আর হাবার মার (সেদোর স্ত্রীর) সেদোর খোঁটার জ্বালায় ঘর করা দায় হইয়াছিল।

এবার হাবার মার পালা! আকাশে এক ফোঁটা জলের নামটি নাই। সেদোর সোনার ফসল শুকিয়ে গেল। সেদো আর ঘরে আসে না। দিন রাত মাঠেই থাকে। মেয়েটি দুটি দুটি ভাত মাঠে দিয়া আ'সে, সেদো তাই খায় আর আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। "হা ঈশ্বর কল্লে কি!" সর্ব্বদা সেদোর মুখে এই কথা। এখন আর রাত দিন কাঁদিলে কি হ'বে। চোখের জলে কি ফসল হয়, সেদোর যা হচ্ছে তা সেদোই জানে। জমি টুকুর খাজনা দিতে আর লাঙ্গল গরু কিন্‌তে তাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। ঘরে পিত্তল কাঁসার নামটী নাই। সকল গুলিই বেচিতে হইয়াছে, তাই ছাই খেতে পায় না পায়, নিজের ঘর খানিতে পড়ে থাক্‌বে, সেটিও হবার যো নাই। ঘর খানি বাঁধা, এখন খায় কি! যায় কোথা।

সেদো এক পসলা বৃষ্টির জন্য দেবতাগণকে বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়াছে। কত পূজা মানিয়াছে। কিন্তু চাষার কথা শোনে কে। এখন ভাল কথায় কিছু হইল না দেখিয়া সেদোর মুখে বাঁকা বুলি আরম্ভ হইয়াছে। "দেবতারা কি মরেছে, না আকাশে আগুন লেগেছে? তা, না হ'লে এমন দিনে একটু বৃষ্টি নাই কেন। বৃষ্টি হওয়া দূরে থাক্‌ পোড়া আকাশে এক খানা কাল মেঘের দেখা নাই।"

সেদো আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আপনার মনে কত কি বকিতেছে। এখন একখানি মেঘের কোলে বসিয়া এক ফোঁটা বৃষ্টি সেদোর বকাবকি শুনিতেছিল। আর একটী ফোঁটা বৃষ্টি সেইখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অমন একদৃষ্টে কি দেখ্‌চিস্‌

ভাই।” পূর্ব্বের ফোঁটাটি বলিল, “দেখ ভাই একটা মিন্সে আমাদের দিকে চেয়ে আমাদের কি বল্‌চে।” “কই, কই?” “এই চিলের ঝাঁকটা আড়াল করেছে, ঐ দেখ্‌ দেখেচিস্‌?” দেখেছি, সত্যি ভাই মিন্সেটা পাগল, আচ্ছা চুপ কর দেখি শুনি, মিন্সে কি বলে।”

বৃষ্টি ফোঁটা দুটি স্থির হইয়া সেদোর দুঃখের কাহিনী শুনিল। তন্মধ্যে একটী হাসিয়া উঠিল, অপরটী হাসিতে যোগ না দিয়া বলিল, “দেখ ভাই লোকটার কি মর্ম্মান্তিক দুঃখ, এক ফোঁটা জলের জন্য লালায়িত; যদি এক বিন্দু আকাশের জলে লোকটার উপকার হয়, না হয় আমিই যাই।” এই বলিয়া জল বিন্দুটী শূন্য হইতে পড়িবরা উদ্যোগ করিল। অপরটী তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিল, “কর কি? একটা সামান্য চাষার জন্য নিজের প্রাণটি খোয়াবে কেন। চাষা ভারি সেয়ানা, ওকি এক ফোঁটা—মুখে বল্‌চে এক ফোঁটা ইচ্ছা এক পস্‌লা। দাঁড়াও না ছাই, আগে আমার কথাটা শেষ হউক, তখন ইচ্ছা হয় পড়িও। তুমি এক বিন্দু জল বইত নয়, হয়ত তোমাকে নীচে পড়িতে হইবে না, শূন্যেতেই কোন পক্ষী পান করিয়া ফেলিবে। যদি ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে পড়িতে পার, তাহলেও বিপদ। একলা পাইয়া পৃথিবী তোমাকে হরণ করিবে। চাষার কোন উপকারে আসিবে না। যখন আমরা দলবদ্ধ হইয়া যাই, তখন আমাদের অনিষ্ট করে কার সাধ্য। পৃথিবী হরণ করিলে তাহাকে ভেদ করিয়া আমরা সবলে নদী গর্ভে পতিত হই। আবার সূর্য্য মামার লেজটি ধরে নাচিতে নাচিতে স্বর্গে আসি।” ইহার কথা শেষ হইতে না হইতে অপরটি বলিল, “যা বল যা কও, আমি নিশ্চয়ই যাইব। পরোপকারে প্রাণ যায় সেও স্বীকার, মনে কর দেখি ভাই, সামান্য কষ্টে কি অত বড় মিন্সের চোখে জল আসে। আমি চলিলাম।” যেমন বলা, অমনি শূন্য হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে জল বিন্দুটি সেদোর থ্যাবড়া নাকে টপাস্‌ করিয়া পড়িল। জলটুকু আর জমিতে পড়িতে পাইল না, থ্যাবড়া নাক ভিজাইতেই সবটুকু ফুরাইয়া গেল।

সেদো নাকে হাত বুলাইয়া চার পাটী দাঁত বাহির করিয়া ফেলিল। "অ্যাঁ, বৃষ্টি হবার আশা আছে। হাজার হোক পরমেশ্বর আছেন কি না, পোকা মাকড়ের আহার যোগান যিনি, তিনি আর আমাদের দুমুটো খেতে দিবেন না।"

পতিত বৃষ্টি ফোঁটাটির সঙ্গী আকাশে থাকিয়া সেদোর হাসি দেখিল। তাহার মনে মনে ধিক্কার জন্মিল। "কি আশ্চর্য্য, আমার সঙ্গী যা বলিয়াছিল, সব সত্য। আমিও যদি সঙ্গে যাইতাম, নাজানি চাষার আরও কত আনন্দ হইত। আমি এখনও যাইনা কেন। যেমন প্রতিজ্ঞা অম্নি পতন। এ ফোঁটাটি সেদোর মস্তকে পড়িল। সেদো এবার আর মনের আহ্লাদ মনে রাখিতে পারিল না। বগল বাজাইয়া এক লাফ্।

পতিত দুইটি ফোঁটার কথা বার্ত্তা দূর হইতে কতক কতক শুনিতে পাইয়া আর কতকগুলি বৃষ্টিফোঁটা উহাদের নিকট আসিতেছিল; কিন্তু ইতি মধ্যে উহাদিগকে পড়িতে দেখিয়া এবং দুফোঁটা বৃষ্টি পাইয়া চাষার সেই গাল ভরা হাসি দেখিয়া তন্মধ্যে একটী ফোঁটা বলিল, "দেখ দেখ দুফোঁটা জল পাইয়া চাষা কত খুসি, না জানি আমাদের সকলকে পাইলে উহার কতই আনন্দ হইবে, এস আমরাও পড়ি।"

টপা টপ্ টপ্ টপ্ চড়্ চড়্ চড়্ চড়্ শব্দে বৃষ্টিফোঁটাগুলি চাষার ক্ষেত্রের উপর পড়িতে লাগিল। মেঘেরা মহা বিপদে পড়িল। বৃষ্টি শূন্য হইলে তাহাদের গাম্ভীর্য্য থাকে কই। তাহারা সকলে একত্র হইয়া বৃষ্টি নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হুড় মুড় দুড় দুড় গুড় গুড় শব্দে গর্জ্জন করিয়া জলবিন্দু গুলিকে ভয় দেখাইতে লাগিল। কার কথা কে শোনে; দেখিতে দেখিতে ধূমল মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। চারিদিক অন্ধকার। মেঘেরা আপনা আপনি অন্ধকার করিয়া আপনারাই দেখিতে পায় না। কোথা দিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে কিছুই ঠাওরাইতে পারে না। মহা মুস্কিল। বিদ্যুৎ সহচরী আসিয়া আলো ধরিল। পোড়া বাতাসে

কি আলো থাকে। একবার নিবিয়া যায় আবার জ্বলিয়া উঠে। মেঘগুলির পাগ্‌লামি দেখিয়া বৃষ্টিগুলির আরও মজা হইল। তাহারা এদিক ওদিক চারিদিক দিয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপে বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল।

সময়ে জল পাইয়া সে বৎসর বিস্তর ফসল জন্মিল। সেদোর দেনা শোধ গিয়া হাতে দুটাকার সংস্থান হইল। এক বৎসরের মধ্যেই সেদো সাধুচরণ হইল।

পরের উপকার করিতে কিম্বা দেশের হিতসাধন করিতে কখনও বলিও না যে, আমি অতি সামান্য লোক, আমি আবার কাহার কি উপকার করিতে পারি? যদি মনে এরূপ অসদ্ভাবের উদয় হয়, তখনই এই এক ফোঁটা জলের কথা ভাবিও।

সমালোচনা।

সৌরভ। শ্রাবণ, ১ম খণ্ড। ১ম সংখ্যা। এখানি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক শোভাবাজার রাজবাটী হইতে প্রকাশিত হইতেছে। "সৌরভ",—সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ও বি-এ, বি-এল্ উপাধিধারী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু এই মহাশয়ত্রয়ের লেখনীপ্রসূত প্রসূনের সৌরভে পরিপূর্ণ। "সৌরভ" নামক প্রবন্ধে "সৌরভের" উদ্দেশ্য প্রকটিত। তাহাতে বুঝা যায়, "সৌরভ" সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা মেদিনীর বক্ষে সাধারণের সমভাবে সোহাগের সামগ্রী হইবে। মর্ম্ম-ভেদী দীর্ঘশ্বাসের পর একবার "সৌরভ"কে বুকে ধরিলে প্রাণ যুড়াইয়া যাইবে, জীবনের ক্লান্তি দূরে ফেলিবার জন্য অযাচিত আলিঙ্গনে আত্ম-সমর্পণ করিয়া "সৌরভ" স্রোতের তৃণ হইবে। আরও সৌরভ পাঠে এ তাপদগ্ধ মরুভূমিতে রম্য উপবন পাইবে, সাগর গর্জ্জনের ন্যায় কোলাহলের মধ্যে শান্তির উজ্জল রশ্মি দূর-সুখ-স্মৃতির মত মনোহর

দেখিবে, নির্ম্মম বিশ্বগ্রাসী অভিশাপের মধ্যে সকরুণ আশীর্ব্বাদ মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিবে। ঘোর অপবিত্রতায় অজস্র পবিত্রতা, নিবিড় অন্ধকারে অপরিমাণ আলো, পিশাচের নৃত্যভূমি নরকে—দেবালয় অমরাবতী, বর্ত্তমান যুগে প্রতিকৃতি মন্দে—প্রাণ ভাল—দেখিতে পাইবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। "আরও যদি সংসারে থাকিয়া সকল সুখ চাও, অপূর্ণ প্রাণের পূর্ণতা আকিঞ্চন কর, একাধারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ দেখিতে সাধ থাকে, তবে সাহিত্যের "সৌরভ" সেবন কর।—সেই উদ্দেশ্যেই সৌরভের বিকাশ।"—আমরা "সৌরভের" এই মহান্ উদ্দেশ্য পাঠ করিয়া বিশেষ আশ্বাসিত হইয়াছি, কারণ বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে যত পত্র-পত্রিকা দেখিতে পাই, অতি অল্পই এরূপ মহান্ উদ্দেশ্যে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা যেন বঙ্গের কৃতী লেখকগণের লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধে "সৌরভের" উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করে।

এই সংখ্যার "সৌরভে" শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্তের "সমাজ চিত্র" তৃতীয় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী চলিতেছে বেশ। লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক বটে। বিজ্ঞাপন প্রচারিত সংবাদে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা অপেক্ষা যিনি ভাল "সমাজচিত্র" অঙ্কিত করিতে পারিবেন তিনি একখানি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইবেন। তৎপর প্রবন্ধ "সুখ কৈ?" শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি-এ, বিএল্ মহাশয়ের রচনা। "সত্য" ও "কলঙ্ক"—যথাক্রমে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত কবিতাদ্বয়—বেশ হইয়াছে। সম্পাদক লিখিত "গ্রহফল" একটী মাঝারি রকমের প্রবন্ধ। প্রতিবাদ আহ্বান করিতেছেন। সহকারী সম্পাদকের "নক্সা"—বেশ হাস্যোদ্দীপক ও সুন্দর হইয়াছে। "ঝালোর দুহিতা" সম্পাদক প্রণীত উপন্যাস। তৎপরে গিরিশ বাবুর কন্যা-প্রতিম অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী ও শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী রচিত "প্রবাহের রূপান্তর" ও প্রকাশিত "হৃদয়রত্ন" প্রকাশিত হইয়াছে। পদ্য দুইটী মন্দ হয় নাই।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

২য় খণ্ড। } আশ্বিন, ১৩০২ সাল। { ১১শ সংখ্যা

পত্র।

ভাসা'য়ে দিলাম আজ ব্রহ্মপুত্র-জলে
শেষ-স্মৃতি-চিহ্ন তব—পত্র কয়খানি!
দীর্ঘকাল এই ভগ্ন—শূন্য বক্ষঃস্থলে
আছিল আদরে যত্নে—কাঙ্গালের মণি!
জীবনের চিরসাধ, সুখ ধরাতলে,
মরুভূমে মন্দাকিনী—বারি-পিপাসার,
শান্তির প্রলেপ—তাপ-দগ্ধ মর্ম্মস্থলে,
নৈরাশ্য-বিষাক্ত-প্রাণে নির্ঝর সুধার।
ধমনী কলিজা শিরা ছিঁড়ে অই সাথে
দিতে পারিতাম যদি, জুড়া'ত জীবন!
আশালতা ছিঁড়ে গেল, কিন্তু হৃদি-পাতে
এখনো রহিল দাগ—জীয়ন্তে মরণ!
পাষাণ-অন্তরে তবু হায়! হায়! হায়!
শেষ-স্মৃতি-চিহ্ন তব দিলাম গঙ্গায়!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাসি।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কিরণ প্রমোদের পত্র পাইল। কিরণ পড়িল,—

"দিদি! আমি চলিলাম। কোথায় জানি না, আমি আমার হাসি হারাইয়াছি, চিরকাল কাঁদিয়া কাটাইব। আর ইহজন্মে বোধ হয় তোমার সহিত দেখা হইবে না। ইতি—"

তোমার অভাগা প্রমোদ।

কিরণ শয্যা লইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চারি দিন পরে সংবাদ আসিল, তারাপদর পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তারাপদ সেই দিনই রওনা হইল।

আর হাসি? হাসি চিরদুঃখিনী—মাঝে হেমন্তের তরল মেঘের ন্যায়, মরীচিকার চকিত মায়ার ন্যায়—সুখের একটী ক্ষণস্থায়ী, ক্ষীণ আলোক দেখিয়াছিলমাত্র, তাহা পূর্ণস্ফুট না হইতেই নিবিল! হাসি যে আঁধারে ছিল, সেই আঁধারেই রহিল। না, না, তাহাতে একটু কোমল মাধুরী ছিল, তাহাতে যেন কোন ভাবি-সুখের একটী মলিনোজ্জ্বল প্রতিবিম্ব বা সেই মৃদুল প্রতিবিম্বের একটু ক্ষীণ আশা প্রতিবিম্বিত হইত। সে আঁধার ভাল ছিল।

পাঁচ দিনের পর হাসির সংজ্ঞা হইল। এখন আর সে হাসি নয়, প্রভা। এখানে সকলে তাহাকে প্রভা বলিয়া ডাকিত।

প্রভার জ্ঞান হইল। প্রভা অজ্ঞানে বেশ ছিল, জ্ঞান হইয়া দেখিল, তাহার সকল সুখ ফুরাইয়াছে! ভাবিল, কেন বাঁচিলাম—মরিলাম না কেন? হায়! দরিদ্রের কি মরিবারও অধিকার নাই?

প্রভা চিরদুঃখিনী, দুঃখ সহিতেই জন্মিয়াছে, দুঃখ সহিয়া সহিয়া তাহার হৃদয় অসাড় হইয়া গিয়াছিল; কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষের জল ফুরাইয়া গিয়াছিল;—প্রভা কাঁদিল না, মধ্যাহ্ণ আকাশের ন্যায় তাহার নয়ন শুষ্ক, স্থির; প্রদোষ-তিমিরের ন্যায় সেই মলিন মুখে কিসের যেন গভীর ছায়া পড়িয়াছে—রামপ্রসাদ সে মুখ দেখিয়া ভীত হইলেন। সারদা বলিল,—"ভয় কি? তারাপদ বাড়ী এলেই সেরে যাবে এখন।"

পর দিন তারাপদকে পত্র লেখা হইল। উত্তর আসিল, সে এখন তিন মাস আসিতে পারিবে না, সারদার ভয় হইল।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন করিয়া অনেক দিন কাটিল। প্রভা অল্পে অল্পে সারিয়া উঠিল, কিন্তু মুখের সেই কালিমা, নয়নের সেই শূন্যতা দূর হইল না; হাসির হাসি ফুরাইল!

কিরণ আসিল,—কিরণের অস্থিচর্ম্ম-সার! পিতাকে খুব ভৎ র্সনা করিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু ভৎ র্সনা করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, হৃদয়ে ভ্রাতৃশোক উথলিয়া উঠিল, কিরণ প্রমোদের শেষ পত্রখানি পিতার সম্মুখে রাখিল। পিতা পড়িলেন, কাঁদিয়া বলিলেন,—"এত হইবে, জানিতাম না।"

সেই দিন রামপ্রসাদের আগ্রহে প্রমোদের অনুসন্ধানে স্থানে স্থানে লোক প্রেরিত হইল।

কিরণ প্রভার নিকটে গেল; কিরণের সে হাসি নাই। প্রভা কাঁদিয়া কিরণের বুকে মুখ রাখিল, দুই জনে বসিয়া মনের সাধে অনেকক্ষণ কাঁদিল।

প্রভা বলিল, "দিদি! তিনি কোথায়?" এখন আর তাহার লজ্জা নাই। হাসি মরিয়াছে, এখন সে প্রভা।

কিরণ বলিল, "অভাগি! এখনও তোর তা'কে মনে আছে?"

প্রভা কাঁদিয়া ফেলিল।

কিরণ পত্রখানি দিল, প্রভা পড়িতে জানিত, পড়িল। একবার কিরণের মুখপানে চাহিল, সে দৃষ্টিতে কিরণ ভীত হইল, প্রভা

হাসিল, সে হাসি কিরণের ভাল লাগিল না।—প্রভা উঠিল, কিরণ ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথা যাও?"

প্রভা অন্যমনস্কভাবে বলিল,—"না।"

* * *

ধীরে—ধীরে—নীরবে দিনগুলি কাটিতে লাগিল। নিদাঘ-নিশীথের ন্যায় নীরবে দিনগুলি কাটিতে লাগিল—সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারা নাই—আছে, শুধু এক নিবিড়, স্তব্ধ অন্ধকার, প্রভার ক্ষুদ্র হৃদয়টীকে—প্রভার ক্ষীণ জীবনটীকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে! সারদাকে দেখিলে প্রভা শিহরিয়া উঠে, রামপ্রসাদকে দেখিলে প্রভা কাঁপিয়া উঠে, কিরণকে দেখিলে প্রভা অন্যমনা হয়; কিরণের মুখ ঠিক যেন সেই—সেই প্রমোদের মত। মধ্যাহ্নে গাছের কোলে, পাখীর আবেশময়ী করুণ কাকলী, অশ্বথের উদাস ক্রন্দন, প্রভার বড় ভাল লাগে। দীগন্তস্থিত ক্ষুদ্র মেঘ-খণ্ডের পানে প্রভা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, সেটী যেন তাহারই প্রতিচ্ছায়া, যেন তাহারই ন্যায় লক্ষ্যহীন উদাস-জীবন বাহিয়া অনন্তের পানে ভাসিয়া চলিয়াছে। সূর্য্যের উপর দিয়া মেঘ ভাসিয়া যায়, দূরবিস্তৃত প্রশান্ত প্রান্তরের বিশাল হৃদয়ে একটী ক্ষুদ্র ছায়া পড়ে—প্রভা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, যেন সেটী তাহার হৃদয়ের একটী ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব! তাহার মন দূরপ্রান্তর প্রান্তে, মেঘের কোলে কোলে, উদাসভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়, দূর কাননের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া কাহারা গায় "শ্যাম-বিচ্ছেদ জ্বরে, প্রেম-বিচ্ছেদ বিকারে, রাধার প্রাণ গেল—" সেই তপন-পীড়িত মধ্যাহ্নের তাপিত হৃদয়ে বসিয়া প্রভা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে!

* * * *

এদিকে এক মাস পরেই তারাপদর পত্র আসিল, সে শীঘ্র আসিবে। সারদা-মহলে আনন্দের রোল উঠিল!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আজ পূর্ণিমা। রাত্রি প্রায় ১১টা। প্রভা সেই সোপানে বসিয়া আছে। সেই সোপানে—সেই—সে বহু দিনের কথা——প্রভা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল!

পুষ্করিণীর শ্যাম জলে, শ্বেত সোপানে, বৃক্ষের শ্যামল পল্লবে, অমল কুসুমে, পূর্ণচন্দ্রের হিমময় স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না সুপ্ত। লতা, পাতা, ফুল, ফল, জল, স্থল, আকাশ, বাতাস সকলই কি যেন এক অপূর্ব্ব নীরব হিমোজ্জ্বল ঐশীক গাম্ভীর্য্যের প্রশান্ত হৃদয়ে সুপ্ত; শুদ্ধ সেই গভীর সুপ্ত নিশীথের কোলে একটী ক্ষুদ্র হৃদয় জাগ্রত।

প্রভা কাঁদিতেছে, ও ভাবিতেছে—সে কেন জন্মিয়াছিল? জন্মিয়াছিল তো বাঁচিল কেন? বাঁচিল তো প্রমোদকে দেখিল কেন? দেখিল তো ভালবাসিল কেন, ভালবাসিল তো তাহাকে পাইল না কেন, না পাইল তো মরিল না কেন?—"আজ মরিব!" চাঁদের উপর দিয়া একখানি ছোট মেঘ ভাসিয়া গেল, সেই মেঘের নিচে বসিয়া প্রভা প্রতিজ্ঞা করিল—"আজ মরিব!" মাথার উপর দিয়া সাঁই সাঁই করিয়া একটা বাদুর উড়িয়া গেল, প্রভা বলিল,—"আজ মরিব!"

মেঘখণ্ড সরিয়া গেলে, আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিল। প্রভা ভাবিল—চাঁদ কেন হাসে? আমি কাঁদি, না জানি আমার ন্যায় কত অভাগিনী নিশীথে একাকিনী বসিয়া কাঁদে; তবে চাঁদ কেন হাসে? তিনিও না জানি—আহা! কোন্ প্রান্তরে, কোন্ বৃক্ষতলে তিনি একাকী বসিয়া কাঁদি—বসিয়া আছেন। সেখানেও এই চাঁদই হাসিতেছে, এই কিরণই তাঁহার মুখচুম্বন করিতেছে,—হায়! কিরণ যদি কথা কহিত!—আবার ভাবিল—এই জীবন—এই ক্ষুদ্র জীবন, ইহা লইয়াই এত? তাঁহার পবিত্র চরণে এই ছার জীবনটুকুও কি উৎসর্গ করিতে পারিব না?'

ঝিল্লি বলিল,—ছিঃ ছিঃ!

প্রভা একটু কাঁদিল,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষের জল

ফুরাইয়া গিয়াছিল—ভাবিল, ‘তিনি হয় ত আমাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিতেছেন।’

ঝাউ বলিল,—“হুঁ—হুঁ।”

প্রভার যেন অসহ্য হইল, সে কর্ণে অঙ্গুলী দিল। কাণের ভিতর রাবণের চিতা দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল, যেন শত শত জ্বলন্ত জিহ্বা তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল! শত শত অগ্নি-শিখা তাহাকে বেষ্টন করিল; সেই জ্বলন্ত চিতা-বহ্নিমাঝে প্রভা দাঁড়াইয়া পুড়িতে লাগিল!! চারিদিকে ঘোর অন্ধকার—চিতালোকে আলোক নাই, বা সে আলোকে শুদ্ধ অন্ধকার দেখা যায়!!

সহসা তাহার পদনিম্নে সে যেন শীতল সলিলস্পর্শ অনুভব করিল, অগ্নি উপরে উঠিতে লাগিল, সলিল অগ্নির পশ্চাদানুসরণ করিল। ধীরে ধীরে পদতল হইতে জানু, জানু হইতে কটিদেশ, কটি হইতে বক্ষ, বক্ষ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত শীতল হইল। সমস্ত অগ্নি তাহার ললাটে জ্বলিয়া উঠিল!!!

প্রভা চমকিয়া উঠিল, দেখিল চারিদিকে জল,—জলের উপর চাঁদের হিমকিরণ চিক্ চিক্ করিতেছে। প্রভা মনের আবেগে জ্ঞানশূন্য হইয়া কখন অজ্ঞাতসারে পুষ্করিণীজলে নামিয়া পড়িয়াছে! এমনি করিয়াই বুঝি লোকে আত্মহত্যা করে?

প্রভা চমকিয়া উঠিল! দূর হইতে এক মধুর স্বর-লহরী তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল! সে স্বর যেন তাহার চেনা, যেন পূর্ব্বে কোথায় শুনিয়াছিল—কোথায়? মনে পড়িল না। স্বর যত নিকটে আসিতে লাগিল, কথাগুলি ততই স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। সেগুলি যেন কোন ব্যথিত-প্রাণের আকুল-কথা, কোন দলিত-জীবনের উদাস-গাথা। প্রভা শুনিল, সেই স্থিরজ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীতে আবক্ষ-নিমজ্জিতা প্রভা শুনিল, কে গাহিতেছে,——

শ্যাম-রবি বিনে আমার রাইকমল শুকাল জলে,
অকালে ঝরিল কলি সই!
আমার রাইকমল যে বেঁচে নাই—

এ যে প্রমোদের সেই গান, এ যে প্রমোদের স্বর! প্রভার সেই—সেই বহুদিনের কথা মনে পড়িল। যে দিক দিয়া স্বর আসিতেছিল, সেই দিকে চাহিল—দেখিল—কি দেখিল? সেই স্থিরজ্যোৎস্নালোকে চন্দ্রকর-স্নাত পুষ্করিণী-তীরে দাঁড়াইয়া—প্রমোদ! মলিন বেশধারী প্রমোদ!!

প্রভার নয়নসম্মুখে চন্দ্র সহসা নক্ষত্ররূপ ধারণ করিয়া আকাশচ্যুত হইল! শ্বেত কিরণ নীল, নীল হইতে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হইতে নিবিড় কৃষ্ণ; দেখিতে দেখিতে সমস্ত জগৎ তিমিরাচ্ছন্ন হইল!!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যখন জ্ঞান হইল, প্রভা দেখিল, সে একটী কক্ষে কোমল শয্যোপরি শয়ান; পার্শ্বে কিরণ বসিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে চাহিতে দেখিয়া কিরণ বলিল, "ভাগ্যে বোন, আমি তোকে খুঁজতে গেছিনু, নইলে তো তোকে হারাতুম; কেন ভাই মরতে গেছিলি? আত্মহত্যা যে মহাপাপ!"

প্রভা আবার চোখ বুজিল, সেই নিশীথ-স্বর-লহরীর মৃদুল প্রতিধ্বনি তাহার কর্ণে যেন এখনও বাজিতেছিল; সে চক্ষু মুদিল, চক্ষু-পার্শ্ব দিয়া এক বিন্দু জল মুক্তাবিন্দুর ন্যায় সেই শীর্ণ কপালের উপর ঝরিয়া পড়িল,—কিরণ তাহা দেখিল না।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা প্রভার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। সমস্ত রাত্রি জ্বর। পরদিন প্রভা অনবরত প্রলাপ বকিতে লাগিল; প্রলাপে কেবল প্রমোদের নাম। সকলে ভীত হইল। ডাক্তার আসিল, নাড়ী টিপিয়া তাহার মুখ গম্ভীর হইল, বলিল, "বিকার হইয়াছে, বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।" রামপ্রসাদকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিল, "রক্ষা পাইবে না।"

সকলে বাহিরে গেল, শুদ্ধ কিরণ বসিয়া রহিল। কিরণ আর সে কিরণ নাই—কিরণ এখন মেঘে ডুবিয়াছে। তাহার বর্ণ মলিন

হইয়াছে, তাহার নয়নের জ্যোতিঃ নিবিয়া গিয়াছে। জগতে যেটী আপনার বলিতে ছিল, সেটী কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার সকলই আছে, অথচ কিছুই নাই। বিশাল অট্টালিকা, অসংখ্য দাস-দাসী সত্ত্বেও এই বিশাল জগতে তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই। কত অনাথ তাহার অন্নে প্রতিপালিত অথচ তাহাকে দ্বারে দ্বারে এক মুষ্টি অন্নের জন্য না জানি কতই লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে!!—কিরণ কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার হৃদয়ের শোণিতরাশি অশ্রুরাশিতে পরিণত হইল, কিরণ বহুক্ষণ কাঁদিল। ভাবিল—'সেই প্রমোদ' স্নেই ননীর পুত্তলী – না জানি কঠিন ভূমিশয্যায় কত কষ্টই পাইতেছে! কিরণ শয্যা ছাড়িয়া ভূমিতে বসিল। আবার ভাবিল,—'দোষ কাহার?' কাহার জন্য আমার প্রমোদ বিবাগী? হাসি? না না, হাসি সরলা, অবোধ বালিকা। সে শুধু ভাল-বাসিতে জানে, সে ভালবাসিয়াছে, তাহার কোন দোষ নাই। তবে দোষ কাহার? সেই পাপিষ্ঠা, সেই সর্পিনী, সারদার। সে যদি হাসিকে না কাড়িয়া লইত, আমার প্রমোদ ঘরে থাকিয়া সুখী হইত। হায়! সেই পাপিষ্ঠার দোষেই একটী অফুটন্ত কুসুমকলি অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে!' কিরণ উঠিয়া প্রভার মুখচুম্বন করিল, প্রভা শিহরিয়া বলিল, "প্রমোদ।"

কিরণের চোখ ফাটিয়া জল পড়িল; সেই জলে প্রভার মুখ ভাসিয়া গেল। প্রভা বলিল, "ছিঃ, কাঁদিও না প্রমোদ, এ দাসী তোমারই, এ জীবন তোমারই চরণে উৎসর্গ করিব।"

কিরণ মর্ম্মভেদীস্বরে বলিল,—"তাহাই করিতেছ।"

* * * *

পরদিন সন্ধ্যাবেলা প্রভার অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইল। আর আশা নাই,—ডাক্তার আসিয়া ফিরিয়া গেল। গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল! তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

রামপ্রসাদ বহুকষ্টে সকলকে থামাইলেন।

বাহিরে মৃদু মৃদু মেঘগর্জ্জন, জাহ্নবীর তীব্র কল্লোল, সমীরের উদাস মর্ম্মর-প্রবাহ,—ভিতরে কম্পিত দীপালোকের মাঝে মৃত্যুর

ভীষণ ছায়া! একটী নিশ্বাস নাই, সকলেই যেন রুদ্ধনিশ্বাসে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে! টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ ঘড়ি চলিতেছে। তাহার প্রত্যেক আঘাতে নৈশ-নিস্তব্ধতা গভীর হইতে গভীরতর, মৃত্যুর ছায়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে!

প্রভা একবার পাশ ফিরিল, অপেক্ষাকৃত স্পষ্টস্বরে বলিল,—"ঐ—ঐ—গেল—গেল—প্রমো—"

দূর—দূর—বহু দূর হইতে কে গাহিল,——

অকালে ঝরিল কলি সই,
আমার রাই-কমল যে বেঁচে নাই!

কিরণ শিহরিয়া উঠিল! প্রভার মুখের নিকট প্রদীপ আনিল; সেই কম্পিত দীপালোকে কিরণ দেখিল—প্রভা নাই! এই অনন্ত রৌরব-দগ্ধ নিষ্ঠুর জগৎ হইতে দুঃখিনী কোন অদৃষ্ট, অজ্ঞানিত দেশে চলিয়া গিয়াছে! দুঃখিনী বাঁচিয়াছে।

* * * *

সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে প্রভার সৎকার হইতেছিল। নৈশ অন্ধকারের বুক ভেদিয়া কি যেন এক গভীর ভীষণতা নীরবে কাঁদিতেছিল! চিতার আগুন কাঁপিয়া কাঁপিয়া গঙ্গার তরলবক্ষে মৃত্যুর ভীষণ ছায়া নীরবে আঁকিতেছিল!! সেই অস্পষ্ট চিতালোকে, সেই অনন্ত-প্রবাহিণী ভাগীরথী-তীরে আর একটী নীরব নিশ্চলমূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল, সেটী কায়া কি ছায়া কেহই স্থির করিতে পারিল না।

সৎকার হইয়া গেল। সকলে হৃদয়ভেদী "হরিবোল" দিয়া গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেল! সেই গভীর নিশীথে, ভীষণতার বুক ভেদিয়া দূর হইতে কে গাহিল,——

অকালে ঝরিল কলি সই—
আমার রাই-কমল যে বেঁচে নাই!

শেষ।

কিরণের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনমাস যক্ষারোগে ভুগিয়া সেও প্রভার অনুগামিনী হইল। পিতাও শীঘ্র বিদায় লইলেন। সেই বিশাল অট্টালিকা শ্মশানে পরিণত হইল, তারাপদ তাহা বেচিয়া লইল। আর প্রসন্নময়ী? প্রসন্নময়ীর কথা আর কি বলিব?

তাহার পর প্রতিবাসীরা অনেক দিন ভীত-চিত্তে শুনিয়াছে, কে যেন গভীরা রাত্রে পুষ্করিণী-তীরে কাঁদিয়া বেড়ায়, কে যেন জনহীন শ্মশান-সৈকতে রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গাহিয়া বেড়ায়—

অকালে ঝরিল কলি সই,
আমার রাই-কমল যে বেঁচে নাই!

* * *

তাহার পর চারি বৎসর অতীত হইয়াছে। আর কেহ শ্মশান-সৈকতে কাঁদিয়া বেড়ায় না; সে অট্টালিকা নাই, সেই পুষ্করিণী এখন শুষ্ক, আছে শুধু সেই উদ্যান—যেন কিসের বিহনে অনন্তকাল হইতে নীরবে কাঁদিতেছে! *

শ্রীরমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

দুইটী সনেট।



পয়োধর।

যুবতী-পবিত্র-পীন-পূর্ণ পয়োধরে
লাগিয়া রয়েছে শত স্বর্গের সুষমা;
কবিগণ পড়িয়া সে সৌন্দর্য্য ফাঁফরে
করিয়াছে কোটি কোটি কত কি উপমা।

---

* এই গল্পটী একটী সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত—লেখক।

কেহ বলে বক্ষ-সরে সোণার কমল,
অথবা উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গ হিমালয় গিরি,
কেহ কয় বিকশিত কদম্ব যুগল,
অথবা সুপক্ক-স্বর্ণ ডারিম্ব মাধুরী।
বলুক বিভিন্ন কবি যাহা মনে লয়।
আমি কিন্তু মনে মনে করিয়াছি স্থির;
কন্দর্প জগৎযুদ্ধে করিয়া বিজয়
পরিশ্রান্ত, চলে গেছে শ্রান্তির মন্দির।
বিজয় ঘোষণা তা'র হইয়াছে সারা
ন্যুব্জিকৃত আছে সেই বিজয়-টিকারা।

নিষাদিনী।

প্রেমের মৃগয়া-মাঝে নারী নিষাদিনী,
পলকে কাড়িয়া লয় পুরুষের প্রাণ!
কত কি কৌশল জানে সরলা কামিনী,
কোটী জন্মে কার সাধ্য করিবে সন্ধান!
ধরিয়া, প্রেমের বনে নিষাদিনী বেশ,
অব্যর্থ আঁখির ফাঁদ কৌশলে পাতিয়া,
সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে মাতায়ে অশেষ,
পরাণ বাঁধিয়া নেয় বাছিয়া বাছিয়া।
এড়াইতে হাত নাই অযুত আয়াসে!
আজন্ম অক্ষয় প্রাণ আবদ্ধ অধীন!
সতত তাহার মূর্ত্তি ফিরে আশে পাশে,
কে জানে প্রেমের ফাঁদ এত যে কঠিন?
অনন্ত প্রেমের জালে জড়ায়ে মেদিনী,
প্রেমের মৃগয়া করে নারী নিষাদিনী!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

কলিকাতার ইতিহাস।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

পঞ্চম অধ্যায়।

অন্ধকূপ হইতে যে ২৩ জন পুনরায় সূর্য্যের মুখ দেখিয়াছিলেন, হলওয়েল সাহেব তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহারই বর্ণিত বিবরণ দ্বারা অন্ধকূপ ঘটনা জানিতে পারা যায়।

[হলওয়েল সাহেবের বর্ণনাতে (Mr. Holwell's Narrative) জানা যায়, তাঁহারা তৎপর দিন নবাব সেনাপতি মীরমদন কর্ত্তৃক অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়া পরে নবাব কর্ত্তৃক মুক্ত হন।]

সিরাজউদ্দৌলা সহস্র দোষে দোষী হইলেও অন্ধকূপ-হত্যা বা ইংরাজ কয়েদীদের উপর অত্যাচার জন্য দোষী নহেন।

[সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণে দুর্গের বহিস্থিত যে সকল গৃহ নষ্ট হয়, কলিকাতার প্রথম গির্জা (St. John's Church) তাহার মধ্যে একটি।]

সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিয়া, ইহার নাম আলীনগর রাখেন, এবং কয়েকদিন মাত্র এখানে অবস্থিতি করিয়া, আপনার সেনাপতি মাণিকচাঁদকে কয়েকজন মাত্র সৈন্যের সহিত রাখিয়া প্রস্থান করেন।

কলিকাতা আক্রমণের সংবাদ সাত সপ্তাহ পরে মান্দ্রাজে পৌঁছিলে কর্ণেল ক্লাইব ও আড্‌মিরাল ওয়াটসন ৫ খানি রণতরী ও ৫ খানি বাণিজ্যতরীতে ৯০০ ইউরোপীয় এবং ১৫০০ সিপাহী সৈন্য লইয়া ১০ই অক্টোবর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ড্রেক প্রভৃতি এতদিন ফলতায় জাহাজে বাস করিতেছিলেন। ১৫ই ডিসেম্বর ক্লাইব এবং ওয়াটসন্ তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন ও ক্রমে ক্রমে বজবজিয়া, কলিকাতা ও হুগলী অধিকার করিলেন।

কলিকাতায় অতি অল্পমাত্র সৈন্য ছিল, সুতরাং অধিকার করিতে আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। খ্রীঃ ১৭৭৫ অব্দে ২রা জানুয়ারি কলিকাতা পুনরায় অধিকৃত হয়।

[অন্ধকূপ-হত্যার স্মরণার্থ হলওয়েল সাহেব নিজ ব্যয়ে ৫ ফুট উচ্চ একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ (obelisk) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ স্তম্ভ লালদিঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। খৃঃ ১৮৪০ অব্দে মার্কুইস অব হেষ্টিংস্‌এর আদেশে ঐ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।]

নবাব, কলিকাতা প্রভৃতি অধিকারের কথা শুনিয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা সম্রাটদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত, কলিকাতায় একটী দৃঢ়তর দুর্গ নির্ম্মাণ ও টাকশাল স্থাপনের অধিকার প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত নবাব স্বীকার করেন, কলিকাতার আক্রমণে কলিকাতার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া দিবেন।

এই সময়ে বিলাতে ফরাসী ও ইংরাজে যুদ্ধ বাধিয়াছিল, সেই জন্য ক্লাইব চন্দননগরে ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ঐ যুদ্ধ নবাবের অনভিমত হওয়াতে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ফরাসীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহারই ফল পলাসীর যুদ্ধ।

কিন্তু পলাসীর যুদ্ধের ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর কারণ ছিল।

["মীর জাফর আলি খাঁ নামক একব্যক্তি আলিবর্দ্দিন খাঁর দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নবাবের সৈন্যের অধ্যক্ষতা ইহাঁর উপর সমর্পিত ছিল। এক্ষণে (সিরাজউদ্দৌলার) এই সৈনাধ্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মীরজাফর, গোপনে নবাবের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। এই সময়ে জগৎশেঠ মহাতাব রায় মুর্শিদাবাদের দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। কারবারে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। নবাব, মহাতব রায়কে বণিকদিগের নিকট হইতে তিনকোটি টাকা তুলিয়া দিতে বলেন, মহাতাব রায় ইহাতে এই উত্তর করেন যে, এরূপে টাকা তুলিতে গেলে অতিশয় অত্যাচার করা হইবে। নবাব এজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎশেঠ মহাতাব রায়ের অপমান করিলেন।

মহাতাপ রায় এ অপমান অমনি অমনি ভুলিতে পারিলেন না। প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকন্তু ইংরাজদিগের প্ররোচনায় গোপনে তাহাদের সহিত মিশিলেন।”] *

বাস্তবিক জগৎশেঠের ন্যায় ধনকুবের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত না হইলে, ক্লাইব নবাবের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিতেন কি না সন্দেহ।

[কৃষ্ণচন্দ্র চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়,—মিরজাফর, জগৎশেঠ মহাতাব রায়, নবাবের মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ রায়দুর্ল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাণী ভবানী, খোজাবায়েজিদ, বণিক উমীচাঁদ, প্রভৃতি নবাবকে রাজ্যচ্যুত করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং রাণী ভবানী ব্যতীত সকলেই ইংরাজ-পক্ষ অবলম্বন করেন।]

ক্লাবই প্রধান প্রধান দেশীয়দিগকে সহায় পাইয়া, নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কলিকাতার প্রায় ৩৫ ক্রোশ উত্তরে পলাশীর বিস্তীর্ণ আম্রকাননে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্লাইব ১৮৮০ জন ইউরোপীর এবং ২৮৮০ জন সিপাহী সহিত নবাবের ৩৫০০০ পদাতি ও ১৫০০০ অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। এ যুদ্ধে তাঁহার প্রধান ভরসা মীরজাফর। বাস্তবিক মীরজাফর যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকা করিয়া নবাবকে সৈন্য ফিরাইতে না বলিলে, ক্লাইবের পক্ষে পলাশীক্ষেত্রে জয়লাভ করা কঠিন হইত। ইতিতত্ত্ববিদ হণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন,—নবাব যখন প্রাতে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন তখন ক্লাইব, আপনার সৈন্যদিগকে আম্রকাননে লুকাইয়া রক্ষা করেন। তাহার পর যুদ্ধের অবহার হইলে যখন নবাব-সৈন্য আহারের উদ্যোগে ব্যস্ত, তখন তাহাদের শিবির আক্রমণ করিয়া অধিকাংশ সৈন্য নষ্ট করেন। † বাস্তবিক্ এইরূপ কার্য্যই ইংরাজদের ভারতাধিকার কার্য্যে কলঙ্ক রেখা। খৃঃ ১৭৭৫ অব্দের ২৩এ জুন এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়!

* বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত-প্রণীত ভারতের ইতিহাস, ইংরাজ রাজত্ব, ৩১-৩২ পৃষ্ঠা।

† Vide W. W. Hunters Brief History of the Indian People, Page, 116.

[যুদ্ধে নবাবের দুইজন বাঙ্গালী সেনাপতি মাত্র প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। মীরমদন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন, আর সেনাপতি মোহনলাল। ইহাদের নাম পলাশী বৃত্তান্তে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।]

পরাজিত হইয়া সিরাজউদ্দৌলা ফকির বেশে পলায়ন করেন কিন্তু ধৃত হইয়া মীরজাফরের পুত্র মীরনের হস্তে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হয়।

[সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে নবাব করিলে, ইংরাজেরা সিরাজউদ্দৌলার সন্ধির মর্ম্মানুসারে টাকশাল (Mint) স্থাপিত করেন। ১৭৫৭ অব্দের ১৭ই আগষ্ট প্রথম মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত হয়। তখন মুদ্রায় দিল্লীশ্বরের নাম অঙ্কিত থাকিত। সম্রাট চতুর্থ উইলিয়মের সময় হইতেই ইংরাজেরা রাজনামাঙ্কিত মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন।]

খৃঃ ১৭৫৭ অব্দে কলিকাতার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অব্দ। এই অব্দেই বর্ত্তমান দুর্গ আরব্ধ হয়—এই অব্দ হইতেই সকল বিষয়ে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়—পুরাতন কলিকাতা সিরাজের উপদ্রবে একপ্রকার নষ্টই হইয়াছিল। বড়বাজার অঞ্চলের সমস্ত গৃহই নবাবের সৈন্যগণ পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল, নগরের প্রধান প্রধান গৃহ বিশেষতঃ গির্জাটির ধ্বংশাবশেষে দুর্গ মধ্যে একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতার অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই দূরে অরণ্যে পলায়ন করিয়াছিল। নগর পুনঃ-অধিকৃত হইলে প্রায় ৫০,০০০ লোক ফিরিয়া আসিয়াছিল। অনেকে আর ফিরে নাই।

এই সময়ে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা সুন্দর বনের মধ্যে জঙ্গল কাটিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। দক্ষিণাঞ্চলের আদিম অধিবাসী-দিগের মধ্যে এ বিষয়ের বিবরণ পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পলাশীর যুদ্ধের পরেও কলিকাতা অরণ্যে পূর্ণ ছিল। এখন যে গঙ্গা-তীর বাণিজ্য ও বায়ু সেবনের স্থান হইয়াছে, সে সময় তাহা বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। চৌরঙ্গীর তখন নাম গন্ধও হয় নাই, কেবল ইংরাজের

গৌরব ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সবে মাত্র তখন নির্ম্মিত হইতেছে। এক্ষণে যে স্থানে পর্মিট বা কষ্টম হাউস, ঐ স্থানে ইংরাজদিগের পুরাতন দুর্গ ও তাহার সন্নিকটে একটী ছোট খাট ডক্ ছিল, সেই ডকে কোম্পানির বোট প্রভৃতি মেরামত হইত। তখন কলিকাতায় এত ষ্টীমার ছিলনা; জাহাজ কদাচিৎ দেখা যাইত। নানা প্রকার বড় বড় দেশী নৌকায় তখন কোম্পানীর কাজ চলিত। আর এখনকার ন্যায় তখন কলিকাতায় এত ঘাটও ছিল না, পুরাতন কেল্লার সম্মুখে একটী এবং আরও দুই একটী সামান্য ঘাট মাত্র ছিল। কেল্লার ঘাটে কোম্পানীর লোকজন নামা উঠা করিত।

১৭৫৬অব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার কলিকাতা আক্রমণে কলিকাতা-বাসীদের কিছু লাভ হইয়াছিল। নবাবের কলিকাতা আক্রমণে কলিকাতা বাসীদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে বলিয়া, তিনি সকল শ্রেণীর লোক-কেই সেই ক্ষতি পূরণের জন্য বিস্তর টাকা ধরিয়া দেন, সেই টাকায়, ইংরেজদেরত কথাই নাই, অনেক বাঙ্গালী নূতন ঘর বাড়ী প্রস্তুত করেন; অনেকের জরাজীর্ণ আবাস ও কুঁড়ে ঘর এই দুষ্ট সিরাজউদ্দৌলার আক্র-মণের ফলে নূতন আকার ধারণ করে। আর এই উনবিংশতি শতাব্দীতে ইংরাজ বাহাদুরের কল্যাণে মিসর আলেকজান্দ্রিয়া সহর আর একরূপ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে! যাহা হউক, নবাব সিরাজ উদ্দৌলার আক্র-মণফলে কলিকাতার শ্রী একটু ফিরিয়া যায়, বর্ত্তমান ইংরাজ টোলার এই উপলক্ষে প্রথম সূত্রপাত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন চৌরঙ্গীর নাম গন্ধও ছিল না; ইংরাজ দোকানদারেরা রাধাবাজার, চীনেবাজার, মুরগী হাটা ও আর্ম্মানি গির্জ্জার নিকট দোকান পাট করিত, এখন ইংরাজেরা, লালদিঘি, চৌরঙ্গী ও ধর্ম্মতলা অধিকার করায় বাঙ্গালীরা এই সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। বড় বড় কর্ম্মচারিরা তখন লালবাজারবাসী ছিলেন, এই স্থান তখন কলিকাতার মধ্যে 'ভদ্রপল্লী' বলিয়া সম্মান লাভ করিত।

পুরাতন দুর্গের উত্তরাংশে কাপড়ের গুদাম ও অপরাপর অংশে কর্ম্ম-চারী লোকজনেরা বাস করিত। চৌরঙ্গী তখন বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, কেবল কলিঙ্গায় একটি ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। গড়ের মাঠের কতকটায় বন

জঙ্গল আর কতকটা আবাদী জমি ছিল, তাহার মধ্যে দুই চারিখান কুঁড়ে ঘর দৃষ্ট হইত। এই সকলের মধ্য দিয়া একটি মাত্র রাস্তা গিয়াছিল, এই রাস্তা দিয়া তখন আলিপুর ও খিদিরপুরে যাইতে হইত। আলিপুর খিদিরপুর তখন যৎসামান্য গ্রাম মাত্র,—উপনগরের সম্মান লাভ তখন ঘটেনাই। এখন আদি গঙ্গা পার হইয়া এই দুই গ্রামে যাইবার নিমিত্ত যেরূপ কয়েকটি বৃহৎ সুবিস্তৃত লৌহ সেতু রহিয়াছে, তখন দুইটি অপ্রশস্ত কাষ্ঠের সেতু ইহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছিল মাত্র। কলিকাতায় এখনকার মত তখন যেখানে সেখানে ব্রুম, বগী, ফিটনের হুড়াহুড়ি ছিল না; ভাল গাড়ীর মধ্যে ক্লাইবের একখানি এবং ওয়াট সাহেবের একখানি সবেমাত্র দুই খানি গাড়ী ছিল, তবে অল্পদিনের মধ্যেই সংখ্যা, বাড়িতে লাগিল বটে। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বড় একটা কেহ গাড়ী ঘোড়ার ধার ধারিত না। বড় লোকেরা পাল্কিতে করিয়া যাতায়াত করিতেন, আর বাঙ্গালীটোলায় তখন গাড়ী চড়িবারও সুবিধা ছিল না। পাড়ায় পাড়ায় বন জঙ্গল আর পুকুর, বড় রাস্তার মধ্যে সবে চিৎপুর রোড, সুতরাং বাবুরা ভাল গাড়ী চড়ে, কি কর্‌বেন? কলিকাতার উত্তর পল্লী কয়টির বা বাঙ্গালীটোলার এখনকার তুলনায় তখন লোক সংখ্যা সামান্য হইলেও অধিবাসীর সংখ্যা বড় মন্দ ছিল না; কোম্পানীর চাকরীতে রোজগার থাকায়, কলিকাতায় লোক সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল।

যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে সে সময় কলিকাতার স্বাস্থ্য বড় মন্দ ছিল; জ্বর, পালাজ্বর, পিলে, উদরাময় প্রভৃতি রোগগুলি তখন কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী সকলের নিত্য সহচর ছিল। এখন যেমন একজন ইংরাজ আপন অত্যাচারের ভোগে ভুগিয়া মরিলেও তাহায় খবর পার্লীমেণ্ট পর্য্যন্ত যায়, ও কথায় কথায় মিউনিসিপালিটী ও গ্যাস কোম্পানীর তাহার জবাব দিহি করিতে হয়, তখন এত ঝঞ্ঝাট কাহাকেও পোহাইতে হইত না, অথচ প্রতি বৎসর আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে (অর্থাৎ বর্ষা ও শীতকালে) বার ঘণ্টার মধ্যেই অনেক ইংরাজকে লীলা সম্বরণ করিতে হইত। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে বৎসর কলিকাতা আক্রমণ করেন, সে বৎসর মেজর ফিলপেট্রিক দুই শত চল্লিশ জন ইংরাজ

সৈনিক লইয়া ফলতায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেখানে এই কয় মাসের মধ্যে দুই শত দশ জন সংক্রামক জ্বরে প্রাণত্যাগ করে!

১৬৮৯ সালের সংক্রামক জ্বরে আগষ্ট হইতে জানুয়ারী মাসের মধ্যে বার শত ইংরাজঅধিবাসির মধ্যে চারি শত ষাট জনকে কবরস্থ করিতে হয়। ১৭৬২, ১৭৬৮ এবং ১৭৭০ সালে কলিকাতার জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত বৎসর জ্বর ও আমাশয় রোগে আশী হাজার বাঙ্গালী ও দেড় হাজার ইংরাজের কলিকাতা প্রাপ্তি হইয়াছিল। মনে করুন এখনকার তুলনায় ইংরাজ সংখ্যা কত অল্প ছিল। কেবল কলিকাতাতেই যে ইংরেজদিগকে এইরূপ বিনা বাক্যব্যয়ে প্রাণ হারাইতে হইত তাহা নহে, জলপথেও প্রভুদের পরিত্রাণ ছিলনা; ভাল বৎসরেই প্রত্যেক জাহাজের প্রায় সিকি লোককে ডায়মণ্ডহারবারে গঙ্গালাভ করিতে হইত। কলিকাতার মিউনিসিপালটী সৃষ্টি হইয়া মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়াছে তাই সাহেবদিগের মিউনিসিপালিটিকে লইয়া আজকাল এত আবদার বাড়িয়াছে ও কথায় কথায় মিউনিসিপালিটীর উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা ঝাল ঝাড়িয়া থাকেন।

মৃত্যু সংখ্যার ন্যায় তখনকার কলিকাতায় আগুণ লাগার সংখ্যাও বড় বাড়াবাড়ী ছিল। প্রতি বৎসরেই বিস্তর গৃহ অগ্নিতে ছারখার হইয়া যাইত। তন্মধ্যে ১৭৮০ সালের ২৪শে মার্চ্চ শুক্রবার দিবসে কলিকাতার যেরূপ অগ্নিকাণ্ড হয়, সেরূপ অগ্নিকাণ্ড সমস্ত বাঙ্গলায় পরবর্ত্তী শত বর্ষের মধ্যে হইয়াছে কি না সন্দেহ। উক্ত দিবস বহুবাজারে প্রথম আগুণ লাগিয়া জানবাজার ও কলিঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অর্দ্ধ ক্রোশাধিক পথে হাজার গৃহ ধ্বংশ করে। এই অগ্নিকাণ্ডে কত লোক পুড়িয়া মরে তাহার সংখ্যা নাই, তবে এই আগুণের ধূঁয়াতে এক শত নব্বই জন লোকের শ্বাসবদ্ধ হইয়া মরিরা পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। এই বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে কলিকাতায় অনেক লোক নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, আবার এই অগ্নিকাণ্ডের কথা শেষ হইতে না হইতেই এপ্রেল মাসে উহার নিকট পুনরায় এক ভয়ানক আগুণ লাগে। এই সকলের দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রাচীন কলিকাতাবাসিগণ কতদূর নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করিতেন!

ইংরাজদিগের কলিকাতায় উপনিবেশ সংস্থাপনের প্রথম অবস্থায় পুলিস আদালত ছিল না। তখন মেয়র কোর্ট্ বলিয়া এক রকম আদালত ছিল। ১৭২১ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এই আদালত সংস্থাপন করেন। জজ মাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে মেয়র অল্‌ডারম্যানেরা তখন বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। এই সকল বিচার কার্য্য বড় চমৎকার ছিল; "জোর যার মুলুক তার" "টাকা যার জয় তার" এই এই প্রণালীতে বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইত।

প্রাচীন কলিকাতায় হিন্দুধর্ম্মের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা লিখিতে গেলে বড় গোলে পড়িতে হয়। সাহেবেরা আমাদের দেশের সকল সময়ের ইতিহাস লেখক, বাঙ্গালী বাবুরা এ সকল বাজে কাজের ধার ধারেন না; আবার সাহেব দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বেশী করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিশনারি, সুতরাং তাঁহাদের লেখায় নিন্দা ভিন্ন প্রংশসা খুঁজিয়া বাহির করিবার যো নাই; তবে আমরা এই নিন্দার মধ্য হইতে এইটুকু ছাঁকিয়া লইতে পারি যে, তখনকার হিন্দুয়ানীতে ভেল চড়ে নাই, ভণ্ডামী, দোকানদারী করিবার লোক তখনও জন্মায় নাই, আর হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্র বলিয়া তখন কেহ দাবী দাওয়া করিত না, সকলে সরল বিশ্বাসের সহিত হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম রক্ষা ও ক্রিয়া কাণ্ড পালন করিত। কারনওার সাহেবের লেখায় বোধ হয় বৈষ্ণব অপেক্ষা শাক্তের প্রাদুর্ভাব তখন যেন কিছু বেশী ছিল; তাঁহার লেখার মধ্যে চিতপুরে ও কালিঘাটে নরবলির কথা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই নরবলির সংখ্যাও যে বড় মন্দ ছিল না,—তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বলি গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইত। সতীদাহ, শিশু সন্তান গঙ্গায় নিক্ষেপ ও অন্তর্জ্জলির তখন বড় ধুম ছিল। দশহরা এবং পৌষ সংক্রান্তির দিন গঙ্গায় শিশু সন্তান নিঃক্ষেপের প্রশস্ত দিন ছিল। আমরা চিরকাল "সতী দাহের" কথাই শুনিয়া আসিয়াছি, অনেককেই যে জোর করিয়া নিষ্ঠুরভাবে 'দাহ' করা হইত,—আমরা বারবার সাহেবদের মুখে ইহাই শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কারনওার সাহেবের

লেখায় আমরা দেখিতে পাইলাম, কোন কোন বিধবা স্ত্রী স্বামীর অনুগমন না করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গঙ্গাতীরে যাইয়া বসিয়া থাকিত, পরে জোয়ারের স্রোতে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। বোধ হয় যাহাদের স্বামীর বিদেশে মৃত্যু হইত তাহারা এই প্রকার করিত। যাহাহউক, সতীদাহর মধ্যে নিষ্ঠুরতা থাকিলেও সাহেবরা সতীদাহ প্রথাটাকে হিন্দু রমণীর অবরোধ প্রথার ন্যায় ভীষণভাবে বর্ণনা দ্বারা হিন্দু হৃদয়ের যতটা নিষ্ঠুরতা, নির্দ্দয়তা ও পিশাচ ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন, হিন্দু পুরুষেরা যে ঠিক সেই ভাবে পরিচালিত হইয়া কাজ করিতেন, শেষোক্ত ঘটনার দ্বারা ঠিক তাহা বোধ হয় না, বরং অনেক সতী স্ত্রীলোক যে স্বামীর মৃত্যুতে ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্ম বিসর্জ্জন করিতেন— গঙ্গাতীরে বসিয়া দেহ ত্যাগ করার ঘটনায় তাহাই বিশেষ প্রমাণ হইতেছে।

[ক্রমশঃ]

শৈশব সঙ্গী।

বুঝি নাই বলে, শৈশব সময়ে,
খেলিনু তাহারি সনে;
ভাবি নাই আগে, দরিদ্র হইলে
কেহই রাখে না মনে।
কে জানিত বল, শৈশবের সুখ
মরমে গাঁথিয়া রয়;
কোন আশা তা'র, আঁধার জীবনে
কভু পূরিবার নয়।
শৈশব সরল, কুসুমিত পথে
হাসিয়ে ভুলায় যেই;
ভবিষ্যত পথে, ভাঙ্গি হৃদি খানি
কে জানে কাঁদাবে সেই।

ধুলা মাটী ল'য়ে ছেলে খেলা ব'লে
বাঁধিয়ে ধুলার ঘর;
কতনা যতনে, বসায়ে তথায়
বসিল হৃদয় পর!
হরি! হরি! আজু, সে দিনের কথা
এ হৃদে রেখেছি লিখে;
রেখে ছিল সেও, আজ গেছে ভুলে
সকলে ভুলিতে দেখে!!
কেমন হৃদয়! এমনি পাষাণ
ভুলায়ে ভুলিয়া যায়;
বিদলিত হৃদি, ঝরে অবিরাম
তবু না ফিরিয়া চায়।

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

সমালোচনা।

"বাসনা"—ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কতিপয় সুলেখক ইহার পৃষ্ঠ-পোষণ করিতেছেন। আমরা বাসনার উন্নতি দেখিয়া পরম সুখী হইতেছি।

"দারোগার দপ্তর"—চলিতেছে বেশ। দপ্তরের মুন্সি বেশ মুন্সিআনা দেখাইতেছেন।

সৌরভ—ভাদ্র। পূর্ব্বের ন্যায় এখানিও মন্দ হয় নাই। সহকারী সম্পাদকের "সমাজ চিত্র" বেশ চলিতেছে। "ঝালোয়ায় দুহিতা" সম্পাদক মহাশয়ের রচনা, সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। "সাধন-গুরু" এটীও সম্পাদকের রচনা। "বাসনা বিসর্জ্জন" শ্রীযুক্ত প্রথম নাথ বসু বিএ, বি-এল্ মহাশয়ের একটী উচ্ছ্বাস। মন্দ হয় নাই। "বাসনা" ও "অশ্রু" যথাক্রমে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের কবিতাদ্বয় বেশ হইয়াছে! সহকারী সম্পাদকের "স্বার্থ ও সংসার" যতটুকু বাহির হইয়াছে ততটুকু সুন্দর হইয়াছে। তৎপরে শ্রীমতি বিনোদিনী ও শ্রীমতি তারাসুন্দরী রচিত "অবসাদ" ও "কুসুম ও ভ্রমর" নামক চলনসহি কবিতাদ্বয় ভাদ্রের "সৌরভ" শেষ হইয়াছে। এবার সৌরভের আবরণে একখানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। ছবিখানি পত্রোপযোগী ও ভাল হয় নাই।

আধ্যাত্মিক আগমনী—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দে প্রণীত। এখানি একখানি অতি ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ। গ্রন্থকার নূতন কবি। কবিতা পড়িয়া গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা করা যায়।

অনুবাদিকা—১৮০৬ সালের Entrance Courseএর পদ্যাংশের বঙ্গানুবাদ। শ্রীনিরারণ চন্দ্র দে কর্ত্তৃক অনুবাদিত। বঙ্গানুবাদ মন্দ হয় নাই। তবে ইংরাজি হইতে অবিকল বঙ্গানুবাদ যেমন "কট-মট" দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেও তাহার অভাব নাই। ইহার মূল্য দুই আনা মাত্র।

বিদ্যাসাগর—বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। ইহার বিস্তৃত সমালোচনা আগামীবারে প্রকাশিত হইবে।

অভিনয় সমালোচনা।

ফুলশয্যা—অনেক দিন পরে আমরা জনৈক রঙ্গমঞ্চবিশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইতে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্ ইহার প্রণেতা। এমারল্ড রঙ্গমঞ্চে ইহা অভিনীত হইতেছে। নাটক খানির ভাষা ও ভাব অতি সুন্দর, কিন্তু থিয়েটার দর্শক সাধারণের পক্ষে তাহা একটু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ তাহার মোটেই ভাবগ্রহণ করিতেও পারেন নাই বলিয়া বোধ হয়। যাহাহউক মোটের উপর অভিনয় মন্দ হয় নাই। গুরুদেবরূপী শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, বীণা, তারা, প্রভৃতির অভিনয় বেশ হইয়াছিল।

বীণাপাণি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে॥"

২য় খণ্ড। } কার্ত্তিক, ১৩০২ সাল। { ১২শ সংখ্যা

অম্বর-রাজ মানসিংহ।

যে বীরপ্রসবিনী রাজপুতনার বীরত্ব-কাহিনী-কীর্ত্তনে কবিকুল আজিও মুক্তকণ্ঠ, যাহার বীরাঙ্গনার বিপুল জহর-যজ্ঞে রমণীর রমণীয় তেজোগর্ব্ব স্বর্ণ অক্ষরে খোদিত, যাহার কীর্ত্তিমেখলায় বসুধা বেষ্টিত, অম্বার রাজ্য সেই রাজপুতানার অন্তর্গত। এই রাজ্যের অধিবাসী রাজপুতগণ কোশলাধিপ রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুশের বংশোদ্ভব বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের অসীম সাহস ও ক্ষত্রোচিত বীরদর্পের ভূয়োনিদর্শন দৃষ্টে এই পরিচয়ের সম্যক্ সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

দিল্লীর বাদসাহ হুমায়ুনের সমকালবর্ত্তী অত্রত্য রাজা বাহারমলের সময়েই এই রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করে। বাহারমলের বিপুল বিক্রমের পরিচয় পাইয়াই বাদসাহ হুমায়ুন মোগলরাজ্যকে সুদৃঢ় করিবার জন্য এই রাজপুতকেশরীকে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করেন এবং ইহাকে পাঁচহাজারীর মন্‌সব ও রাজা উপাধি দান করেন। এই সময় হইতেই কিন্তু প্রকারান্তরে অম্বার রাজ্যের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইল, সখ্যতাসূত্রে বশ্যতা আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহারমল

মোগলরাজ্যের হিতৈষী হইয়া প্রাণপণে দিল্লীশ্বরের হিতসাধনে তৎপর হইলেন, দিল্লীশ্বরও মিত্রোচিত ব্যবহারে তদীয় সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন!

বাদসাহ হুমায়ুনের পরলোক প্রাপ্তির পর, তদীয় পুত্র মহামতি আক্‌বার দিল্লির সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া এই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত রাজপুতজাতিকে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সেই বন্ধুতা-বন্ধন আরও দৃঢ়তর করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার চেষ্টা অনেকাংশে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। এই কৌশল অবলম্বন করিয়াই তিনি মোগল-সম্রাজ্যের চরম উন্নতি সাধন করিয়া শান্তির সুবিমল সুখ উপভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। অধিকাংশ রাজপুতবংশই মোগলবাদসাহ-গণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া মোগলরাজ্যের প্রতি-কুলাচরণ করিতেন না; প্রত্যুত প্রাণপণে হিতসাধনেই তৎপর থাকিতেন। চিতোরের মহারাণার বংশধরগণ এই অনার্য্য-সম্বন্ধ স্থাপনে কখনই স্বীকৃত হন নাই, অধিকন্তু যে সকল রাজপুত, মোগলবংশে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয়কুল কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, চিতোরের রাণা তাঁহাদিগকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত আদান প্রদান বা ভোক্ষ্যভোজনাদি কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে মহারাণার বংশ দিল্লীশ্বরের কোপাগ্নিতে পতিত হইলেও স্বজাতি সমাজে জাতীয় মান মর্য্যাদা অব্যাহত রাখিয়া বিলক্ষণ গৌরবান্বিত হইয়া রহিলেন।

অম্বররাজ বাহারমলের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ভগবান দাস অম্বর-রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনিও পিতার ন্যায় বাদসাহের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া ঐ পাঁচহাজারীর মুন্‌সবদার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই ভগবান দাসই প্রথমে মোগলবংশে কন্যা সম্প্রদান করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ভগবান দাসের এক কন্যার সহিত সম্রাট হুমায়ুনের বিবাহ হয় এবং তিনি পরে আর এক কন্যাকে যুবরাজ সেলিমের হস্তে অর্পণ করেন। এই শেষোক্ত পরিণয়ের ফল—খুশ্রু।

বাহারমলের চারি পুত্র—ভগবান দাস, স্থরথসিং, মধুসিং ও জগৎসিং। ভগবান দাসের মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগৎসিংহের পুত্র মানসিংহই তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। মানসিংহ ভগবান দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র অথচ পোষ্যপুত্র; নিজের সন্তানাদি না থাকায় তিনি বোধ হয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাদসাহকুলে কন্যাসম্প্রদান করিয়া ভগবান দাস বাদসাহ-সরকারে যথেষ্ট খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও যশ, মান লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা মানসিংহও সেই সমস্তের উত্তরাধিকারী হইলেন। ইনি মহাত্মা আকবার সাহের দক্ষিণ হস্ত ও মোগলসাম্রাজ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ইহারই যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায় ও বল-বিক্রমে আক্‌বারসাহ নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাসাদের রমণীয় রত্নরাজি বিভূষিত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিয়া "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হইয়া গিয়াছেন। সম্পদে, বিপদে, জলে-স্থলে, রণে, বনে এই মানসিংহই ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিয়া মোগলরাজ্যের সৌভাগ্য-সূর্য্যকে মধ্যগগনে স্থাপন করিয়া বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। এই এক মানসিংহই আক্‌বার সাহের মন্ত্রনায় মন্ত্রী, যুদ্ধে সেনাপতি ও আমোদে হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। ইহারই বাহুবলে তিনি অনেক স্থান মোগলরাজ্যভুক্ত করিয়া রাজ্যের আয়তন অনেকাংশে বর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহারই অমিত বিক্রমে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও কাবুলের প্রচণ্ড বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

আক্‌বার বাদসাহও এই পরম হিতৈষী রাজপুত-কেশরীকে যথেষ্ট সম্মাননা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। এই মানসিংহের অনুরোধে ইহার মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্যই সম্রাট্‌ চিরস্মরণীয় হলদিঘাটের বিরাট আহবে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ সোণাপুর জয় করিয়া প্রত্যাগমনকালীন কমলমীরে রাজা প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হন। প্রতাপসিংহও তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে উদয়সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অম্বর-রাজের

সম্বর্দ্ধনা করেন। উভয়ের সাক্ষাতে কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর অম্বর-রাজের আহারাদির আয়োজন হইল। আহার সময়ে কিন্তু রাজা পীড়ার ভান করিয়া মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন না। চতুর মানসিংহ বুঝিলেন যে,—'যবনবংশে কন্যাসম্প্রদান জন্য অবজ্ঞা বশতঃ প্রতাপ তাঁহার সহিত ভোজন করিলেন না।' অপমানে, ক্রোধে বীর-সিংহ মানসিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং ভোজন না করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, যাইবার সময় সদর্পে বলিয়া গেলেন,—"যদি আমি রাণার এই তেজোগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার নাম 'মানসিংহ' নহে।" তাঁহার প্রস্থানের পর ভোজন পাত্রাদি পবিত্র গঙ্গোদকে পরিধৌত হইল।

কথাটা অবশ্যই আকবর বাদসাহের কর্ণে উঠিল। প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, পরমাত্মীয় রাজা মান-সিংহের ঈদৃশ অপমানে বাদসাহ ক্রোধে অধীর হইয়া রাণার দর্প খর্ব্ব করিবার জন্য সমর সজ্জার আদেশ প্রদান করিলেন। যথা-কালে অগণ্য রাজপুত ও যবন সৈন্য হল্‌দিঘাটের গিরিশঙ্কটে সমবেত হইল। একদিকে সুসজ্জিত মাতঙ্গপৃষ্ঠে স্বয়ং যুবরাজ সেলিম ও প্রতিহিংসা লোলুপ রাজা মানসিংহ, অন্যদিকে চৈতক অশ্বা-রোহণে কালান্তক যমসদৃশ রাণা প্রতাপ সিংহ। উভয় দলের ভীষণ রণবাদ্যের ঘোর নিনাদে সৈন্যদলের হুঙ্কার রবে, অশ্বের হ্রেষারবে মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনিতে ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় আরাবলী শৈলশ্রেণী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রতাপ সিংহ প্রমুখ রাজপুত বীরগণ, "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমির রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রতাপের ভীষণ বর্ষার আঘাতে অগণ্য যবন সৈন্য ধরাশায়ী হইল। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বর্ষার অব্যর্থ লক্ষ্য ভাবীসম্রাট সেলিমের উপর পতিত হইল, কিন্তু বাদসাহের সৌভাগ্যবলে বর্ষা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বাদসাহের প্রাণাধিকের প্রাণরক্ষা হইল।

রাজপুত সেনা অমিত-তেজে যবনসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল, কিন্তু অধিকক্ষণ অগণ্য যবন সৈন্যের প্রবল বেগ সহ্য করিতে

পারিল না। প্রতাপ ও অগত্যা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইলেন। চিতোরের রাজলক্ষ্মী যবনের অঙ্কশায়িনী হইলেন (খ্রীঃ ১৫৭৬)।

অসংখ্য জ্ঞাতিবধে স্বজাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া, দারুণ প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া ক্ষত্রিয়াধম মানসিংহ পরম আহ্লাদে যবন প্রাসাদে বসিয়া যবনপ্রসাদভোগ করিতে লাগিলেন, আর বীরসিংহ প্রতাপ সিংহ সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়া চিতোরের উদ্ধারসাধনরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার উদ্‌যাপনের আয়োজনে বদ্ধ পরিকর হইলেন।

এই সময়ে উড়িষ্যায় প্রবল বিদ্রোহ-বার্ত্তা দিল্লিতে আসিয়া পৌঁছিল। দিল্লীশ্বর প্রিয়সুহৃদ্ মানসিংহকে সেই বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। মানসিংহ উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমন করিয়া প্রত্যাগত হইতে না হইতেই কাবুলে প্রচণ্ড বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এখানেও বাদসাহ মানসিংহকে পাঠাইতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু রাজপুত রাজ সিন্ধুনদীর পর-পার অবস্থিত আটক্ নগর উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুর নিষিদ্ধ দেশে যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। বাদসাহ বিষম ফাঁপরে পড়িলেন, কারণ তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, কাবুলের সেই দাবাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে মানসিংহ ব্যতীত আর কেহই সমর্থ হইবেন না। তিনি অম্বর-রাজকে নানাবিধ যুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি অম্বর-রাজকে যে হিন্দী কবিতাটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল——

"সব্ হ্যায় ভূম্ গোপল্‌কা
জিস্ মে আটক্ কহা,
জিস্‌কা মন্ মন্ আটক্ হ্যায়
সোহি আটক হোগা॥"

অম্বার-রাজ এই শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াই একবারে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং অবিলম্বে তথায় গমন করতঃ কাবুলের বিদ্রোহ বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দিল্লিতে প্রত্যাগত হইলেন।

হিমানি মণ্ডিত শৈলমালা পরিশোভিত সুদূর আফগান প্রদেশের

পার্ব্বত্যপথে বিচরণ করার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আবার শস্যশ্যামলা, সুজলা, সুফলা বঙ্গের সমতল ভূমিতে পদার্পণ করিতে হইল। এই সময়ে পাঠান জায়গিরদারগণ কত্‌লু খাঁর অধীনে বঙ্গে নিদারুণ বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বালিত করিল। মানসিংহ সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সসৈন্যে বঙ্গে আগমন পূর্ব্বক শান্তিস্থাপন করিয়া আগমহলকে "রাজমহল" নাম দিয়া, তথায় রাজধানী স্থাপন করতঃ বসতি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বঙ্গের "বারভূঁইয়া" জমীদারগণের প্রবল অত্যাচারের কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মালিক, বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভূয়ালের ফজল্‌ গাজী, খিজির পুরের ঈশা খাঁ, সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ, পরগণে চাঁদপ্রতাপের চাঁদ গাজী, পুঁটীয়ার রাজা, তাহির পুরের রাজা এবং দিনাজ পুরের রাজা এই বারজন প্রবল পরাক্রান্ত জমীদার "বারভূঁইয়া" আখ্যাধারী ছিলেন। ইহাদের সৈন্য, গড় প্রভৃতি যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন ছিল। সময়ে সময়ে ইঁহারা প্রজাবর্গের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিতেন। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের নিদারুণ অত্যাচারের বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মানসিংহ সসৈন্যে পূর্ব্ব বঙ্গে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তাঁহার সৈন্যদল বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণনগরের রাজবংশের আদি পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার তৎকালে বর্দ্ধমানে "কাননগু" পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার বুদ্ধি-মত্তা ও মন্ত্রণা-কৌশলে রাজা মানসিংহের বিস্তর উপকার সাধিত হইল। ইনি প্রাণপণে মানসিংহের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির সময় ভবানন্দের সাহায্য না পাইলে বোধ হয় সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইত। প্রতাপাদিত্যকে নিহত করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন কালে অম্বর-রাজ এই মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, তথায় বাদসাহের সরকারে ভবানন্দ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। বাদসাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে

তাঁহাকে রাজা উপাধি ও নবদ্বীপ প্রভৃতি চৌদ্দ পরগণার জমীদারী প্রদান করেন। কৃষ্ণনগর, মাটীয়ারি, শিবনিবাস, গঙ্গাবাস প্রভৃতি গ্রামে এই রাজবংশের রাজপ্রাসাদ আছে।

প্রতাপাদিত্যের বধ সাধন করিয়া মানসিংহ আগমহলের রাজ প্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন করিলেন। এই সময়ে তিনি কুচবিহারের তদানিন্তন রাজার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া কিয়ৎকাল তদীয় সহবাসে শান্তিময় বঙ্গভূমে রাজমহল প্রাসাদে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু এ সুখ-শান্তি ভোগকরা অধিক দিন তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। সত্বরেই বাদসাহ কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য-জয়ের অভিযানে আদিষ্ট হইয়া পুত্র জগৎ সিংহকে রাজমহলে রাখিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে হইল। কিয়ৎকাল পরে জগৎসিংহ ইহলোক ত্যাগ করিলে মানসিংহকে আবার বঙ্গে আসিতে হইল, কিন্তু পুত্রশোকে তাঁহার দেহ মন অবসন্ন হওয়ায় কিয়ৎকাল পরেই তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগ্রানগরীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মানসিংহ দিল্লিশ্বরের পরম হিতৈষী হইলেও তাঁহার প্রবল প্রতাপের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কায় সম্রাট অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে, রাজা মানসিংহের দুর্দ্দমনীয় ক্ষমতা কমাইতে না পারিলে ভবিষ্যতে যুবরাজ সেলিমের সিংহাসন প্রাপ্তিতে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে। অনেক ভাবিয়া তিনি এই পরম হিতৈষী প্রিয় সুহৃদকে ইহলোক হইতে সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মানসিংহকে কৌশলে শমন ভবনে প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু "ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র।" বাদসাহ যে বিষ মিশ্রিত খাদ্য অম্বর রাজের ভোজনার্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, নিদারুণ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া সেই খাদ্য স্বয়ং উদরস্থ করিয়া পরলোক গত হইলেন।

শ্রীবিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

পোড়া কপাল!

(ইচ্ছাময়ী ছন্দ)

অশিক্ষিতা কুরুচির হাঁড়ি
গোবুরে গৃহস্থের ঝি,
দেখে তোমাদের "পিটি" হয়
নাক সিঁট্‌কে বলে—'ছি!'
হ'তে পারে ঘৃণা বটে
ফেলো-ফিলিং ও মনে,
সভ্য কর্‌তে তাদের তাই
রাইট্‌ দিয়ে লাইটে এনে!
লজ্জা ভুলে ঘোমটা খুলে'
দাঁড়িয়ে পথের মাঝে,
যার তার সনে হ্যাণ্ড-সেক
এ দেশে না সাজে!
সভ্যতার সূক্ষ্মজালে
তোমরা চুণোপুঁটি।
রুই কাত্‌লা না আট্‌কায় সেথা,
তারা বোঝে তাদের ডিউটি!
ভিতরে শুধুই খা—খা—ফাঁপা,
বাইরে চোস্ত—চূণকাম!
এখনকার সভ্যতার
অঙ্গ এটি ডাক নাম!
পিঠে লম্বিত বেণী কি ফণী,
বডিতে বক্ষের বাহার কি!
আগে সেটি জেনে যেন
বিন্ধ্যগিরি নতমুখী!

লক্কা পেড়ে বাবু ধাক্কা
বসন ফেরতা দেওয়া,
নীচে তার সেমিজ্‌ আঁটা
খেলেনা লাইট হাওয়া!
তাই বুঝি বা লাইট তত্ত্বে
Ganot গিয়েছে হেরে;
পুরুষগুলো ভেতো বাঁদর
তোমাদের হেরে ফেরে।
কি লাইট্‌ পেয়েছ ওলো
ইলেক্‌ট্রিক্‌ কি গ্যাস্‌?
সেড্‌ বুঝি তার কোথাও নাই
তাই যেথা সেথায় ড্যাস্‌!
বড় মজাই গ্যাস্‌-লাইটে
সমাজে চোক বুজে';
ইডেনে ইলেক্‌ট্রিকে
লভার নিতে খুজে।
পুরুষ গুলার সাড়া পেলে
বাঘিণীর মত চাওয়া;
মুচ্‌কে হেঁসে চোখের ঠারে
রক্ত শুষে খাওয়া!
বিলাসিতায় 'ঘ্রণ' তোমরা
বেহদ্দ বার-নারীর!
ঘুঙ্গুর পায়ে খ্যাম্‌টা নাচ
সমবেত ভাই ভগিনীর!

বড় ঘরের মেয়ে কোন
প্রতিভা নাকি সপ্রচুর!
তাহার মতে Chastity
মজার চানাচুর।
আয়েসের আইস্-ওয়াটার
টাম্‌ব্লার গ্লাস্ ফুল;
'যার কাছে রবে যখন
রবে Faithful!'
বেশ প্রতিভা, বলিহারি,
পুড়িয়ে অনেক তেল,
বার করেছে এ থিওরিটা
সভ্য-ভাষায় Original!
তোমাদেরও Enlightened
কলেজী লাভ্-চেজ
Race-Groundএ সাজে ভাল
ছেড়ে ক্ষুদ্র বাঙ্গালীর কেজ্!

সাম্‌নে খুলে "ব্রহ্ম-সঙ্গীত"
সাধন-সঙ্গীত লভারের!
তাই বুঝি লো "ব্রহ্মসঙ্গীতে"
অত শ্রাদ্ধ 'প্রাণেশ'—'নাথের'।
বিধাতারো বিড়ম্বনা,
যাবার যায়গা নাই বুঝি আর!
সয়তানেও শাস্ত্র আওড়ায়
সাধিতে সিদ্ধি আপনার!
তোমরাই আবার এ অসভ্য
কুরুচির দেশে হায়!
গগনস্পর্শী 'সুরুচি-ধ্বজা'
সুশিক্ষিতা সভ্যতায়!
দেশের যেমন পোড়া কপাল
চোক থাক্‌তে নাইক সাইট্।
নইলে তোদের আতুরেতে
নূণ খাইয়ে কর্‌তো রাইট্!

শ্রীমান্ ভুক্তভোগী শর্ম্মা।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বর্ত্তমানকালে ধর্ম্মপ্রাণ লোকের অভাব নাই; কিন্তু ধর্ম্ম ইহাঁদিগের প্রাণ নহেন,—ইহাঁরা মনে করেন, আপনারা নিজেই ধর্ম্মে প্রাণ—আপনাদিগের আচার অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম! এইরূপ ধর্ম্মপ্রাণতার বশে আমাদিগের সমাজে অনেকে আর যথাশাস্ত্র উপদিষ্ট হইয়া, ধর্ম্ম-রহস্যের অধিগমন্নে সম্মত নহেন—উপদেষ্টা হইয়া, স্বমতখ্যাপনে অপরকে স্বানুবর্ত্তী করিতে সর্ব্বদাই ব্যগ্র! যিনি ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ, যিনি গুরুমুখ হইতে শাস্ত্রবিহিত উপদেশগ্রহণ করিতে বীতশ্রদ্ধ;—সুতরাং অসিদ্ধ; তিনিও কালমাহাত্ম্যে পরকে ধর্ম্মোপদেশে সিদ্ধ

করিতে উৎসুক! স্বার্থসম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান নাই—স্বহিত সাধিতে সামর্থ নাই, তিনি আবার পরার্থপর হইয়া, বিশ্বহিতব্রতের মাহাত্ম্য-প্রচারে কৃতসংকল্প। আর এই সকল স্বাভিমানপর অহম্মুখ ব্যক্তিগণ শাস্ত্ররহস্যের অনধিকারী হইয়া শাস্ত্ররহস্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া, সমাজকে ক্রমশই নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছেন;—আপনি অধঃপতিত হইয়া—অপরের অধঃপতনের চেষ্টা করিতেছি; অধুনা সেই সকল অরহস্যজ্ঞ স্বপ্রধান ব্যক্তিদিগের বাক্‌চাপল্যে মুগ্ধ না হইয়া, সদ্‌গুরুর সাহায্যে একবার শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে,—শাস্ত্রীয় শিক্ষানুশীলনে রত হইলে—বুঝা যাইবে, ধর্ম্ম কি?

আমরা বলিয়াছি, যে সত্যময় নিয়মে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে—এই বিস্তৃত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ও তাহাতে জীবস্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে, সেই সত্যময় নিয়মেই আবার প্রকৃতিপ্রত্যয়ের যোগে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, ও তাহাতে ভাবস্রোতের অবিরাম প্রবাহ বহিতেছে। আরও সাহিত্যতত্ত্বে হিতানুসন্ধান করিতে করিতে ধর্ম্মতত্ত্বের আভাসে দেখাইয়াছি,—(ধৃ+ কর্ত্তরি-মন্, যো ধরতি আত্মানং বিশ্বঞ্চেতি যাবৎ স এব ধর্ম্মঃ।) যিনি আত্মার ও বিশ্বের ধারণ করেন, তিনিই ধর্ম্ম। আবার যাঁহারা সাধারণ জীবগণের হিত সাধিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের অগ্রে আত্মহিত বুঝা উচিত; কেন না, স্বীয় হিত বুঝিতে যাঁহার সামর্থ নাই, পরের হিত বুঝিবেন, তিনি কিরূপে? সদ্‌গুরু ব্যতীত আর কেহই কাহাকেও আত্মহিত বা তৎসাধনোপায় দেখাইয়া দিতে পারেন না।

শ্বাসক্রিয়াই আমাদিগের জীবনের পরিচায়িকা; কি জাগরিতাবস্থায়, কি নিদ্রিতাবস্থায়—সর্ব্বদাই শ্বাসক্রিয়া জীবনের সহিত নিত্য সম্বন্ধ হইয়া চলিতেছে। সুতরাং এই শ্বাসক্রিয়াই জীবের আত্মার ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আর সেই শ্বাসের স্থিতিচেষ্টা করাই হইতেছে, ধর্ম্ম। যাঁহারা আত্মোৎকর্ষবিধানের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রাণায়ামাদি শ্বাসক্রিয়া দ্বারা আত্মহিত সাধিবার জন্য, সদ্‌গুরুর উপদেশগ্রহণে সচেষ্ট হইবেন। যিনি গুরুমুখ হইতে আত্মোৎকর্ষবিধায়িকা শ্বাসক্রিয়ার শিক্ষালাভ করিয়া,

তদনুশীলনে রত থাকিয়া, স্বকর্ম্মসাধন করিতেছেন, তিনিই পরোৎকর্ষ-সাধিকা বিশ্বহিতকরী যাজ্ঞিকী ক্রিয়ার সাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন। কারণ সাধক শ্বাসসাধনে আহ্নিকী যাজ্ঞিকী ক্রিয়ায় কামাদি পশুবৃত্তিকে বলি দিয়া, সৎকামরূপ পশুমুণ্ড লইয়া, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের সাধন করিতে থাকিবেন, সৎকর্ম্ম করিতে করিতে স্বতই তাঁহার জ্ঞানাগ্নি উদ্দীপ্ত হইবে। সেই জ্ঞানাগ্নিতে অহংত্ব মমত্ব আহুত হইলে, তখন সেই কামনা দূরে পলাইবে। তখন আর আমার অস্তিত্ব না থাকায়, বিশ্বই আমি বা আমিই বিশ্ব হইয়া দাঁড়াইবে। তখন পূর্ব্বাচরিত আত্মহিত স্বতই বিশ্বহিতে পরিণত হইবে। কিন্তু তদ্ব্যতীত ভগবান্ মনু বিশ্বহিতসাধনার্থক ধর্ম্মকর্ম্মের সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন,—

অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা।

অগ্নিতে আহুতি প্রক্ষিপ্ত হইলে, তাহা জগৎপ্রসবিতা সূর্য্যে উপগত হয়; সেই ভগবান্ সূর্য্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়। আর যাজ্ঞিকী ক্রিয়াদ্বারা প্রজাপুঞ্জের হিত সাধিত হয় বলিয়াই, তাহা ধর্ম্ম কর্ম্ম নামে অভিহিত। কিন্তু এখন সেই বিশ্বহিতসাধিকা ইষ্টির সাধনে সমর্থ হইতে পারেন, এরূপ শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ একান্ত বিরল না হইলেও, গণনায় যে অত্যল্পই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর সেই সকল বিশ্বহিতরত যাজ্ঞিক অগ্নিহোত্রিগণের পুণ্যফলে প্রকৃতি এখনও আমাদিগের অহিতকরী হন নাই। তাঁহারাই আবার সদ্‌গুরুরূপে পাত্রাপাত্রবিভেদে উপদেশে অনুগতশিষ্যগণের উন্নতিবিধান করিয়া, জগতে ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত রাখিয়া, জাগতিক হিত-বিধানের পথ প্রশস্ত করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণগণ অনন্যকর্ম্মা হইয়া, আত্মহিতসাধনার্থক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন ও বৈদিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অনুশীলন করিয়া, আত্মহিত বুঝিতে সমর্থ হইতেন; পরে কেহ কেহ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া, আত্মোৎকর্ষসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বহিতকরী

ইষ্টির অনুষ্ঠান করিতেন; (যে সকল ব্রহ্মচারী দারপরিগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহারা উপকুর্ব্বাণ নামে অভিহিত।) ক্রমে আত্মোৎকর্ষের বশে তৃতীয়াশ্রম বানপ্রস্থাবলম্বন-পূর্ব্বক ভগবানে সমাহিত-চিত্ত হইয়া, বিশ্বহিতের অনুষ্ঠানে রত থাকিতেন। শেষে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়া, ব্রহ্মে আত্মসমাহিত করিতেন। সন্ন্যাস অর্থে সম্যগ্‌রূপে ন্যাস,—রেচক পূরক কুম্ভকাদি-ক্রমে মন্ত্রপ্রয়োগে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের চেষ্টা। আর এই আশ্রমেই ব্রাহ্মণগণ সমাধিযোগে ব্রহ্মলাভে সমর্থ হইতেন। পূর্ব্বকথিত ব্রহ্ম-চারীদিগের নৈষ্ঠিকগণ যাবজ্জীবন গুরুগৃহে থাকিয়া, ব্রহ্মচর্য্যপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন, বেদাধ্যাপন করিয়া স্বকর্ম্মসাধন করিতে করিতে আত্মোৎকর্ষ সাধিতেন। প্রথম হইতে চরম আশ্রম পর্য্যন্ত, শ্বাসক্রিয়াদ্বারাই ধর্ম্ম কর্ম্মের যে, সাধন হইয়া থাকে, তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার্য্য। এখন সেই সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ আর বিশ্বহিতরত হইতে পারেন না—সাধারণকে আত্মহিত বা জীবহিত সাধিবার উপায় দেখাইতে পারেন না। এখন তাঁহারা স্বোদরভরণ লইয়াই বিব্রত। হিন্দুর রাজত্বকালে ক্ষত্রিয়রাজগণ ব্রাহ্মণগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; এখন ভিন্নধর্ম্মা রাজার রাজত্ব বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ নিরবলম্বন, সুতরাং উদর-চিন্তায় বিব্রত হইয়াছেন। আর বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্? আর তজ্জন্যই ব্রাহ্মণগণ সামান্য অর্থের প্রলোভনে মুগ্ধ হইতেছেন। ব্রাহ্মণগণ প্রলুব্ধ হইলেই, নষ্ট হইয়া যান। আর ভিন্নধর্ম্মা রাজাও তদ্দর্শনে অর্থবিনিময়ে তাঁহাদিগের স্বাতন্ত্র্য ক্রয় করিতে সাহস করিয়াছিলেন ও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণও সন্ন্যাসব্যতীত অপর আশ্রমত্রয়ে ব্রাহ্মণগণের ন্যায় যথানিয়ম ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, জীবনাতিপাত করিতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণরক্ষার অন্তরায় ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছিল। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের উপদেষ্টা সদ্‌গুরু ব্রাহ্মণ-গণের—ধর্ম্মরক্ষক ক্ষত্রিয় রাজগণের—শক্তি স্বাতন্ত্র্যের অভাব ঘটায়, ধর্ম্ম কর্ম্মেও আঘাত লাগিয়াছে।

"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।" ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই চারি বর্ণের গুরু—শীর্ষস্থানীয় হইতেছেন ব্রাহ্মণ। মস্তকের পতন হইলে, অপরাঙ্গের পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই, বৈশ্যগণ আর পূর্ব্বের মত ব্রহ্মচর্য্যে স্বাধিকারসম্মত বেদপাদের অধ্যয়ন ও অনুশীলন এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে বেদবিহিত কর্ম্মসাধন করেন না। শূদ্রগণও ধর্ম্মরহস্যজ্ঞ ব্রাহ্মণমুখে পুরাণকথনচ্ছলে উপদেশ পাইয়া, গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া, স্ববিহিত ধর্ম্মের যথাবিধি সাধন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। সুতরাং এখন ধর্ম্মকর্ম্মের সাধনে অন্তরায় ঘটিয়াছে। স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারে প্রারব্ধবশে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আর্য্যগণের এই বিশ্বাস নিত্য ও সত্য হওয়াতে—পাত্রাপাত্রভেদে বর্ণ ও আশ্রমানুসারে—স্ব স্ব অধিকারানুসারে—বিহিতকর্ম্মসাধনই ধর্ম্মের অঙ্গ, ইহা স্থির। আর তাই বর্ণাশ্রমের সহিত ধর্ম্মের নিত্য সম্বন্ধ।

স্বর্গীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় পিতা ৺বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটী ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ব্রাহ্মণরক্ষার্থ বহু অর্থ তাহাতে দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যদি সকল হিন্দুই সমবেত হইয়া, এইরূপ ব্রাহ্মণরক্ষায় সচেষ্ট হন, তাহা হইলে ধর্ম্ম সুরক্ষিত হইবার আশা করা যায়। কারণ, ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি শাস্ত্রোপদেশ পাইলে এবং যথাশাস্ত্র ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তৎপরিচালিত ব্রাহ্মণেতর বর্ণগণও স্বকর্ম্মসাধনে সমর্থ হইয়া, ধর্ম্মে রত থাকিতে পারিবেন। দেশে বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে; আর স্বকর্ম্মসাধনে রত থাকিয়া, সকলেই বর্ত্তমান সমাজে অব্যাহতপ্রভাবশালিনী আত্মগ্লানির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে এবং ধর্ম্মের প্রভাবে দেশের হিত সাধিত হইবে।

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ।

বাঙ্গালীর অভাব কি ?

বাঙ্গালীর প্রকৃত অভাব কি ?—এ বিষয় চিন্তা করিলে আপাততঃ মনে হয় যে, বুঝি বিধাতা পূর্ণ-অভাবসম্পন্ন একটী জাতি নির্ম্মাণ করার বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই বঙ্গদেশবাসীদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন। হায়! যাহাদিগের শরীরে বল নাই, মনে তেজ নাই, গৃহে অন্ন নাই, অন্য জাতির নিকটে মর্য্যাদা নাই, তাদৃশ বঙ্গবাসীর আবার অভাব কি? তাহাদের ত সকল বিষয়েই অভাব! তবে এ প্রবন্ধের অবতারণা কেন? অনর্থক অমূল্য মাসিক পত্রের কতিপয় পৃষ্ঠা বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তারে পরিপূর্ণ করা হইতেছে কেন? অকারণে কেন পাঠক মহোদয়গণের অমূল্য সময় নষ্ট করা হইতেছে, এবং এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া কেন ক্ষতে ক্ষার প্রদানের ন্যায় পূর্ণ অভাব-গ্রস্ত বঙ্গবাসীর চিরম্লান মুখ আরও মলিন করা হইতেছে? এইরূপ ধারণা অনেকেই করিতে পারেন বটে, কিন্তু এ বিষয়টী বস্তুতঃ তদ্রূপ নহে। বর্ত্তমান সময়ে ইহার আলোচনা নিষ্ফল না হইলেও হইতে পারে। এজন্যই আমরা এ বিষয়ের অনুশীলনে ব্যাপৃত হইলাম।

কোন একটী জাতির অভাবের বিষয় চিন্তা করিতে হইলে তজ্জাতীয় মানবগণের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। নতুবা সমষ্টিগত অনুশীলনে প্রকৃত সত্যে উপস্থিত হওয়া বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। প্রথমতঃ বঙ্গ-বাসীদিগের অন্তর্জগৎ কিরূপ, অগ্রে তাহাই দেখা যাউক।

অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে প্রাধান্য লাভ করিতে হইলে বুদ্ধি, মেধা, ভক্তি ন্যায়পরতা, উপচিকীর্ষা ও বীরত্ব এই ছয়টী গুণই অধিকতর উন্নত থাকা আবশ্যক। বুদ্ধি বিষয়ে বাঙ্গালী যে, কোন দেশের কোন জাতির অপেক্ষা হীন নহে, প্রত্যুত, শত শত জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাহা কি এতদ্দেশীয়, কি ভিন্নদেশীয় সর্ব্বস্থানবাসী চিন্তাশীল মনুষ্য-মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মেধাশক্তিও বাঙ্গালীর দুর্ব্বল নহে

যতই বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্ব অংশে গমন করা যায়, ততই এই শক্তির প্রাথর্য্য আরও অনুভূত হয়। যে দেশীয় লোকে বিশাল ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, অভিধান, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি, বেদ ও বেদান্তাদি মুখস্থ করিয়া বিচার করিতেন, তাঁহাদিগের মেধা-শক্তি যে অতি বলবতী, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ভক্তিবিষয়ে বাঙ্গালী সর্ব্ব প্রধান। এমন ভক্তজাতি আ পৃথিবীতে নাই। জগদীশ্বরের বা জগদম্বার নাম উল্লেখমাত্র নয়নে অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত হয়; এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরিপরিমাণে যেমন কোমল-হৃদয় বঙ্গবাসীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। বঙ্গকুলতিলক মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের ও তদীয় অনুচরগণের ভক্তিস্রোতে এই সে দিনেও শত শত বৈদেশিকের—বিজাতীয়ের হৃদয় যে আর্দ্র হইয়াছিল, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। শাক্ত বল, শৈব বল, বৈষ্ণব বল, সকল বঙ্গবাসীই পরম ভক্ত। ভক্তিই বঙ্গবাসীর অদ্বিতীয় সম্পত্তি।

কিন্তু হায়! বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর দোষে এই অতুলনীয় অমর-বিভবে বঙ্গবাসী এখন ক্রমশঃ হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে। যাহা হউক, হীনভাবাপন্ন হইয়াও এই জাতি ভক্তি-বিষয়ে যেরূপ উন্নত আছে, জগতে তদপেক্ষা অধিক উন্নত, আর কোনও জাতি নাই, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না।

ন্যায়পরতা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর বড়ই হীনাবস্থা। বৈদেশিকগণ এমন কি এতদ্দেশীয় ইংরেজীশিক্ষিতগণ পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালীর ন্যায়পরতা বড়ই দুর্ব্বল। একথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা না বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম যে, বাঙ্গালীর ন্যায়পরতাবৃত্তি বলবতী নহে। কিন্তু যে জাতি আতিথ্য জন্য জগদ্বিখ্যাত, অতিথি-সৎকার যাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম, সেই জাতির উপচিকীর্ষাবৃত্তি দুর্ব্বল বলা সুসঙ্গত নহে। অপর, বীরত্ব-বিষয়ে বর্ত্তমান বাঙ্গালীরা যে নিতান্তই হীন, একথা অনেকেই স্বীকার করিলেও আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে পারি না। কেননা, গবর্ণমেণ্ট যেমন পশ্চিম দেশীয়দিগকে

বীরকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তদ্রূপ যদি বাঙ্গালীদিগকেও নিযুক্ত করিতেন এবং তৎপরেও যদি বাঙ্গালী জাতি বীরত্বে খ্যাতিলাভ করিতে না পারিত, তাহা হইলে স্বীকার করিতাম যে বাঙ্গালীর কিছুমাত্র বীরত্ব নাই। কিন্তু পরীক্ষা না করিয়া একথা বলিলে উহা কিরূপে ধারণা করা যায়।

যাহা হউক, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আরও আলোচ্য বিষয় থাকিলেও এই কয়েকটীর আলোচনাতেই যথেষ্ট হইয়াছে, ইহা সম্প্রতি বলিতে হইবে। এক্ষণে, বাহ্যজগতে কিরূপ দেখা যায় দেখা যাউক।

বহির্জগতে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালা দেশের ন্যায় উর্ব্বরা ভূমি কোনও দেশে নাই। এক বাঙ্গালা দেশের উৎপন্ন খাদ্যে সমস্ত ভারতের অন্ন সংস্থান হইতে পারে। সুতরাং প্রকৃতি বাঙ্গালীর পক্ষে অনুকূল। যেমন প্রকৃতি অনুকূল, তেমনি রাজশাসনও উৎকৃষ্ট। বঙ্গদেশে চোর, দস্যু প্রভৃতির উপদ্রব এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বিচারালয় সমূহের সংখ্যা দিন দিন যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে সুবিচারলাভেও সর্ব্বসাধারণে সমর্থ হইতেছেন। তবে, অবশ্যই ইহা বলিতে হইবে যে, মানুষ যতদূর আশা করে, কোন রাজত্বেই একাল পর্য্যন্ত ততদূর শাসন-শৃঙ্খলা সংঘটিত হয় নাই এবং হইবার আশাও অত্যল্প।

প্রকৃতি ও রাজশাসন অনুকূল হইলেও বাঙ্গালীর দেহ বড়ই ক্ষীণ। ক্ষীণ শরীর লইয়া ইহারা কোন আয়াসসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। সুতরাং ইহাদিগের অন্যান্য গুণ-সত্বেও এই প্রবল দোষেই ইহাদের অধঃপাত হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্তরূপ দোষগুণ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উন্নতি লাভের উপকরণ সমূহের মধ্যে অধিকাংশই বঙ্গবাসীর আছে, অত্যল্প অংশ নাই। তথাপি অধিকাংশ বঙ্গবাসীর উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতেছে কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, বাঙ্গালীর সকলই উপযুক্তরূপে আছে বটে, কিন্তু, বঙ্গ-সমাজের উপযুক্ত পরিচালক নাই। বাঙ্গালা দেশে অনেক অনেক কৃতবিদ্য,

জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোক আছেন সত্য, কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতই হউক, বা তাঁহাদিগের আচার দোষেই হউক, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে প্রকৃত সমাজসংস্কারক বা যথার্থ পরিচালক বলিয়া মান্য করে না। এজন্যই বাঙ্গালীর অধঃপাত।

প্রাতঃস্মরণীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন যথার্থ উপযুক্ত লোক ছিলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সমাজের অশেষ কুনিয়ম-সত্ত্বেও সর্ব্ব প্রথমে বিধবা-বিবাহ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাধারণ লোকে জানে যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে লিপ্ত। একারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি তাহাদিগের যে ভক্তি, বিশ্বাস ছিল, তাহা ঐ প্রস্তাব শুনিয়াই বিলুপ্ত হইল। এজন্য তাঁহার বাক্যে আর কোন হিন্দু-সন্তান আস্থা করেন নাই। কিন্তু, তিনি যদি প্রথমে বহু-বিবাহ নিবারণ ও ব্রাহ্মণবংশীয় কুলীন-কন্যাদিগের দুঃখ বিমোচনার্থ চেষ্টা করিতেন এবং অবশেষে বিধবা-বিবাহের জন্যও যত্ন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য অনায়াসে সিদ্ধ হইত।

এইরূপ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও বঙ্গ-সমাজের দোষ সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি সমাজভুক্ত নহেন, তাঁহার কথায় কে আস্থা করিবে? একারণ তদীয় চেষ্টাও যে এতদ্বিষয়ে বিফল হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। তবে যদি কিছু উপকার হইয়া থাকে, তবে উহা কতিপয় মাতৃ-পিতৃত্যাগী ব্রাহ্মের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, অন্যে তাহা লাভ করিতে পারেন নাই।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টা ইহাঁদিগের চেষ্টার সজাতীয়া কিনা, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু হিন্দু-সমাজে থাকিয়া তিনি সতীগণের সহমরণ-রীতি যেরূপে দূরীভূত করিয়াছিলেন, হিন্দু-সমাজ বিচ্যুত হইয়া আর সেরূপ সংস্কারকার্য্যে সফল-মনোরথ হইতে পারেন নাই।

বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, একজন যথার্থ দেশ-হিতৈষী ছিলেন। কিন্তু সমীপ-দর্শনশক্তিরহিত দূর-দর্শন-সমর্থ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার

চক্ষে ভারতের প্রায় সকলই হেয় ও অবজ্ঞেয় এবং ইউরোপের প্রায় সমস্তই আদরণীয় ছিল। মনু প্রভৃতির রচিত যে সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের তুল্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা শাস্ত্র কোন দেশেই নাই, তিনি সেই গুলিকে একান্ত অসার বলিয়া চারুপাঠ ৩য় ভাগে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে পাপমুক্তির বিষয়, রাজনীতি, আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি যাহা লিখিত হইয়াছে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন্ গ্রন্থে আছে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

মহাত্মা মনু পাপমুক্তির বিষয়ে বলিয়াছেন যে,—

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি॥"

অর্থ,—নিজ পাপ খ্যাপন, পাপ স্মরণে অনুতাপকরণ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং আপৎকালে দান এই গুলি দ্বারা পাপকারী ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হয়।

ইহা অপেক্ষা পাপ মুক্তির উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠতর উপায় পৃথিবীর কোন গ্রন্থে আছে? অবশ্যই অভিজ্ঞ পাঠক স্বীকার করিবেন যে, এরূপ বা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর উপদেশ আর কোনও গ্রন্থেই নাই। তবে এই গ্রন্থ কিরূপে অসার হইল? এই প্রকার বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ একদেশ-দর্শিতা-নিবন্ধন অতি উপযুক্ত বিবিধগুণসম্পন্ন বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই। যাহা হউক, দৃষ্টান্ত দ্বারা আর পাঠক-মহাশয়দিগকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ সমীপে প্রার্থনা এই যে, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের চেষ্টাতেই ভারতের উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহারাই সমস্ত শাস্ত্রের রচয়িতা, তাঁহারাই ধর্ম্মের রক্ষক ও পালক। এক্ষণে আবার ব্রাহ্মণগণের অবনতিতেই বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতের অবনতি হইয়াছে। অতএব তাঁহারা বঙ্গের প্রতি—ভারতের প্রতি, এবং সমস্ত পৃথিবীর প্রতি কৃপা করিয়া পূর্ব্ববৎ আচার, নিষ্ঠা ও সাধনায় লিপ্ত হউন।

তাঁহারা নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ হইয়া একমাত্র অনাদি পুরুষের চিন্তায় নিযুক্ত থাকুন, তাঁহারা নব্যশিক্ষিতদিগের ভ্রূকুটি বিস্তারে কটাক্ষপাত না করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হউন, তাহা হইলেই বঙ্গদেশের—সমস্ত ভারতের, এমন কি যাবতীয় ম্লেচ্ছদেশের দুর্গতি দূরীভূত হইবে; নতুবা ধর্ম্মরাজ্যে আর্য্যসন্তানের সহস্রাংশমাত্রগামী ইউরোপাদি দেশের অনুকরণে শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণাদির চরিত্র সমালোচনা করিলে বা হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিলে কিংবা রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলে কিঞ্চিন্মাত্রও ফললাভ হইবে না, বরঞ্চ তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের অসারতাই প্রতিপন্ন হইতে থাকিবে। কেননা, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যামতে যাহা কল্পিতমাত্র, তাহার উপাসকগণ যে, একান্ত মূঢ় বলিয়াই পরিগণিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করাও হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম নহে। উহা অধিকারি-ভেদ-বিষয়ক জ্ঞান-শূন্য প্রচারকগণের অভিমত হইলেও সমুন্নত আর্য্যনীতির যে বহির্ভূত তাহাতে সংশয় নাই।

উপসংহারকালে বঙ্গদেশীয় ধনিগণ সমীপে নিবেদন এই যে, তাঁহারা বঙ্গের অভাব মোচনে বদ্ধ-পরিকর হউন, নতুবা কিছুতেই বাঙ্গালীর দুর্গতির অবসান হইবে না। যদি তাঁহারা প্রত্যেকে অন্ততঃ এক এক জন বিদ্বান ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের আর্থিক ভার সমস্ত গ্রহণ করেন এবং ঐ সকল কৃতবিদ্য ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্যকর্ম্ম যথারীতি পালন করেন, বেদ-তন্ত্রাদিসম্মত কার্য্যনিচয় সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত হন এবং নিস্পৃহ ও নিষ্কাম হইয়া নিরন্তর জপ, যোগ, ধ্যান ও জ্ঞানাদিতে রত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে, তাঁহাদিগের অমূল্য উপদেশে বাঙ্গালা দেশ পুনর্ব্বার উন্নত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই সভায় সভায় বক্তৃতা করিয়া বা গুণহীন-দিগকে গুণবান বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগকে আর কলুষিত হইতে হয় না। হায়! এতাদৃশ শুভদিন কবে উপস্থিত হইবে? কবে আবার ব্রাহ্মণদিগকে আর্য্যশাস্ত্রলিখিত ব্রাহ্মণাচারসম্পন্ন দেখিয়া—ধর্ম্মের জন্য তাঁহাদিগকে সকলকে উচ্চবোধ করিতে দর্শন করিয়া

পরমানন্দ লাভ করিতে পারিব ? মাগো, জগজ্জননি ! এরূপ শুভদিন সন্নিহিত কর। বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে সত্য প্রচার হউক, এবং পূজ্যপাদ আর্য্যগণের গৃহ সামগানে পরমানন্দ হউক।

শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত।

অভিনয় সমালোচনা।

নসীরাম—আমরা ষ্টার রঙ্গমঞ্চে একদা "নসীরামের" অভিনয় দেখিতে যাই। অভিনয় দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। নসীরাম-বেশধারী রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের অতি গভীর ভাবপূর্ণ প্রত্যেক বাক্যে সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। রাজকুমার অনাথনাথরূপে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্রের অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল। কাপালিকের ব্যবহারে সকলেই দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে বিরোজা ও শোণার অভিনয় বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। শোণা কর্ত্তৃক কাপালিকের নিধনে, শোণার অমিত তেজ ও পরোপকার ব্রতের পরিচয়ে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রাজার ও নসীরামের শেষের অভিনয় বেশ হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে নয়নমনরঞ্জক শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণ রাধার যুগল-মিলন দৃশ্যে "নসীরামের" শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়াছিল। আমরা এরূপ ধর্ম্মপ্রাণ নাটকের অভিনয় অনেক দিন দেখি নাই। সর্ব্বসাধারণকে আমরা একবার "নসীরাম" দেখিতে অনুরোধ করি।

দ্রষ্টব্য।

বীণাপাণি'র তৃতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যা মাঘ মাসে প্রকাশিত হইবে।